বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় হাত দিবার পঁচিশ বছর পরে আর প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আঠারো বছর পরে আমাদের সাহিত্যের দেড়হাজার বছরের এই ধারাবাহিক ইতিহাসের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড বাহির হইল। জের টানিয়াছি ১৯৪১ সাল অবধি। এই সালটিকে কাষ্ঠা করিবার কারণ দুইটি,—রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবির্ভাব। ইতিহাসের সঙ্গে জার্নালিজমের একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। ইতিহাসের দূরবীনে খুব কাছের জিনিস ধরা পড়ে না। জার্নালিজমের গোচরে কাছের জিনিস ছাড়া কিছুই আসে না। আমি ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছি তাই উপস্থিত কাল হইতে একটু দূরেই থামিয়াছি। জানি না আরো একটু দূরে থামিয়া গেলে ভালো হইত কিনা।

নিরপেক্ষ থাকিতে সর্বদা সতর্ক হইয়াছি। আশঙ্কা হইতেছে হয়ত সেই কারণেই উদাসীন তৃতীয় পক্ষ ছাড়া আর কেহ খুশি হইবে না। "তথ্যভারাক্রান্ত" "পাণ্ডিত্যকণ্টকিত" "সাহিত্যরসহীন" আমার রচনা "রসোত্তীর্ণ" অর্থাৎ সাহিত্য-রসলোলুপ পাঠক-সমালোচকের সুপাঠ্য ও স্বাদু নয় জানি। তবে সেই সঙ্গে ইহাও জানি যে আমার বই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উৎসাহ ও আগ্রহ জাগাইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড রচনা করিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ইতিমধ্যে সিদ্ধ-সাহিত্যবৈতালিক কেহ একাজে অগ্রসর হইবেন এবং আমার দায় ঘুচিবে। কিন্তু তাহা হইল না। ভরসা করি অতঃপর বিংশ শতাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের নব ইতিহাস রচনায় বিঘ্ন অপগত হইবে।

আলোচ্য কালমধ্যে উল্লেখযোগ্য বই লিখিয়াছেন এমন সাহিত্যিকের নাম কিছু হয়ত বাদ পড়িয়াছে। সে উপেক্ষা নয়, সে আমার ত্রুটী। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই অবহিত হইব। ইতিমধ্যে—ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ।

ছাত্র ও ছাত্রকল্প অনেকেই এই গ্রন্থকর্মে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের এবং কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌সের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবর্গের উল্লেখ না করিলে প্রত্যবায় হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া আজ আমি নিজেকে দেব-ঋণ হইতে মুক্ত অনুভব করিতেছি।

২২. ৯. ৫৮ শ্রীসুকুমার সেন

চিত্রসূচি

পরিচ্ছেদসূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ"

১

বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে নবীনতার প্রবেশ রবীন্দ্র-সাধনার বজ্রসূচীতে লব্ধ আর সে নবীনতার নবনবায়মান বিকাশ ও পরিণতি রবীন্দ্র-শিল্পে সংঘটিত। রবীন্দ্র-সাধনাকে মর্মগত এবং রবীন্দ্র-শিল্পকে আত্মগত করিবার যোগ্যতা-সামর্থ্যের উপরই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকারদের সাফল্য নির্ভর করিয়াছে। যে-কোন সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাইবে যে শক্তিশালী আদিকর্মিকের সিদ্ধিকে সাধ্য করিয়াই তবে নবকর্মিকেরা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-ইতিহাসে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে কেননা সাহিত্যকারদের সম্বন্ধে আমরা সর্বদা মোহমুক্ত নহি এবং ঐতিহাসিক-দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচারে আমাদের অনুরাগ নাই।

ভরসা করি এখন এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের বীজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই উপ্ত হইয়াছিল। এ ঘটনা বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার আগেকার। যেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনায় নিজের পথটি চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন সেদিনই বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। আজকালকার সাহিত্য-সংবাদপত্রীয় ভাষায় গতানুগতিকতার উল্লঙ্ঘনকে বলে "বিদ্রোহ"। অনতিক্রান্ত যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ এই "বিদ্রোহ"-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুধু-যে কবির অশান্ত অন্তর এবং আত্মজিজ্ঞাসা তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল তাহা নয়। পরিচিত পথে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতেছিল কিন্তু তাহাদের চিত্তের প্রসার সে অনুপাতে হয় তো নাই-ই, উপরন্তু তাহাদের মানসিকতায় পশ্চাদ্‌গামিতার সঙ্কোচ দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের পরিপূর্ণ বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্যতম নেতা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন শক্তিশালী অনুবর্তীর সঙ্গে প্রায় দশ বছর ধরিয়া মসীযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। এ বিবাদের মুখ্য ইস্যু প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যঘটিত নয়,

তবে সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়াই যুদ্ধ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং সে যুদ্ধের জয়পরাজয়ে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ খানিকটা নির্ধারিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন মফস্বলে—মেদিনীপুরে ও হুগলীতে। পরে কিছুদিন কলিকাতায় আইন পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার ছিল সদাচারনিষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত। কলিকাতায় হিন্দু কলেজে পড়িলে কি হইত বলিতে পারি না, তবে মেদিনীপুরে এবং হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে থাকিয়াই পড়িয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহার মানসিকতায় ভালো-মন্দ দুইদিক দিয়াই রক্ষণশীলতা প্রকট ছিল। যে কারণেই হোক, বঙ্গদর্শন-প্রচারের ও বিষবৃক্ষ-রচনার পর হইতে সমাজ-চিন্তায় ও ধর্ম-ভাবনায় সংস্কারের অপেক্ষা রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তিনি গুরুতর মনে করিতে থাকেন। এবং সেইসঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ ও ভাবাদর্শ তাঁহার কাছে ক্রমশ বিজাতীয় ও বিসদৃশ বোধ হইতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। ইংরেজী সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত তাঁহার মন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার দীক্ষাও ইংরেজী-লব্ধ। তবুও সেই ইংরেজীর উপর তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। যে-বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের 'পত্র-সূচনা'য় (১৮৭২) লিখিয়াছিলেন,

> আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারা যায় যে ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল।

সেই-বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে (১৮৮৪) গোল্ড্স্টুকারের রচনা হইতে হিন্দুসংস্কৃতির প্রশংসাসূচক একটু অংশ তুলিয়া দিয়া মন্তব্য করিলেন, "এমন অমৃতময়ী বাণী ম্লেচ্ছভাষায় আর কখন আমার কাণে যায় নাই।" এবং ভারতীতে (১৮৮৬) ইংরেজি সাহিত্যকে তুচ্ছ করিবার জন্য লিখিলেন,

> সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্তত আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র,

সংস্কৃতের নজীর তুলিয়া পাশ্চাত্য ইতিহাস-বোধ ভ্রান্ত ও বিজ্ঞান-চিন্তা অর্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার বাসনা আমাদের দেশে কখনই অসুলভ ছিল না। উপরন্তু ইংরেজী-জানা বাঙ্গালীর পরাধীনতা-গ্লানিবোধ দিন দিন বাড়িতেছিল, এবং সেই নিপীড়িত হীনতা-ভাবনা কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ না পাইয়া উচ্ছ্বাসের রন্ধ্রমুখে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই রন্ধ্রমুখই প্রশস্ততর করিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষের দিকে হিন্দুয়ানির প্রতি তাঁহার অনির্বিচার পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধ পোষকতা সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যে কি রকম শিক্ষা দিতেছিল তাহা তাঁহারই এক উপযুক্ত সহকর্মী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথায় বলি।

> বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে কোম্‌তের মহামনু—পুরাণের নারায়ণ। কারলাইলের অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। ··· দেখাইয়াছেন যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভুষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।[১]

পাশ্চাত্য দর্শনের কথা যাই হোক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তো এভাবে উড়াইয়া দেওয়া সহজ নয়। এবং বঙ্কিমচন্দ্রও ততদূর আগাইতে সাহস করেন নাই। সেই কাজে সাহসিক হইলেন তাঁহার কোন কোন শিষ্য বা শিষ্যকল্প। গোঁড়ামির পোষকতায় শশধর তর্কচূড়ামণির শিখাধ্বজদের ইংরেজী বিদ্যা মুখর হইয়া উঠিল।

যখন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি অনুকূলতা দেখাইতে গিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ আরম্ভ। রবি-শশীর এই আড়াআড়ির সাক্ষ্য ভারতী-তত্ত্ববোধিনীর ও প্রচার-নবজীবনের পৃষ্ঠায় মিলিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সহজেই মিটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যদের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সহজে মিটিল না।

পরের মুখের বুলিতে ভরা ভিক্ষার ঝুলির ঔদ্ধত্য রবীন্দ্রনাথ সহজে ক্ষমা করিলেন না। তাঁহার অন্তরের জ্বালা কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনায় ঝাঁঝের হুল ফুটাইল্। কিন্তু ফল হইল কিছু বিপরীত। নিরপক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলই অল্পবিস্তর চটিয়া গেল।[২]

সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙ্গালীর যোগ্যতম মানস-প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যসাধনা ও শিল্পসৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় ঝুঁকিয়া পড়িলেন

১ নবজীবন 'সূচনা' (শ্রাবণ ১২৯১)।

২ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ছাই হাততালি' (নবজীবন, মাঘ ১২১৯) নরম প্রতিবাদ। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া' (১২৯৭) তীব্র ব্যঙ্গ। মনে হয় এই নিতান্ত তুচ্ছ রচনাটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' (মানসী) কবিতাটি লেখা। 'মিঠেকড়া' পুস্তিকাকারে বাহির হইলে দেবেন্দ্রনাথ সেন ছদ্মনামে 'কবিরাহু' শীর্ষক সনেট লিখিয়া (সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮) জবাব দিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য 'রাহুর মেঘ' (যাত্রী, রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৬৪)।

তাহার বেশ কিছুকাল আগেই ভারতীয় সংস্কৃতির নবজীবনের পঞ্চপ্রদীপ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্র-ভবনে। সে পঞ্চপ্রদীপ নিষিক্ত নিখিল-ভারতত্ত্বের জাগ্রত চেতনায়। যাঁহারা নবীন, ইংরেজী-শিক্ষিত, তাঁহারা অনেকেই হইয়া পড়িতেছিলেন গোঁড়া, রি-অ্যাক্‌শনারি। তাঁহারা পাশ্চাত্য-শিক্ষালব্ধ স্বাধীন-চিন্তা ও মনস্বিতা উপেক্ষা করিয়া হিংটিংছটের বুলি আওড়াইতে বসিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ ও ঠাকুর-বাড়ী নবীন নহেন, প্রবীণই। তাঁহারা উপনিষদকে আঁকড়াইয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্গীত ও ভাষাকে পোষণ করিতেন অথচ ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বিন্দুমাত্র প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ইঁহারাই হইলেন সত্যকার নবীন। ইঁহারা ভারতবর্ষের সর্বজনীন ও সর্বকালিক আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ববিধ স্বাধীনতার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পিছাইয়া-পড়িতে-চাওয়া হিন্দু-সমাজ ও আগাইয়া-চলিতে-চাওয়া ব্রাহ্ম-সমাজের এই আদর্শঘটিত দ্বন্দ্বই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় বছরে বাঙ্গালার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই দুই আদর্শের সমন্বয় করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখনই। বালকে (১৮৮৫) প্রকাশিত এবং 'চিঠিপত্র' নামক পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধগুলি পড়িলে তাহা বুঝিতে পারি। চিঠিপত্রের ষষ্ঠীচরণ হইতেছেন অন্তর-নবীন ভারতবর্ষ, নবীনকিশোর অকালপ্রবীণ নব্য হিন্দু। এই নবীনপ্রবীণের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রি-অ্যাক্‌শন দুই রকমের হইয়াছিল। প্রথমত অসহিষ্ণুতার, আত্মতৃপ্ত হীন মূঢ়তার প্রতি অশান্ত ধিক্কার। কড়ি-ও-কোমলের ও মানসীর ব্যঙ্গ-কবিতাগুলিতে এই মনোভাবের বাহ্য-প্রকাশ, আর মানসীর 'দুরন্ত আশা'য় (১৮৮৮) গভীর মনোবেদনার উষ্ণপ্রস্রবণ।

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্পভরে
পৃথ্বী থরহর!

দ্বিতীয়ত পরিচিত তীর ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা, জীবনসাধনার সঞ্জাত্। মানসীর 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি (১৮৮৮) এই প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান্। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্তীদের পরাঙ্মুখবৃত্তি উদ্দেশ করিয়াই কবিতাটি লেখা। এ দুঃখ যে নিদারুণ—

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলিছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি।

কবির পথ দুর্গম বন্ধুর কিন্তু অপরিবর্তনীয়।

জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে। ...
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।

প্রথম সংখ্যা প্রচারে (শ্রাবণ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহা লইয়াই বিরোধের সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটিতে নিরাকার উপাসনা উড়াইয়া দিয়া সাকার উপাসনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের দিন পনের আগে প্রকাশিত নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধটির উপক্রমণিকা 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন ধর্মচিন্তার ধারা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়।

গুরু। তুমি হিন্দু ধর্মের কিছু জান কি ?
শিষ্য। হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি।
গুরু। ম্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না।
শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।
গুরু। আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্মব্যাখ্যাই পুরুষপরম্পরাগত আমার ব্যবসা। অতএব, আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি; তবে আজ বেলা অবসান হইয়াছে, সময়ান্তরে হইবে।

প্রচারে প্রকাশিত প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজ হলে

একটি বক্তৃতা করেন। সেই ভাষণ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইল 'একটি পুরাতন কথা' নামে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ও উক্তি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। তিনি পরবর্তী কালেও কখনো এমন ভাবে বিচলিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,

> সাকার নিরাকার উপাসনা-ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছে, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। ... আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন![1] অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্বল; ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে! ... কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। ... কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতেই সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

এই প্রবন্ধের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখিলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুধর্ম'। নিজের যুক্তির দুর্বলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অচেতন ছিলেন না, তাই রবীন্দ্রনাথকে কতকটা রেহাই দিয়া তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া সাফাই দিতে চেষ্টা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন,

> রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। ... উপসংহারে, রবীন্দ্রবাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। ... এ জিনিস এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। ... সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম।

[1] লোকহিতার্থে প্রয়োজনীয় হইলে কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দোষ নাই—এই নীতি বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে সমর্থন করিয়াছিলেন।

[illegible] ভাগ। অগ্রহায়ণ। অষ্টম সংখ্যা।

ও

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ভাবতী ও বালকের (১২৯৭) প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

পৌষ সংখ্যা ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' বাহির হইল। বঙ্কিম-চন্দ্রের পিঠ-চাপড়ানি তাঁহাকে শান্ত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'লোকহিত' শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই, এই জন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

"পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" নীতি মানিয়া লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইখানেই ক্ষমা দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া "বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া" ফেলিলেন। এ কথা জীবনস্মৃতি-পাঠকের অজানা নয়। বিরোধের সময়েও দুইজনের ব্যক্তিগত প্রীতি ও ভক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই।[১]

ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল কথা লইয়া এই যে প্রবীণ-নবীনের বিরোধ ইহাতে জয়লাভ নবীনেরই হইয়াছিল—এই স্বীকৃতি প্রবীণ দলের অন্যতম দলপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখাতেও পাই। (অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' বাহির করিয়াছিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন নব্য হিন্দু-তত্ত্বালোচনার দিকে ফিরাইবার জন্যই।[২]) মাঘ সংখ্যা নবজীবনে অক্ষয়চন্দ্রের সরস প্রবন্ধ 'ভাই হাততালি' বাহির হইল। অক্ষয়চন্দ্র বলিতে চাহিলেন, হাততালি "স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্ত্যের মাটি" করিয়াছিল, "বিদেশিনী দুঃখিনী বিদূষী" রমাবাইয়ের মাথা ঘুরাইয়া হৃদয় গলাইয়া আগুন জ্বালাইয়াছে। এখন তাহার লক্ষ্য দুইটি বড় শিকারের দিকে, সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

> রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে স্থিরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; ··· সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা-ভাসা, ভ্রমর-বর-স্পন্দিত-পদ্মপলাশ-লোচন—সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনায়িত চিকুর ঝল ঝল মুখমণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান,

১ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল, প্রচারের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন।"

২ "নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না। ··· নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।" 'সূচনা', নবজীবন প্রথম সংখ্যা।

হাসিখুসী ভরা অধর প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।

ভারতী-প্রচারের বিরোধ চুকিয়া গিয়া নূতন করিয়া দেখা দিল সঞ্জীবনী-বঙ্গবাসীর দ্বন্দ্ব। অল্প কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বে শিখণ্ডীর ভূমিকা লইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর নেতাদের রি-অ্যাক্‌শনারি চেষ্টা ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সঞ্জীবনীতে লিখিয়াছিলেন একটি কবিতা[১]—"শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু"।

নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু, আহা চামু!

২

বেলা পড়িলে রৌদ্রের তাপ ঘুচিয়া যায় কিন্তু বালির তাত চট করিয়া মিলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার শক্তিমান্ সহচরগণ নিরস্ত হইলেন, কিন্তু পাইক-পেয়াদারা লড়াই জীয়াইয়া রাখিতে যত্নবান্ থাকিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গবাসীর ও নবজীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা মহত্ত্ব ও ঔদার্য চন্দ্রনাথের ছিল না, তবুও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন-অধিকার করিয়া বসিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগে নাই। ইতিমধ্যে নব্য হিন্দুরা দলে ভারি হইয়াছে। চিন্তা ও যুক্তি না থাকুক চীৎকার ও শাস্ত্র আছে। সুতরাং চন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ দুই একবার তাল ঠোকাতেই ফতে হয় নাই।[২] নবজীবন উঠিয়া যাইবার কিছুকাল পরে 'সাহিত্য' বাহির হইলে (১২৯৭) চন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যে ভর করিলেন। সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা চন্দ্রনাথ বসুর পরেও চলিতে থাকে। এই বিরোধের রেশ চুকিয়া যায় ১৩২০ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে।

সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা যখন জঁাকিয়া উঠিতেছে তখনই রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নবীন সাহিত্যযুগের সৃষ্টিকার্য শুরু হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' নবজীবনের সূচনা করে নাই। নবজীবনোদয়ের জন্য যে সাধনার আবশ্যক ছিল

[১] প্রথম সংস্করণ কড়ি-ও-কোমলের অন্তর্ভুক্ত, পরে বর্জিত।

[২] রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য ব্যঙ্গরচনাগুলি মুখ্যত চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁহার সহকর্মীদের উদ্দেশ করিয়াই লেখা। সহকর্মীদের দলপতি ছিলেন 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

তাহার আয়োজন করিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার 'সাধনা'ই নবজীবনের সাধনা, অগ্রগতির সাধনা। এই মূলমন্ত্রটি সাধনার প্রত্যেক ষাণ্মাসিক খণ্ডের নামপত্রের উল্‌টা পিঠে ছাপা থাকিত

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে
বেঁচে' মরে' কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

৩

বঙ্গদর্শন বাহির করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ডাক দিয়াছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে। সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন তাঁহারা যাঁহারা ইতিপূর্বেই ইংরেজী লেখায় অল্পবিস্তর হাত পাকাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন ইঁহাদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য বিদেশী বস্তু দেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে অথবা দেশী বস্তু ইংরেজী-শিক্ষিতের গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থপিত করিতে। "একটু আধটু দেখিয়া সুধরাইয়া" দিলেই যে সাহিত্য-রচনা হয় না তাহা বঙ্কিমচন্দ্র যে জানিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক শিক্ষাদান। অর্থাৎ এডুকেশনের দৃষ্টিঘোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহারও সম্পূর্ণ কাটে নাই। এক দিকে "ম্লেচ্ছ" বিদেশী গ্রন্থাবলী, আর এক দিকে "পবিত্র" সংস্কৃত শাস্ত্র, মাঝখানে স্বদেশী "খাঁটি বাঙ্গালা" সাহিত্য (অর্থাৎ ভারতচন্দ্র-নিধুবাবু-ঈশ্বরগুপ্ত, বড়জোর মুকুন্দরাম),—এই তিন থাকের বাহিরে যে পঠনীয় কিছু থাকিতে পারে তাহা সমসাময়িক শিক্ষিত সাধারণের ধারণায় ছিল না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার জীবৎকালে বাঙ্গালী কবিরূপে "খাঁটি" মার্কা দূরে থাকুক "ভেজাল" মার্কায়ও সর্বস্বীকৃতি লাভ করেন-নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীমধুসূদন" উচ্ছ্বাস কবির মৃত্যুর পরে,—এ কথা মনে রাখিতে হইবে। মাইকেলের কাব্যের মত বঙ্কিমের উপন্যাসও বহুকাল যাবৎ "ফেরঙ্গ" অর্থাৎ ভেজাল সাহিত্য বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও "শিক্ষিত" বাঙ্গালীর মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দাশরথি রায়ের পরবর্তী কোন কবিকে "খাঁটি" বাঙ্গালী কবি বলিতে প্রস্তুত নন। ইতিহাস-সরস্বতীর এমনি পরিহাস যে মৃত "খাঁটি" বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা হা-হুতাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা "ভেজাল" সাহিত্যেই প্রতিষ্ঠাবান্।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে দেখিয়াছিলেন সমাজ-শাসনের ও নীতি-শিক্ষার অন্যতম

উপায় রূপে, তাই তাঁহার রচনা উপদেশগূঢ়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সে ভাবে দেখেন নাই। তাঁহার কাছে সাহিত্য বাহির হইতে সংগৃহীত আদর্শের ব্যাখ্যা বা জ্ঞানের পসার নয়, সাহিত্য জীবনমননেরই ফসল ফলানো। এইজন্য সাহিত্য সেই সাধনা-সাপেক্ষ যে সাধনা কলম-পেষার অভ্যাস নয়, কর্মের চিন্তার আনন্দের—এক কথায় সর্বাঙ্গীণ জীবনের—সাধনা। উনবিংশ শতাব্দী যখন শেষ দশকে আসিয়া ঠেকিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিত তরুণ লেখকদের ডাক দিলেন এই সাধনার ক্ষেত্রে। নিজেও কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন পশ্চাৎপন্থীদের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে। প্রতিপক্ষের নেতা তখন চন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার আশ্রয়ভূমি সাহিত্য। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ একা সব্যসাচী। প্রতিপক্ষের সহিত তর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনও শাস্ত্রের আড়ালে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। সাংস্কৃতিক আলোচনায় এ ভঙ্গি নূতন। শাস্ত্রের হস্তাবলম্ব ছাড়িয়া বুদ্ধিনির্ভরতার পথে বাঙ্গালা সাহিত্যচিন্তার এই প্রথম পা বাড়ানো।[১]

বঙ্কিমোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যধারার গঙ্গাবতরণ রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য় (১২৯৮-১৩০২)। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন তরুণ-অতরুণ মননশীল লেখক-অলেখক কয়েকজন সাধনায় উৎসাহিত হইলেন। তাহাতে অল্প যে কয়েকব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিলেন তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যচিন্তায় নূতন জীবন সঞ্চারিত হইল।

'সাধনা'র সাধনা যে সর্বাঙ্গীণ সাধনা তাহার পরিচয় রচনাবলীর বিষয়ে,—স্বরলিপি হইতে সাংখ্যদর্শন পর্যন্ত এবং ব্রজবুলি হইতে পলিটিক্স্ অবধি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য রচনাসম্ভার। রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' সাম্প্রতিক সাহিত্যের উদ্যোগপর্ব। নবীন-প্রবীণ সব লেখকের রচনারই সেখানে সমান মর্যাদা। কোথাও লেখকের স্বাক্ষর নাই। সম্পাদকও (শেষ বছরে ছাড়া) নামে মাত্র।

'সাধনা'র সাধনা রবীন্দ্রনাথের ঘরের সাধনা, বাহিরের সঙ্গে ঘরের সুগভীর যোগের সাধনা॥

৪

বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তঃপুরে আত্মশক্তি সঞ্চয়ের যে আয়োজন চলিতেছিল তাহারই সমিধ্ যোগাইল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। নব্য হিন্দুত্ব বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইল। সে বাধা যদি বা দূর হইল, এমন সময় দেখা দিল পোলিটিক্যাল আন্দোলনের

[১] তুলনীয় 'কর্মের উমেদার' (সাধনা, মাঘ ১২৯৮)।

উচ্ছ্বাস আর তার পিছু পিছু বঙ্গভঙ্গের বেদনা। পায়ে জোর পাইবার পূর্বেই শিশুকে যোগ দিতে হইল দৌড়ের পাল্লায়। অনেক দিক দিয়া বাঙ্গালীর চিন্তায় ও কর্মে, শিক্ষায় ও সংগঠনে শৈথিল্য—কোন কোন বিষয়ে অবনতি—দেখা দিল। এমন দুর্যোগের দিনে রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য হাল ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার উপযুক্ত সহযোগীও মিলিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী ধীরে ধীরে ধাতস্থ হইল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া দিলেন। তবে ক্ষতিও হইয়া গেল। সে ক্ষতি যে কতটা তাহা এখন কিছু কিছু ধরা পড়িতেছে। বাঙ্গালীর কাছে বৃহৎ সংসারের আমন্ত্রণ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে॥

স্বাধীন চিন্তা

১

সাহিত্যচর্চায় নবাগতদের অভ্যর্থনা-শঙ্খ বাজাইতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত তরুণ বয়স হইতে। তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠাই দৃঢ় হয় নাই। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে 'বালক' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন ১২৯২ সালে। জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিকা ছিলেন নামে মাত্র। কার্যাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান লেখক এবং সর্বেসর্বা। এক বৎসর স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া বালক ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। স্বাধীন বালকের শেষ সংখ্যার সর্বশেষে 'কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন'এ এই কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছিলেন,

> কার্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক-কার্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এইসকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

ঠাকুর-বাড়ীর কোন কোন ছেলেমেয়ের বাল্যরচনা বালকে এবং ভারতী-ও-বালকে বাহির হইয়াছিল।[১] সাধনার পৃষ্ঠায় পাই ইঁহাদের রচনা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী। পরবর্তী কালে হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তর গদ্যপদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

[১] সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী। হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী পরে কিছুকাল ভারতীর সম্পাদনা করিয়াছিলেন। হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ১৩০৪ সালে 'পুণ্য' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ইহাতেও প্রধানত ঠাকুর-বাড়ীর নবীন ও প্রবীণ লেখকদের রচনা স্থান পাইত।

২

জাহাজে একদিনের মাত্র পরিচয়ে আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)[১] রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এম. এ. পাশ করিয়া তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর অন্তরঙ্গতা আরও বাড়ে, আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবীকে[২] বিবাহ করেন (শ্রাবণ ১২৯৩)। আশুতোষ দেশী-বিদেশী সাহিত্যের রসিক ছিলেন, "ফরাসি কাব্য-সাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল।"[৩] সাহিত্যরসিক লেখক হিসাবে আশুতোষের পরিচয় বিবাহের বৎসরের মধ্যেই অবরুদ্ধ বলিতে পারি কেননা এই বছরের ভারতী-ও-বালকেই তাঁহার বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল।[৪] রবীন্দ্রনাথ তখন কড়ি-ও-কোমলের কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার কোন কোন কবিতায় আশুতোষের রস-সহানুভূতির রঙ লাগিয়া থাকা বিচিত্র নয়। কড়ি-ও-কোমলের কবিতাগুলি আশুতোষের সাজানো। সেকাজে তাঁহার কৃতিত্ব কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

তখনকার নূতন সাহিত্যের পোষকতায় আশুতোষের আবির্ভাব ক্ষণিক, তবুও উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্যবান্‌। 'কাব্যজগৎ' প্রবন্ধগুলি শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কীট্‌স্‌ পো বার্নস্‌ প্রভৃতি ইংরেজ কবির এবং ফরাসী কবি আঁদ্রে সেনিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা। অন্যান্য ইংরেজ ও ফরাসী কবিরও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং বিদেশী সাহিত্যের তৌলন বিচার আছে। আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সাহিত্যরসবোধ সম্বন্ধে আশুতোষ খুব খাঁটি কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

> আমাদিগের মেজাজ খানিকটা আমীরি। চেষ্টা করিয়া আমরা সৌন্দর্য খুঁজিয়া লইতে পারি না; চট্‌পট্‌ যাহা ভাল লাগে তাহা ছাড়া আমাদিগের আর কিছুই ভাল

১ পরে হাইকোর্টের জজ এ. চৌধুরী নামেই সমধিক পরিচিত। ইঁহার ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবী কবি এবং লেখিকারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভ্রাতা প্রমথনাথ চৌধুরীর ও ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবীর সাহিত্যসৃষ্টির কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

২ ইনিই বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয়ে নামভূমিকায় সাজিয়াছিলেন। মনে হয় ইঁহার নামেই নাট্যরচনাটির নামকরণ।

৩ 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

৪ 'কাব্যজগৎ' (আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক. মাঘ, ফাল্গুন); 'কথার উপকথা' (কার্তিক); সাধকসঙ্গীতের সমালোচনা (অগ্রহায়ণ)। এই সমালোচনাতে আশুতোষ রামপ্রসাদের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন

লাগে না। মজলিসে সুর না বাঁধিয়া আমরা কোনরূপ যন্ত্র শুনিতে প্রস্তুত নহি। বাঁধা রাগ-রাগিণী ভিন্ন নূতন কিছুরই অবতারণার চেষ্টা আমাদিগের সহ্য হয় না। কবির পথ ধরিয়া নীরবে শিষ্য যেমন গুরুকে অনুসরণ করে সেইরূপ আমরা নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া নূতন সত্য, নূতন সৌন্দর্য, নূতন ভাব কবির মুখের দিকে চাহিয়া শিখিতে দেখিতে ভাবিতে পারি না। প্রেম ভক্তিময় ধর্ম যখন বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল তখন বাঙ্গালী কবি ছিল, কবিতা লিখিতে পড়িতে গাহিতে জানিত। আলস্য কিংবা হেলায় কবিতা বোঝা যায় না।

সুপ্রভাতে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে কণ্বের শিষ্য যেমন সূর্য চন্দ্রের যুগপৎ উদয় অবসান দেখিয়া আত্ম-দশান্তরের কথা ভাবিয়াছিলেন, পবিত্র আশ্রম পদে থাকিয়াও সহজ-ভাবে সরল ঋষিকুমার যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, স্বতই সকলেরই মনে সেই কথা কয়টি উদয় হয়—কিন্তু তাহার জন্য সুপ্রভাত আবশ্যক, কুমুদ্বতীর সংস্মরণীয় শোভার সহিত আকাশের পাণ্ডুর কেমন মিশিয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। তেমনি Shelley এবং Wordsworth-এর Skylark দেখিতে হইলে তোমার বাহিরে আইসা আবশ্যক, তোমাকে অন্তঃপুর ছাড়িতে হইবে। তুমি ত তাহা চাহ না, তুমি চাহ যে স্বভাব তোমার জন্য কাগজের মলাটে বদ্ধ হইয়া দপ্তরি মুটের হাতে নাজেহাল হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তোমার সেবা করিবে।[১]

ীয় প্রবন্ধে লেখক দেশী (সংস্কৃত) ও বিদেশী (প্রধানত ইংরেজী ও ফরাসী) কাব্যের ভাব ও দৃষ্টির তৌলন বিচার করিয়াছেন। ইংরেজীর সঙ্গে প্রভেদ দেখাইবার জন্য আশুতোষ ফরাসী হইতে একটি পুরানো গ্রাম্য-গীতি ও দুইটি আধুনিক কবিতা (একটি গোতিয়ের, অপরটি হুগোর) অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। শেষোক্ত অনুবাদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

আমিত গোলাপ প্রজাপতি তুই—
আজ হোক কাল হোক, মাটিতে মিশাব দুই।
ওখানে উড়িস কেন আয় কাছে আয়,
থাকিব দুজনে মিলি যেথা প্রাণ চায়।
চল যেথা প্রাণ যায়,
উড়িবি মলয় বায়,—
হোক না যে কোন স্থান
পেতে দিব মম প্রাণ।
হৃদয়ের শ্বাস,
বর্ণের বিকাশ,
প্রজাপতি হোক্
গোলাপ কোরক,
পাখা গুটাইয়া হৃদয় মেলিয়া দুজনে মিলিবে দুই।
থাকিব মিলিয়া
হৃদয় ঢালিয়া—

[১] প্রথম প্রসঙ্গ। এটিতে শেলির ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক লইয়া তৌলন আলোচনা।

আকাশের গায়,
ধূলার শয্যায়—
যথা হোক তথা,
সে পরের কথা,
প্রাণীর প্রধান ধর্ম, প্রাণীর প্রথম কর্ম, প্রাণের মিলন।

প্রবন্ধগুলিতে আশুতোষ যে উদ্যম দেখাইলেন তাহা উপক্রমণিকাতেই রহিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি অচিরে লয়ের (Law-এর) মধ্যে লীন হইয়া গেলেন ॥

৩

বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিকে মাল্যদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীরা মনে মনে খুব সায় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যকে ভদ্র ভাষায় হেঁয়ালি বা ধোঁয়াটে অথবা অভদ্র ভাষায় নেকামি না বলিয়া "কাব্যি" বলিয়া নাক সিঁটকাইতে লাগিলেন। ইহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট'।[১] বাঙ্গালায় নবীন কবিতার এই প্রথম আত্মসমর্থন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুঁয়া", কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গাভাঙ্গা, এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে "কাব্যি" নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি এবং নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে। …
>
> প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি, দূর অস্পষ্ট নিকট স্পষ্ট, বেগ অস্পষ্ট অচলতা স্পষ্ট, মিশ্রণ অস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট সমস্তই পরিষ্কার সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। …
>
> যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত, যাহা বুঝা যায় না অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মত অনুভব করি অথচ প্রত্যক্ষের অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য-কাব্য যখন কোন কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে।

১ ভারতী-ও-বালক, চৈত্র ১২৯৩।

৪

চিন্তাশীল মনীষার সমবায়ে দেশে সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রচেষ্টারূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি মিলিয়া 'হিতবাদী' কাগজ বাহির করিলেন (১২৯৮)। সমসাময়িক সাক্ষ্যে বলে, "অনেক লোকে মিলিয়া একটা খবরের কাগজ বাহির করা হয়ত এই দেশে এই প্রথম হইল। কেবলমাত্র অনেক লোক নহে; অনেক ভাল লোকে এই কাগজের স্বত্বের অংশীদার, উদ্যোগী, পোষক ও লেখক।" এই ভালো লোকদের একজন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার উপর ছিল সাহিত্য-বিভাগের ভার। তিনি প্রত্যেক সংখ্যায়—যে কয় সপ্তাহ তিনি এই ভার বহন করিয়াছিলেন—একটি-দুইটি করিয়া ছোটগল্প লিখিতেন।[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয়তম ঘটনা। হিতবাদীতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সাধারণ পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।[২] কর্তৃপক্ষ চাহিলেন গল্পকে হালকা ও কাহিনীসর্বস্ব করিতে। রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী ছাড়িলেন। অনতিবিলম্বে সমবায়ও ভাঙ্গিয়া গেল। নূতন পরিচালকদের হাতে হিতবাদী নূতন ভাবে চলিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য' বাহির করিয়াছিলেন ক্ষুদ্র আকারে। ১২৯৮ সাল হইতে তাহা বৃহত্তর ও জাঁকালো ভাবে বাহির হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাহিত্যের যোগাযোগ হইল, তবে খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয়। কেননা ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহারই অনুমোদনে ও আনুকূল্যে 'সাধনা' পত্রিকা বাহির করিলেন। সম্পাদক হইলেন ঠাকুরবাড়ীর সদ্য-পাশকরা প্রথম বি-এ গ্র্যাজুয়েট সুধীন্দ্রনাথ।[৩]

[১] প্রচলিত ধারণা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ হিতবাদীর প্রথম ছয় সপ্তাহে এক একটি করিয়া ছয়টি ছোটগল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। "ছয়" সংখ্যাটি ভুল না হইতে পারে তবে কোন কোন সংখ্যায় যে একাধিক গল্প বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। প্রথম তিন সংখ্যা হিতবাদী পড়িয়া এক ছদ্মনামা ("গরিব ব্রাহ্মণ") সমালোচক 'নব্যভারত'এ (আষাঢ় ১২৯৮) লিখিয়াছিলেন, "প্রত্যেক সংখ্যাতে একাধিক গল্প থাকিলে প্রবন্ধ-দারিদ্র্য মনে হয়। এবং দুটী ক্ষুদ্র গল্পে যে স্থান দেওয়া যায়, তাহা একটি গল্পে দিলে তাহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ হয়।"

[২] উক্ত সমালোচকের মতে হিতবাদীতে প্রকাশিত "গল্পগুলিতে একটু প্লট (plot) না থাকিলে, তাহা প্রায়ই মনোহর হয় না। তার পর কি হইল, তার পর কি হইল, জানিবার ইচ্ছা যে গল্পে উদ্দীপিত না করে সেই গল্পই অধিকাংশ স্থলে প্রায় পঠিত হয় না। যেরূপ গল্প বাহির হইতেছে, ভরসা করি তদপেক্ষা শীঘ্র মনোহর গল্প বাহির হইবে।"

[৩] জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছে বলা বাহুল্য যে পনেরো বছর বয়সে তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনার প্রতিবাদে একজন বি-এ কলম ধরিতেছেন শুনিয়া অবধি অনেক দিন পর্যন্ত বি-এ পাশ গ্র্যাজুয়েটের উপর রবীন্দ্রনাথের সভয় সম্ভ্রম ছিল। সুধীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করায় ইহারই কি ইঙ্গিত?

৬ষ্ঠ ভাগ। ১৩০২; ভাদ্র ও আশ্বিন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

লেখকগণের নাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্, এ., শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী, এম্. এ., শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীজলধর সেন, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্ এ., সি. এস্., শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি এ., শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম এ., শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ., বি এল্ ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আট আনা।

সাহিত্যের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। শেষ সংখ্যায় (ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক) এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছিল যে অতঃপর সাধনা ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে। সম্ভবত বৈষয়িক ও পারিবারিক কারণে এ কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই।

সাহিত্যের যে নূতনতর আদর্শের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের সাধনা শুরু হইল তাহা লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা চিঠিতে ব্যক্ত আছে। অনেককাল পরে প্রমথনাথ চৌধুরীকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন 'সবুজ পত্র' বাহির করিয়াছিলেন তেমনি সাধনার অধিবাস লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দিয়া। কিন্তু আশুতোষ চৌধুরীর মত লোকেন্দ্রনাথও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের ফাঁদে ধরা দিলেন না। লোকেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার একটি ইংরেজী কবিতা রবীন্দ্রনাথ "অনুবাদ" করিয়াছিলেন।[১] লোকেন্দ্রনাথের দুই-একটি বাঙ্গালা কবিতাও মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছিল।[২] রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সাহিত্যিক পত্রালাপ সাধনায় ছাপা হইয়াছিল তাহা কথ্যভাষায় লেখা। ইহার ইঙ্গিত যে লোকেন্দ্রনাথের তরফ হইতেই আসিয়াছিল তাহা প্রথম পত্রেই (রবীন্দ্রনাথের 'আলোচনা'[৩]) বোঝা যায়।

> লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মত, অপরিচিত লোক দেখ্‌লেই দৌড় দেয়। আবার পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্যশ্রী পাওয়া যায় না।

সাহিত্যচিন্তায় নূতন পথের ইঙ্গিত দিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পত্রেই।

> কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হল। তার মীমাংসাই বা নাই হল। কেবল দুজনের মনের আঘাত প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—যাতে করে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেল্‌তে পারে—এই হলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এ রকম সুযোগ সর্বদা ঘটে না—সকলেই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত—এইজন্যে অধিকাংশ মাসিকপত্র মৃত মতের মিউজিয়াম্ বল্লেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মূল ভাব বলিয়া যাহা মনে করেন তাহাও এই পত্রপ্রবন্ধে ব্যক্ত করিলেন।

১ মানসীতে সঙ্কলিত 'শেষ উপহার' (রচনাকাল ৯ কার্তিক ১২৯৭)।

২ যেমন 'বীণা' (সাধনা, কার্তিক ১২৯৯) ও ওমর খয়্যামের রুবাইয়াতের অনুবাদ (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮)।

৩ ফাল্গুন ১২৯৮।

…সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে সেটা লাগে ভাল। …তা ছাড়া সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জান্‌তে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্, তা হলেই সত্যকে জড়পিণ্ডের মত দেখাবে না।

আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে লেখকের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতেছেন মনে করিয়া লোকেন্দ্রনাথ পাঠকের দৃষ্টিতে প্রতিবাদ করিলেন পত্রোত্তরে ('সাহিত্যের সত্য'[১])।

আমি বলি সাহিত্য পাঠকের আত্ম-উপলব্ধির একটা উপায়—লেখকের আত্মপ্রকাশ তাতে থাক্ বা নাই থাক্। …সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিকাব্যে আমাদের নিজের নিজত্ব জেগে ওঠে—আমরা নিজের হৃদয়ের কথা শুনি, আর সেইজন্যেই ভাল লাগে। …যেমন আত্মপ্রকাশ কবিতা গড়বার একটা প্রণালী মাত্র, সত্য সেইরকম সাহিত্য গড়বার উপাদান মাত্র। …সত্যকে প্রকাশ করা সাহিত্যের কাজের মধ্যে নয়; মিথ্যার দ্বারা যদি সাহিত্য তার কাজ ভাল করতে পারত তাহলে মিথ্যাকে উপাদান করতে অথবা মিথ্যা প্রকাশ করতে সাহিত্যের কোন আপত্তি থাকবার কথা নেই।

লোকেন্দ্রনাথ সত্যকে ধরিলেন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। তিনি লিখিলেন,

বিজ্ঞানে আর সাহিত্যে প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর সাহিত্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করা।

মাসিকপত্রের আদর্শ লোকেন্দ্রনাথ এই নির্দেশ করিয়াছিলেন,

আমাদের ম্যাগাজিনে সাহিত্য ভাবটা বেশি ফুটিয়ে তোলা দরকার, কেননা প্রথমতঃ আমাদের বলবার কথা কম আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে সাহিত্যচ্ছলে বিজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক, যেমন ছেলেদের মিষ্টান্নের ভিতর ওষুধ পুরে খাওয়ান।

পত্রোত্তরে ('সাহিত্য'[২]) রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিলেন,

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্চে মানবজীবনের সম্পর্ক।

উত্তরে ('সাহিত্যের উপাদান'[৩]) লোকেন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন যে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে সাহিত্যের সত্য বলিতেছেন তাহা স্বতন্ত্র জিনিস, বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে তাহা এক নয়। লেখকের আত্মপ্রকাশ যে সাহিত্যের উপাদান তাহা লোকেন্দ্রনাথ একরকম মানিয়া লইলেন, তবে তাহা যে প্রধান উপাদান তাহা স্বীকার করিলেন না।

মানুষে যাই করুক না কেন তাতে তার নিজত্ব একটু থাক্‌বেই। কিন্তু আর্টের মধ্যে সেইটেকেই যে সর্বময় প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা আমি মান্‌তে পারিনে।

জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'সাহিত্যের প্রাণ'[৪]। তিনি বলিলেন,

কিন্তু যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে, সমগ্র মানবের প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।

[১] চৈত্র ১২৯৮। [২] বৈশাখ ১২৯৯। [৩] জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। [৪] আষাঢ় ১২৯৯।

বিতর্ক প্রায় এইখানেই থামিয়া গেল, যদিও আরও দুই পত্র বাহির হইল লোকেন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ'[১] ও রবীন্দ্রনাথের 'মানব প্রকাশ'[২]।

লোকেন্দ্রনাথের আর একটি পত্র-প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' ১২৯৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে ছাপা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের সত্য'এর ব্যাখ্যার মত। লোকেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই সমর্থন করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক ধ্বংস-প্রণালীর নয়। এইখানে দুই বন্ধুর মতের মিল।

> আমি কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিশ্ববিজয়ী মূর্তিধরা সম্বন্ধে আপত্তি দাখিল করতে চাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন আমার সামর্থ্য নেই, কিন্তু বিজ্ঞান যে দু হাত বাড়িয়ে আমার যা কিছু সব কেড়ে নেবার চেষ্টায় আছে, তা আমি তাকে বিনা আপত্তিতে করতে দিতে পারিনে। তাই আমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সর্বোৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস করছি।

১২৯৯ সালের সাধনায় লোকেন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহার ভাষা পত্র-প্রবন্ধগুলির মত একেবারে কথ্যরীতির নয়, কথ্যরীতি-আশ্রিত সাধুভাষা। প্রথম প্রবন্ধটিতে[৩] চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ[৪] সেকালের স্কুলে শিক্ষা-প্রণালীর সুচিন্তিত সমালোচনা। লেখক বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং পরীক্ষার জন্য টেক্‌স্‌ট্-বুক তুলিয়া দেবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

> ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্‌সট-বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্‌সট-বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্‌সট-বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও "নোট্" মুখস্থ হয়।

লোকেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা কবিতা-রচনার নিদর্শনরূপে তাঁহার অনূদিত (আংশিকভাবে) ওমর খয়্যামের 'রুবায়াৎ'-এর দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।[৫]

> জীবনের প্রতিদিন কত শত শঙ্কা,
> তার কাছে কোথা লাগে মরণের ডঙ্কা।
> ঈশ্বর যে কটি দিন দিয়েছেন কর্জ
> সহাস্যে শুধিব যবে পূর্ণ হবে সংখ্যা।
>
> মূঢ় তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
> থাকিস্ মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
> সুদ পাবি ব'লে ফেলে রাখিস্ পাওনা,
> ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে।

[১] শ্রাবণ ১২৯৯। [২] ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯। [৩] 'প্রসঙ্গ কথা' ('কথার ভেঙ্কি'), পৌষ। [৪] 'শিক্ষা-প্রণালী', মাঘ। [৫] ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮। রচনাকাল ভাদ্র ১৩০৭।

৫

রবীন্দ্রনাথের হাতে-কলমে সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)। রবীন্দ্রনাথের 'বালক'এ ইঁহার সসঙ্কোচ আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য় ইঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পুরুষে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে শক্তিসম্ভাবিত লেখক, এবং তাঁহার শক্তিসম্ভাব্যতা পূর্ণপ্রস্ফুটনের আগেই মৃত্যু হওয়ায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। খুল্লতাতের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের খানিকটা সমধর্মিতা ছিল। বাল্যে ও কৈশোরে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতই মুখচোরা গৃহকোণবাসী ও পাঠ্যভীরু ছিলেন। হয়ত একটু বেশিমাত্রায় লাজুক। তবে বলেন্দ্রনাথ ভৃত্যশাসিত কনিষ্ঠ পুত্র নয়, মাতৃলালিত একমাত্র সন্তান।

> প্রথম যখন কাব্য পড়িতে আরম্ভ করি, আমার বয়স খুব বেশি নয়, একটি ছোট আল্‌মারী ছিল, দুইচারিখানি বই, একলাটি এক ঘরে বসিয়া পড়িতাম; স্পষ্ট মনে নাই—চোখের সম্মুখে আব্‌ছায়ার মত তখনকার কতকগুলি চিত্র উদয় হয়।
>
> বাঙ্গালীর ঘরের লাজুক ছেলে—স্বভাবতই একটু চুপচাপ; অপরিচিত মুখ দেখিলে দূর হইতে দৌড়িয়া পালাই, না হয় নতনেত্রে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া যাই, কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ি, উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, মুখ লাল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ পড়াশুনা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে নাড়ী প্রায় ছাড়িয়া আসে। ...
>
> ঘরের বাহির বড় একটা হইতাম না—পথের ধারেই ঘর, খুব যে নিরিবিলি, তাহা নয়—তবুও চুপিচাপি একলাটি ঘরে বসিয়া অনেকটা বিজনতা অনুভব করিতাম। একটিমাত্র দ্বার খোলা রহিত, আর সব বন্ধ। সেই প্রায়-বন্ধ ঘরে বহু দিনের একটি জীর্ণ কেদারা হেলান দিয়া আমার প্রথম বয়সের যত সুখ দুঃখ কল্পনা কবিতা।
>
> বাহিরে ফাঁকা আকাশ। মেঘের উপর মেঘ, রঙের উপর রঙ, বিচিত্র স্তরবিন্যস্ত। এক মেঘরাজ্যে আমার মন বিচরণ করিত। এবং মনের মধ্যে ইহারই একটি ছায়াচিত্র লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতাম। কি ভাবিতাম কে জানে।[১]

একদা দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে বালক বলেন্দ্রনাথ বিদেশী কবিতা পড়িয়া মনের মধ্যে খানিকটা আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন। বোধ করি সাহিত্যবোধে তাঁহার এই প্রথম সত্যদীক্ষা। আগে হইতেই পারিবারিক আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁহার হৃদয়ে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। বিদেশী কবির বাণী বেসুরা বাজিল না বটে, তবে চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

> বিপ্লবের কবি বর্তমান দুঃখ দৈন্য অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া বর্তমান ভাঙ্গিয়া নূতন গঠন করিতে চাহেন; দুর্বল বাঙ্গালী হৃদয় তাঁহার সহিত সমবেদনা অনুভব করে এবং

> নিজের অক্ষম দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সেই বিপ্লবের বেদনাটুকু গোপনে হৃদয়ে পোষণ করে মাত্র।
>
> কেবলি কল্পনার সুখ—তখনও চিন্তা করিবার বয়স হয় নাই। নূতন ভাব সহজেই হৃদয়ে স্থান পায়, নূতন স্বাধীনতায় অবিশ্বাস জন্মে না। অথচ অতীতের বহুদিনের বিস্মৃত শৈবাল-কুটীরে প্রাচীন বেদগান ও হোমধূমের মধ্যে নিরালায় বাস করিবার মনে মনে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা।[১]

বলেন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য দুইই রচনা করিয়াছিলেন। তবে পদ্যের সংখ্যা গদ্যের তুলনায় কম এবং বৈচিত্র্যহীন। বলেন্দ্রনাথের কবিতা গুণহীন নয়, কিন্তু তাঁহার রচনার গুণপনার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ গদ্য-প্রবন্ধেই। এই কাজে তিনি সুমহৎ হস্তাবলম্ব পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। মৃত্যুর পূর্বে বলেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিবার সময় তিনি পান নাই। এই অসমাপ্ত রচনাটি দেখিয়া শুনিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ ছাপাইয়াছিলেন।[২] এই সঙ্গে সদ্যপরলোকগত ভ্রাতুষ্পুত্র-শিষ্যের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন তাহাতে দুইজনের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত এবং বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে।

> বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয়-প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না।...তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহদাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিলাম।

বলেন্দ্রাথের প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র, বিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সবই। তবে বেশির ভাগই চিত্র- কাব্য- ও জীবন-ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষায় আর্ট ক্রিটিসিজ্‌ম্ বলেন্দ্রনাথই রীতিমত শুরু করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের যেমন পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তেমনি কবিচিত্রশালিকা তাঁহার অধিকাংশ বিশিষ্ট প্রবন্ধের প্রসঙ্গ যোগাইয়াছিল। ইংরেজি সাহিত্যের চরিত্র লইয়া একটিমাত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 'রমলা'[৩]। বলেন্দ্রনাথের ইস্কুলের শিক্ষা বেশির ভাগ হইয়াছিল সংস্কৃত কলেজে। তাই সংস্কৃত কাব্য তাঁহার বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে প্রথম হইতেই টানিয়াছিল। বাড়িতে তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান আসর জাঁকিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের চিত্র-চরিত্র বিশ্লেষণের শুরুও তখন হইতে। তবে স্বভাবত টান ছিল পুরানো

[১] 'তখনকার কথা' সাধনা, চৈত্র ১২৯৮।

[২] প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৩।

[৩] ভারতী, পৌষ ১২৯৩।

বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে। সেইজন্য তাঁহার সাহিত্য-প্রবন্ধাবলীর প্রথম রচনা 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী'[১] ছাড়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া আর কোন আলোচনা নাই।

বলেন্দ্রনাথ মুগ্ধ ভাবুক মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রধানত চিত্রচিন্তক। অনাবৃত স্পষ্ট স্পর্শগ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধ স্বভাবতই তাঁহার সাহিত্য- ও শিল্প-চিন্তাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই বিশুদ্ধ-সৌন্দর্যবিশ্লেষণে বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রবন্ধবলীর অসাধারণত্ব। 'রাধা' প্রবন্ধটি[২] এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে অঙ্কিত নারী-চরিত্রাবলীর মধ্যে সৌন্দর্যে গুণে গরিমায় প্রেমের গভীরতায় চরিত্রবিকাশে কোন দিক দিয়াই রাধাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। অথচ সীতা-সাবিত্রীকে পিছনে ফেলিয়া রাধাই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কেন তাহা বিচার করিয়া বলেন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

> রাধার দেহে যখন প্রথম যৌবন বিকাশ হইল, বৈষ্ণব কবি সে বয়ঃ-সন্ধির রূপমাধুরী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার পর যখনই অবসর পাইয়াছেন, যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গ-সৌন্দর্য দেখিয়া লইতে তাঁহারা ক্রটি করেন নাই। রাধার প্রত্যেক অপাঙ্গদৃষ্টি, লঘু হাস্য, হৃদয়-বিকাশ তাঁহাদের নখদর্পণে। রাধার সহিত তাঁহাদের যখন তখন সাক্ষাৎ—স্নান সময়ে, বনপথে, নিভৃতে কুঞ্জমাঝে, গৃহে সখীসমাগমে। এবং যখন যে ভাবে দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহারা সুন্দরা রাধিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। কখনও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।
>
> সেই জন্য বৈষ্ণব কবিদিগের চিত্র হইতে আমরা রাধার রূপ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় কঠিন চিন্তার সঙ্গে প্রশান্ত ভাবুকতার সমন্বয় দেখা যায়। দেশের প্রতি অনুরাগ সুব্যক্ত, দেশের মূঢ়তার প্রতি বিরাগও গুপ্ত নয়। ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতি বলেন্দ্রনাথের বিশেষ ঝোঁক ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে তিনি আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সাহিত্যে যেমন পলিটিক্সেও তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্র খুল্লতাতের উপযুক্ত শিষ্য ॥

৬

বলেন্দ্রনাথ তিনখানি মাত্র ছোট বই বাহির করিয়াছিলেন, 'চিত্র ও কাব্য' (১৩০১), 'মাধবিকা' (১৩০৩) ও 'শ্রাবণী' (১৩০৪)।[৩] চিত্র-ও-কাব্য প্রবন্ধের

[১] ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৫। [২] ভারতী, আশ্বিন ১২৯৭।

[৩] বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রথম সঙ্কলন করিয়াছিলেন ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রন্থাবলী' (১৩১৯)। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৫৯)।

বই, সাধনায় প্রকাশিত আটটি প্রবন্ধের সঙ্কলন, রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত। ইহার মধ্যে পাঁচটি সাক্ষাৎভাবে সংস্কৃত সাহিত্যঘটিত। দুইটি প্রবন্ধ চিত্রসম্পর্কিত, একটি সাহিত্যবিষয়ক। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা বুঝিবার পক্ষে চিত্র-ও-কাব্যে সঙ্কলিত 'জয়দেব' প্রবন্ধটি[১] বিশেষ সহায়তা করে। ইতিপূর্বে[২] প্রমথনাথ চৌধুরী এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভাব-ভাষা-বস্তু-ছন্দ-শ্লীলতা সব দিক দিয়াই জয়দেবের স্বীকৃত মর্যাদা অস্বীকার করিয়া শুধু রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনী বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথও জয়দেবকে বড় কবি বলেন নাই, তাঁহার রচনার দোষ সবই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গীত-গোবিন্দের যথার্থ গীতিমূল্য স্বীকার করিয়াছেন এবং চিত্রমূল্যও অস্বীকার করেন নাই। চৌধুরী মহাশয় জয়দেবের পদাবলীকে সংস্কৃত কবিতা ধরিয়া কালিদাসের রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মর্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ বলেন্দ্রনাথ সে ভুল করেন নাই, তিনি সেগুলিকে আদিরসাত্মক বলিয়াই সরাসরি বাতিল করেন নাই পরন্তু বিচার করিয়াছেন বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর সঙ্গে। এইখানেই বলেন্দ্রনাথের উচ্চতর বিশ্লেষণী ও সৃজনী শক্তির পরিচয়।

> …গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে।
>
> …জয়দেব যে, হরিস্মরণ ও বিলাসকলা, উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।
>
> তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত, তাহাই নাই।
>
> …সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।

'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কবিতা-পুস্তিকা। কবিতাগুলি অ-পূর্বপ্রকাশিত, প্রায় সবই চতুর্দশপদী। প্রেয়সীনারী-সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবিহৃদয়ের স্তবগান মধুলুব্ধ ভ্রমর-

[১] সাধনা, ফাল্গুন ১৩০০। [২] ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭।

গুঞ্জনের মত মৃদুমর্মরিত হইয়াছে এই কবিতাগুলিতে। বলেন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় গদ্যলেখক হিসাবে। তবে তাঁহার স্পর্শবেদক অনুভূতিশীল কবিমনের ছাপ গদ্যরচনায় ততটা ব্যক্ত নয় যতটা এই প্রায়-পার্সোনাল কবিতাগুলিতে। কড়ি-ও-কোমলের কয়েকটি চতুর্দশপদী ছাড়া এ বস্তু ইতিপূর্বে বাঙ্গালায় অপ্রাপ্ত। বলেন্দ্রনাথ লেখা-চিত্রকর, রঙের ও প্রতিফলনের সন্ধানী তিনি। নির্বিশেষ মানবীর আকর্ষণ তাঁহার নাই। অন্তঃপুর-অন্তরঙ্গিণী প্রেয়সীই কবিহৃদয়কে বন্দী করিয়াছে।

মাধবিকায় বসন্তের কবিতা, শ্রাবণীতে বর্ষার। এই দুই ঋতু ভারতীয় সাহিত্যে যথাক্রমে নারীসৌন্দর্যের ও নারীপ্রেমের প্রধান প্রতীক। বসন্তের সৌন্দর্যোচ্ছ্বাস অপরিমিত অথচ ক্ষণিকতার আশঙ্কা-বিজড়িত, সুতরাং আবেগনিরুদ্ধ।

জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান' যদি ওই আঁখিকোণে',
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা? মর দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'।[১]

মাধবিকার শেষ কবিতাটিতে যেন কবিজীবনেরই অকাল-অবসানের ইঙ্গিত।

হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন্ পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ—আর বেশি নয়।[২]

শ্রাবণীতে কবির মনের রঙ একটু বদলিয়াছে। প্রেয়সীকে কবি আপন সত্তার অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই আবাহন করিয়াছেন। রূপরেখার সৌন্দর্য কবিচিত্তকে বিশেষভাবে টানিয়াছে।

একরত্তি দেহযষ্টি তারি গবেষণা,
নিশিদিন অনুক্ষণ তাহারি সাধনা।
নানা ভঙ্গে নানা ছন্দে গ্রীবার মার্জন,
মুহুর্মুহু অঙ্গে অঙ্গে করসঞ্চালন ;[৩]

বলেন্দ্রনাথের মাধবিকার ও শ্রাবণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চৈতালী রচিত ও

[১] মৃদুতা। [২] অবসান। [৩] দিনযাপন।

প্রকাশিত হইয়াছিল। চৈতালীর কবিতার ছায়া ও মায়া শ্রাবণীর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত। যেমন,

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।...
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে ;
পূর্ণ করি' শূন্য কুম্ভ তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।[১]

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি!
দেশ হ'তে দেশান্তরে, পথ হ'তে পথে,
পুরীমাঝে, নদীতটে, প্রান্তরে পর্বতে,
যৌবনের কুঞ্জগৃহে, প্রণয়ীর মনে,
নারীর রূপের মাঝে, বিরহগহনে,[২]

কোন কোন কবিতায় সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন,

সাম দান ভেদ দণ্ড চারি রাজগুণে
অমোঘ প্রয়োগ তব, অয়ি সুনিপুণে!
সামে যবে বাঁধ মন নাগপাশ সম
মনে হয়, স্বর্গ বুঝি কাছে আসে মম,
দান কর সুধা যবে বিম্বাধর হ'তে
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যৌবনের স্রোতে।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অভাগার প্রতি
ভেদবুদ্ধি ঘটে কেন,[৩]

সারাদিন কক্ষে কক্ষে ঘুরি আমি তব,
চিত্তে লভি, হে প্রেয়সি, সুখ নব নব।
জলভরে নাহি হাসি ;[৪]

শ্রাবণীর শেষ কবিতায় একটি পুরানো টপ্পা গানের যুগোপযোগী রূপান্তর পাই।

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?
বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে যায়।
এ বাদলে কোন কথা জমে নাকো ভাল,
এ বাতাসে আর্দ্রবক্ষে নাহি জ্বলে আলো।...
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।[৫]

[১] অপরাহ্ণে। [২] পথে পথে। [৩] সুনিপুণা। [৪] কলসীর সুখ। [৫] অসমাপ্ত।

যৌবনের গান, প্রেমের কবিতা হিসাবে বলেন্দ্রনাথের রচনার একটু বিশেষ মর্যাদা আছে। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্দ্র-পদ্ধতির অনুশীলনের সঙ্গে প্রাচীন কবিতার রসানুবৃত্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কবিতার সংহতিও বলেন্দ্রনাথের রচনার লভ্য।

বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তঃপুরে,—
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।[১]

৭

প্রবন্ধরচনায় বলেন্দ্রনাথের অনেকটা সমধর্মী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। তবে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কলাবিদ্‌, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্‌। বিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন তিনি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের কৌতূহল বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিতে ব্যাপৃত না থাকিয়া জীবনের ও জগতের বৃহত্তর ও বিচিত্রতর বিষয়ের প্রতি সজাগ ছিল। ভাষাতত্ত্ব হইতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান হইতে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড—ইত্যাদি নানা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা উজ্জ্বল আলোক পাত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে ধনী করিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য যদিচ তিনি জীবনের কোন সময়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।[২] তাঁহার সাহিত্যবোধ নিপুণ এবং রসবোধ গভীর। রচনা-শৈলীর প্রাঞ্জলতায় ও সজীবতায় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় নিহিত। দেশপ্রীতির গভীরতায় ও তাহার প্রকাশেও রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সহপন্থী ছিলেন। দেশকে ভালোবাসিতে হইবে দেশের ভিতর হইতে এবং সবদিক দিয়া দেশের শক্তি উদ্বোধিত না হইলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইবে না—এই বাসনাই তাঁহার কর্মে চিন্তায় ও রচনায় পরিস্ফুট। দেশে রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন যখন প্রবল ঝটিকা তুলিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ সহৃদয় দেশপ্রেমী কর্মীদের ডাক দিলেন ছড়া রূপকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করার মত আপাত তুচ্ছ কাজে। এ ডাকে অল্প যে কয়টি লোক সাড়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সেদিনের এই বিজ্ঞানবীরও ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া'র (১৩০৬) ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর নবীন যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য।

[১] কোথা? (শ্রাবণী)।

[২] একথা অবশ্য আক্ষরিক সত্য নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি ব্রতকথা-পাঁচালীর রীতিতে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন। ইহা লালকালিতে পুথির ধরণে ছাপা হইয়াছিল।

...কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতাসংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন ;...

রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না ; তিনি স্বয়ং সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিকদূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকসম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়ার সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।...

প্রকৃতপ্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই, এবং আমার বিশ্বাস, এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্যজীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে ; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে। সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর সাধনার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে তাঁহাকে পাই প্রথমে 'নবজীবন' পত্রিকায় (পৌষ ১২৯১)। এই 'মহাশক্তি' প্রবন্ধটি বি-এ পড়িবার সময় লেখা। ভারতীতে এবং সাহিত্যেও তাঁহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তবে প্রাবন্ধিক হিসাবে ইঁহার প্রতিষ্ঠা প্রথমে সাধনার পৃষ্ঠাতেই। সাধনায় ও অন্যত্র প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি লইয়া ইঁহার প্রথম বই বাহির হইয়াছিল 'প্রকৃতি' (১৩০৩)। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৩১০)। ইহাতে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হইল। তাহার পরে বাহির হইয়াছিল 'কর্ম্মকথা' (১৩২০), 'চরিতকথা' (১৩২০) ও 'শব্দকথা' (১৩২৪)। 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞ-কথা' ও 'জগৎকথা' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদে।

বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন মানবসংস্কৃতির এই প্রধান তিন বিষয়ই রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য ছিল। তাঁহার আলোচনায় শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অথবা নিরর্থ বাচালতায় আভাষ মাত্র নাই। সে আলোচনা স্বাধীন চিন্তার আলোয় দীপ্ত এবং সাহিত্যরসে অভিষিক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর নূতনকে স্বীকার করিয়াছিলেন অথচ পুরাতনকে অস্বীকার করেন নাই। এইখানে তিনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৮

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অগ্রজন্মা এবং অনেক বিষয়ে সমানধর্মা ও সমানকর্মা। উদ্‌ভিদ্‌বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান যোগেশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা ও পুরানো সাহিত্য এবং বাঙ্গালার পুরানো সংস্কৃতি ইঁহার বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণা অনেক নূতন তথ্য ও সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। যোগেশচন্দ্রের লেখার রীতি তাঁহার নিজস্ব—সহজ, সরল, তদ্ভবশব্দময়। এই হিসাবে যোগেশচন্দ্রের গদ্যশৈলী বঙ্কিমী রীতির স্বাভাবিক মিতভাষিণী পরিণতি। বাঙ্গালা ভাষার ও বানানপদ্ধতির বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের গবেষণা সার্থক হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। দুইটি-মাত্র সঙ্কলন বাহির হইয়াছে—'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' (১৯২২)[১] ও 'পত্রালী' (১৯০৬)। গবেষণামূলক গ্রন্থ—'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' (১৩১০), 'রত্নপরীক্ষা' (১৩১০) এবং 'বাঙ্গালা ভাষা' (১৩১২) ও 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১৩২০)॥

৯

প্রথমে এষ্টেটের কর্মচারী, পরে পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষক এবং অবশেষে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকরূপে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহ পান। বিজ্ঞান-আলোচনায় ইঁহার কৌতূহল পূর্ব হইতেই ছিল। ১২৯৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা সাধনায় তাঁহার প্রেরিত তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ছাপা হইয়াছিল। একটির উত্তরে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'দীপশিখা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯)। প্রদীপে ভারতীতে বঙ্গদর্শনে সাহিত্যে প্রবাসীতে ও অন্যত্র জগদানন্দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ইঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতীতে (ভাদ্র ১৩০৫) বাহির হইয়াছিল। ইনি কবিতা ও গল্পও লিখিতেন।[২] জগদানন্দের গ্রন্থাবলী—'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০), 'প্রাকৃতিকী' (১৯১৪), 'প্রকৃতি-পরিচয়' (১৩২১), 'গ্রহনক্ষত্র' (১৩২২), 'পোকা-মাকড়', 'আলো' (১৩২৬), 'গাছপালা' (১৯২১) ইত্যাদি॥

১ 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' নামক প্রবন্ধটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ সংখ্যা দাসীতে বাহির হইয়াছিল।

২ ইঁহার ডিটেক্‌টিভ গল্প 'দলিল-চুরি' ১৩১০ সালের কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় চতুর্থ পুরস্কারযোগ্য হইয়াছিল।

১০

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯১০) সাহিত্যকার ছিলেন না। তবুও তাঁহার কথা না বলিলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দেশচিন্তা ও অধ্যাত্মভাবনা এই তেজস্বী ও মনস্বী পুরুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইনি ছিলেন স্বদেশীযুগের অন্যতম চিন্তা-নায়ক এবং বিপ্লবপন্থার প্রধানতম অগ্নিহোত্রী নেতা। ইঁহার আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া ভবানীচরণ নববিধান মতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশে গিয়া সেখানে আট দশ বছর ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার আগে সতেরো বছর বয়সে গোয়ালিয়র চলিয়া যান এবং সেখানে কিছুদিন মাষ্টারি করেন। ভবানীচরণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট মতে এবং ছয় মাস পরে রোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম আশ্রয় করেন। খ্রীষ্টান হইয়া তাঁহার নাম হইল Theophilus-এর অনুবাদ "ব্রহ্মবন্ধু" (বা "ব্রহ্মবান্ধব")। করাচীতে তিনি একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া-ছিলেন *Sophia* নামে। তাহাতে 'ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়' নাম-গ্রহণের এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

> আমি ভিক্ষু সন্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয়। তদনুসারে আমি নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছি। আমার কৌলিক পদবী বন্দ্য (অর্থাৎ প্রশংসিত) উপাধ্যায় (অর্থাৎ শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক) আর আমার খ্রীষ্টীয় ধর্মাশ্রয়ের (baptismal) নাম হইতেছে ব্রহ্মবন্ধু (Theophilus)। আমি আমার কৌলিক নামের প্রথম অংশ ত্যাগ করিয়াছি, কেন না আমি সেই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য যিনি দুঃখের মানুষ, যিনি নির্যাতিত মানব। অতএব আমার নূতন নাম হইল ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়।[১]

খ্রীষ্টান হইলেও ব্রহ্মবান্ধব ভারতীয় পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় সন্ন্যাস-সাধনার কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। আগে ভারতবর্ষ সব ধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে। এখন ব্রহ্মবান্ধব চাহিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মকেও ভারতীয় করিতে। তিনি ইসাপন্থী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে জব্বলপুরের কাছে নর্মদাতীরে ছোট আশ্রম খুলিলেন।

১ *Sophia* (ডিসেম্বর ১৮৯৪) হইতে অনূদিত। প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' দ্রষ্টব্য।

অর্থাভাবে এবং মিশনারিদের প্রতিকূলতায় আশ্রম অচিরে রুদ্ধদ্বার হইল। তাহার পর তিনি *Twentieth Century* পত্রিকা বাহির করিলেন। উদ্দেশ্য বেদান্ত মতের প্রচার। ব্রহ্মবান্ধব বেদান্ত মতের মধ্যে খ্রীষ্টান ও হিন্দুধর্মের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের প্রশংসাময় আলোচনা বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> তৎপূর্বে আমার কোন কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ··· শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রচেষ্টায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

ব্রহ্মবান্ধবের মনে সর্বদা মুক্তির হাওয়া বহিত। তিনি কোন কিছুতেই বেশিদিন আটক থাকিতেন না। কোন ধর্মমতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই ব্রাহ্মধর্ম হইতে প্রোটেষ্টাণ্ট মত তাহা হইতে রোমান ক্যাথলিক মত এবং অবশেষে বেদান্ত মত। ধর্মমত হইতে ধর্মমতান্তরে বিচরণ করিলেও তিনি উদার দৃষ্টি হারান নাই। সেইজন্য খ্রীষ্ট-উপাসনার সঙ্গে বেদান্ত-আলোচনা ও গৈরিকধারণ তিনি বেমালুম মিলাইয়া লইয়াছিলেন। স্বাদশিকতার সূত্রে তিনি হিন্দুধর্মেও যথাসম্ভব আস্থাবান্ ছিলেন। যেখানে সত্যের আলোক অনুভব করিয়াছেন, কর্মোদ্যমের আভাস দেখিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন (১৯০১) তখন ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ররীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরে বলিবার নাই।

> তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর-পক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।[১]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এক বছর থাকিয়া ব্রহ্মবান্ধব কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং সারস্বত আয়তন নামে অনুরূপ বিদ্যালয় খোলেন (১৯০২)। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের টাকা লাগিত না। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব জেনারল আসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে পড়িয়াছিলেন, এবং দুই সতীর্থের মধ্যে যে আত্মিক যোগাযোগ ছিল তাহা বেদান্তাশ্রয়েই বোঝা যায়। বিবেকানন্দের তিরোধানের পর ব্রহ্মবান্ধব

[১] 'চার অধ্যায়' প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

বিলাতে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং বিন্দুমাত্র সম্বল না লইয়া বিদেশে রওনা হইলেন (অক্টোবর ১৯০২) এবং বছরখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধব অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে অক্স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বেদান্ত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা। এসব কথা জানি তাঁহার 'বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি'তে[১]। বিলাতে তিনি সব সমাজেই মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটি চিঠিতে অক্স্‌ফোর্ডে শ্রমজীবীদের রাজনীতিক মতামতের স্পষ্ট আলোচনা আছে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করি। ভাষায় অমনস্কতার পরিচয় লক্ষণীয়।

> এখানে একটি কর্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ বিদেশ হোতে ছুতার রাজমিস্ত্রী কামার দরজী—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে। কিন্তু তাদের বড় মানুষদের উপর যে রাগ দেখিলাম তাতে বড় ভয় হয়। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে এরা সামলে উঠিতে পারে না। তাই এরা বর্তমান সমাজের দ্রোহী হয়ে উঠিতেছে। ··· ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটি অঙ্গ। ইহাই ধর্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্যভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। ··· সভ্যতার আর একটি শোচনীয় ব্যাপার ভয়ানক দারিদ্র্য।[২]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগেই ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গোষ্ঠীতে যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের 'সূচনা' ও বারোটি নৈবেদ্যের কবিতার পরেই ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল—'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা'। এই বছরের (১৩০৮) বঙ্গ-দর্শনে ব্রহ্মবান্ধবের আরও তিনটি প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল—'ত্রিন শত্রু' (শ্রাবণ), 'ভারতের অধঃপতন' (মাঘ) এবং 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' (ফাল্গুন)। (এই চারিটি প্রবন্ধ 'সমাজতত্ত্ব' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (বৈশাখ ১৩১৭) ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর অল্পকাল পরে।) অতঃপর ১৩১১ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ব্রহ্মবান্ধবের 'বেদান্তের প্রথম কথা' বাহির হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মূল প্রেরণা হইতেছে ভারতবর্ষীয় জনগণের মনকে পাশ্চাত্য

১৯০৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। চিঠিগুলি সবই প্রথমে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়াছিল।
অক্স্‌ফোর্ড হইতে লেখা (২ জানুয়ারী ১৯০৩)।

বিস্রংসনশীলতা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া একতায় নিষ্ঠিত করিবার বাসনা। প্রথম প্রবন্ধটি শুরু হইয়াছে নৈবেদ্যের—তখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত—"হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর" কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া।

স্বদেশী-আন্দোলনের ঢেউ উঠিলে দেশবন্ধু বীর সন্ন্যাসী তাঁহার ধ্যানের আসনে অচঞ্চল বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বঙ্গভঙ্গ উত্তেজনায় ব্রহ্মবান্ধবের তেজ ও কর্মোদ্যম বিস্ফুরিত হইয়া বিপ্লব-পন্থা আলোকিত করিল। তাঁহার 'সন্ধ্যা' যেন যুগসন্ধ্যার রণশঙ্খ বাজাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি।

> সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে-ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এই নীতিভ্রংশে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব নিজেও সে বিষয় অনবহিত ছিলেন না।[১] রাজদ্রোহ অভিযোগে বিচারাধীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু যেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত।

শুধু সন্ধ্যা নহে, ব্রহ্মবান্ধব আরও দুইটি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন,—সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' (ফাল্গুন ১৩১৩) এবং অর্ধসাপ্তাহিক 'করালী'। ইহার অল্প কিছু আগেই তিনি শিবাজী-উৎসব শুরু করিয়াছিলেন এবং সিংহবাহিনী ভারতমাতার পূজা জুড়িয়াছিলেন সাড়ম্বরে। বন্দেমাতরং মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটায় ৮ই বৈশাখ ১৩১৪ সালে।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠানপত্র হইতে জানিতে পারি যে কাগজটি বাহির করিবার সময়ে ব্রহ্মবান্ধব সংগঠনের দিকটাও ভাবিয়াছিলেন। যেমন,

> দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রি কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুরিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব; কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বার শত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।…
>
> অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি তাহা বোধ হয় বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা রসিতে বাঁধা আছি। যতদূর যাই না কেন যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদ বেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই। কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান, রাজা ম্লেচ্ছ, উপজীবিকার

[১] প্রথম সংস্করণ চার-অধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

জন্য মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে নহিলে উপায় নাই।…বিদেশীর কলাকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয় তাহারও মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও—বাঙ্গালী থাকিও।…

এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার আমরা স্পর্দ্ধা রাখিব না। আমাদের অগ্রজের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাই কেবল নূতন আকারে করিব। তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

অনুষ্ঠান-পত্রের এই উচ্চগ্রামের সুর পরে ব্রহ্মবান্ধব রাখিতে পারেন নাই। অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ ও অল্পবয়স্কদের মাতাইয়া তুলিবার জন্য সুর মোটা করিতে হইল এবং ভাষায়ও সেই পরিমাণে স্থূলতা অবলিপ্ত হইল। যেসব প্রবন্ধের জন্য পুলিস সন্ধ্যা আপিস প্রথম সার্চ করিয়াছিল সেগুলির শীর্ষক হইতেই বিষয়ের ভাবের ও ভাষার হদিশ পাওয়া যাইবে,—"এখন ঠেকে গেছে প্রেমের দায়ে", "ছিদিসানের হুড়ুমদুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম", "বোচকা সকল নিয়ে যাচ্চেন শ্রীবৃন্দাবন", ইত্যাদি।

ব্রহ্মবান্ধবের অসঙ্কলিত অনেক রচনা যা পত্রপত্রিকায় বাহির হইয়াছিল সেগুলি এখন প্রায়ই অপ্রাপ্য। দুইখানি সঙ্কলন-পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছি। আর তিনটি হইতেছে 'ব্রহ্মামৃত' (১৩০৯), 'পাল পার্বণ' এবং 'আমার ভারত-উদ্ধার'॥

১১

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী রাজপুত-ইতিহাসকাহিনী হইতে পরাধীনতা-গ্লানিমোচনের একটু পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসন বিধাতার বিধান। তাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশের শত্রু তাহারও শত্রু। বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয়-বোধ জাগ্রৎ হইয়াছে। ইংরেজ-শাসনের নাগপাশে দেশের চিত্ত নিষ্পিষ্ট বিদলিত হইতেছে, সে বিষয়ে ধীরে ধীরে চেতনা জাগিতেছে। বিদেশীর লেখা ভারতের ইতিহাসে আর শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন ভরিতেছে না। সে নিজের দেশকে নিজে জানিয়া লইতে চায়। দেশের অতীত ও সমাজের বর্তমান সে স্বাধীন চিন্তার আলোকে স্পষ্ট করিয়া সত্য করিয়া দেখিতে চিনিতে জানিতে চায়। সুতরাং এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনায় নূতন বেগের সঞ্চার হইল। আলোচকদের অগ্রণী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০) 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির

করিলেন (১৮৯৯)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়-অনুসন্ধিৎসার অভ্রান্ত দিক্‌নির্দেশের ইঙ্গিত পাই।

> পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া পণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধজলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

এই নব্য-ইতিহাসচর্চার শুরু রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রথম গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'র (১৩০৪) প্রথম অংশ সাধনায় ও শেষ অংশ ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত। ইংরেজ-শাসনের প্রতি তখন আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। তাই প্রথমেই হইল ইংরেজ-শত্রুর কলঙ্কক্ষালন প্রযত্ন। অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' (১৩১২) সেই দৃষ্টিতেই লেখা। অক্ষয়কুমারের বই দুইটি হতভাগ্য নবাবদ্বয়কে রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় বীরের মহিমায় উন্নীত করিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের তৃতীয় গ্রন্থ 'ফিরিঙ্গি বণিক্' (১৩২৯)।[১] মুসলমান আমলের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২৯)। ইঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল (১৮৫২-১৮৯৮) বৈদিক পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস এবং সাংখ্যদর্শনের চর্চা করিয়াছিলেন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পরে 'সাংখ্যদর্শন' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৩০৬)। অপর প্রবন্ধ প্রধানত সাহিত্যে বাহির হইয়াছিল। অনেককাল পরে বৈদিক আলোচনাগুলি 'বেদ-প্রকাশিকা' নামে সঙ্কলিত হইয়াছে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) জাতিতে মারাঠী, দেওঘরের পাণ্ডার পুত্র। শিক্ষায় দীক্ষায় ছিলেন বাঙ্গালী। এনট্রান্স্ পাশ করিয়া কিছুদিন দেওঘরে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক হন। সাধনার ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন ইনি। টিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে নবীন স্বাধীনরাষ্ট্র-চিন্তা জাগিয়াছিল তাহা শিক্ষিত

[১] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্যে (মাঘ ১৩১১ হইতে)।

বাঙ্গালীর চিত্ত অনতিবিলম্বে স্পর্শ করিয়াছিল। ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতৃত্ব যে মারাঠারই হইত তাহা শিক্ষিত মারাঠা ও শিক্ষিত বাঙ্গালী ভুলে নাই। তাই মারাঠা-ইতিহাস এখন বাঙ্গালীর অভিনব কৌতূহল জাগাইল। সখারাম মারাঠী দলিলপত্র ঘাঁটিয়া মারাঠা ইতিহাসের কোন কোন ভূমিকাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিলেন। যেমন, 'বাজীরাও' (১৩০৮), 'ঝান্সীর রাজকুমার' (১৩০৮), 'আনন্দীবাই' (১৩১০)। আধুনিক মারাঠী মনীষীর পরিচয় দিয়াছেন 'মহাদেবরাও গোবিন্দ রাণাডে' গ্রন্থে। অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা—'এটা কোন যুগ ?' (১২৯৯),[১] 'কৃষকের সর্বনাশ' (১৩১১), 'দেশের কথা' (১৩১১), 'হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' ইত্যাদি।

রামপ্রাণ গুপ্তের (১৮৬৮-১৯২৭) রচনা সবই মুসলমান-ইতিহাস অবলম্বনে। যেমন, 'হজরত মোহাম্মদ' (১৩১১), 'মোগল বংশ' (১৩১১), 'পাঠান রাজবৃত্ত' (১৩১৮)। মুসলমান লেখকেরা স্বভাবতই সেই দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। যেমন, সেখ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদের 'আরব জাতির ইতিহাস', আবু নাসের সইদুল্লার 'আফ্‌গান আমির চরিত', আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত', সেখ আবদুল জব্বারের 'মক্কাশরীফের ইতিহাস' ও 'জিরুসালেম বা বরফুল মোকাদ্দিমের ইতিহাস', ইমদাদুল হকের 'মোসলেম্ জগতে বিজ্ঞানচর্চা' (১৩১১) ইত্যাদি। মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'শাহ্‌নামা' ফেরদৌসীর কাব্যের উল্লেখযোগ্য মর্মানুবাদ। ইতিহাসের আলোচনায় নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ভাবনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩), 'সোনার বাঙ্গালা' (১৯০৬), 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' ইত্যাদি রচনার সমাদর স্থায়ী হইয়াছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) মোগল-ইতিহাস কাহিনী রোমান্সের আকার দিয়া জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গল্প ভারতী সাধনা ইত্যাদিতে বাহির হইয়াছিল।[২] 'পুরুপুষ্প' (১৩০৯) ও 'রঙ্গমহাল' (১৩১১) ইঁহার শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলির সঙ্কলন। 'ঔরঙ্গজেব' (১৯০৪), 'বঙ্গ বিক্রম' (১৯০৬) ও 'আকবরের স্বপ্ন' (১৯১২)—এই তিনখানি ইঁহার ঐতিহাসিক নাটক।

[১] প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ-আকারে প্রকাশিত।

[২] যেমন ১২৯৯ সালে ভারতীতে 'রুধিরোৎসব', 'লাল বারদোয়ারি', 'মথুরায় বৌদ্ধাধিকার', 'নুরজাহান' ও 'মুসলমান রাজদণ্ডবিধি'; সাধনায় (অগ্রহায়ণ ১২৯৯) 'জাহাঙ্গিরের মদিরাসক্তি'।

কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের (১৮৪৭-৯৫) 'অশোকচরিত' ভালো রচনা। ইহার 'বুদ্ধচরিত'এর অনেকটা সাধনায় বাহির হইয়াছিল (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ পর্যন্ত)।

আরবী-ফারসী ভাষায় পণ্ডিত সিদ্ধমোহন মিত্র ভারতী সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় মুসলমান সংস্কৃতির কোন কোন বিষয় বাঙ্গালা প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন স্থায়ী দান দিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের গবেষণায় অনুরাগী ছিলেন। প্রথম জীবনে সম্বলপুরে ওকালতি এবং শেষ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতেন। বাঙ্গালা পদ্যরচনায় ইঁহার সহজ দক্ষতা ছিল। ইঁহার 'থেরগাথা', 'থেরীগাথা', ও 'গীতগোবিন্দ' অনুবাদ যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ রচনা। ইঁহার সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে প্রাচীন (বৌদ্ধ) ও অনার্য ঐতিহাসিক কাহিনী অথবা কিংবদন্তী অনুসরণ করিয়া কিছু গল্প ও গাথা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি 'কথা ও বীথি' (১৮৯৩) ও 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫) বই দুইটিতে সঙ্কলিত আছে। ইঁহার মৌলিক কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'ফুলশর' (১৯০৪), 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪) ও 'হেঁয়ালী' (১৯১৫) উল্লেখযোগ্য॥

১২

গদ্যে সরস রচনায় নেতা রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্বগামী নিশ্চয়ই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সরসরচনায় উপদেশের মশলা থাকিতই। রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়া যান নাই। তাঁহার 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' (নবজীবন ১২৯১), 'রসিকতার ফলাফল' (ভারতী ১২৯২) ইত্যাদিতে যে দীপ্ত সরসতার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা অন্য কাহারও রচনায় লভ্য নয়।

উচ্চাঙ্গের না হইলেও সরসরচনায় দুই-চারিজন দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

কৌতুকরসাশ্রিত লঘু এবং গুরু দুই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষিতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)।[১] ইঁহার প্রবন্ধের বই 'ফোয়ারা' (১৩১৭), 'পাগ্‌লা

[১] প্রথম প্রবন্ধ 'গোরুর গাড়ী' ১৩১১ সালে কার্তিক সংখ্যা সাহিত্যে বাহির হইয়াছিল।

ঝোরা' (১৩২৩), 'সাহারা' (১৩৩৪) ইত্যাদি। 'অনুপ্রাস' [illegible]
'ককারের অহঙ্কার' (১৩২২) শব্দসংঘট্টঘটিত অর্ধকৌতুক অর্ধ-সীরিয়াস রচনা। তাহার পরে ললিতকুমার বাঙ্গালা লেখ্য ভাষার আলোচনায় ব্যাপৃত হন। ইহার পরিচয় আছে এই পুস্তিকাগুলিতে—'ব্যাকরণ বিভীষিকা' (১৩১৮), 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' (১৩১৯) ও 'বানান-সমস্যা' (১৩২৭)। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলি লইয়া ইনি বিস্তৃতভাবে তৌলন আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনা পাই এই বইগুলিতে—'প্রেমের কথা' (১৩২৭), 'সখী' (১৩২৮) ইত্যাদি॥

'অনুপ্রাসের অট্টহাস' নামে প্রবাসীতে (১৩১৯) প্রথম প্রকাশিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্র ও চরিত্র

১

দেশের জীবনকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে, সংসারের ও সমাজের সব ক্ষেত্রে সব অবস্থায় জানিতে জানাইতে বাসনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সাধনার মধ্যমে। তাঁহার ছোটগল্পেও এই উদ্দেশ্য কতকটা সাধিত হইয়াছে। তবে গল্পগুচ্ছে যে-বাঙ্গালী মানুষের জীবনের যে রূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাতে অন্তর-বাহির একাকার। বাঙ্গালী জীবনের শুদ্ধ বাহিরের রূপ, তাহার সংসার-সমাজের মেঘরৌদ্রচ্ছবি, আঁকিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি নবীন লেখকদের। তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন সাহিত্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র, এবং ভ্রাতৃবন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী। পরে আরও কয়জন লেখক এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (?-১৩১৫) ছিলেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের বংশধর। যৌবনে ইঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের পরিচয় 'ছিন্নপত্র'এর কয়েকটি চিঠিতে ও 'মানসী'র দুই একটি কবিতায় আছে। শ্রীশচন্দ্রের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী' সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১২৯২)। শ্রীশচন্দ্রের বড় গল্প ও উপন্যাসের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।[১] সাধনার সময়ে শ্রীশচন্দ্র বিহারে রাজকর্মচারী। সাধনায় ভারতীতে ও বঙ্গদর্শনে তিনি বিহারের গ্রাম্যজীবনের ছবি কিছু কিছু বর্ণনা দিলেন।[২] বাঙ্গালার পল্লীজীবনও বাদ গেল না।[৩] শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের (?-১৯১৪) চিত্রগুলিতে গল্পের রস সঞ্চারিত হইল।[৪] 'চিত্র-বিচিত্র' নামে সঙ্কলিত (১৯০২) এই সব রচনায় বৃহৎ সংসারের বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে ভদ্র বাঙ্গালী-জীবনের ব্যর্থপ্রয়াস ও অসার্থকতা সকৌতুক সরলতার সহিত বর্ণিত। 'পূজার ফুল' (১৯১৩)[৫] ও 'ইন্দু' (১৩০৯)[৬] বড়

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২২১-২২। [২] যেমন, 'রোপনীর গান', 'চাকচন্দা', 'লোরিকের গান' ইত্যাদি। [৩] যেমন, 'পুরুৎ ঠাকরুণ', 'মেলা-দর্শন', 'জামাই ষষ্ঠী'। [৪] যেমন, 'উমেদার', 'ডাক্তারবাবু', 'আমার কৃষাণী', 'উকীলের কাহিনী', 'পূজার ছুটি' 'গুরুঠাকুর' ইত্যাদি। [৫] 'কলিকাল' নামে প্রদীপে প্রথম প্রকাশিত (১৩০৪-০৫)। [৬] 'উৎসাহ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণে তারিখ নাই। সম্ভবত ১৯১৮।

গল্প। শরৎকুমারী চৌধুরানী (?-১৯২০) চমৎকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আঁকিয়াছিলেন।[১] ইঁহার 'শুভবিবাহ' (১৩১২) উপভোগ্য ঘরোয়া ছবি। সম্প্রতি শরৎকুমারীর রচনাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথের উপর ভারতীর সম্পাদনভার এক বছরের জন্য বর্তিয়াছিল (১৩০৫)। সেই বৎসর ভারতীতে অনেকগুলি চিত্র ও চিত্রগল্প বাহির হইয়াছিল। যেমন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের[৩] 'ষষ্ঠীব্রতের কথা' ও 'সামাজিক চিত্র'; শিবধন বিদ্যার্ণবের 'চতুষ্পাঠী'[৪] রাজনারায়ণ বসুর 'আমার ছাত্রাবস্থা'[৫]; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'ষ্টুডেন্ট্ মেস' ও 'ডেলি প্যাসেঞ্জার'; শরৎচন্দ্র রাহার 'কলিকাতার ছাত্রাবাস'॥

২

শ্রীশচন্দ্র-শৈলেশচন্দ্রের অনুসরণে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) উত্তরমধ্য-বঙ্গের পল্লীচিত্র নিয়মিতভাবে ভারতীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইনি প্রথমে কবিতা লিখিতেন, এবং বরাবর লিখিয়া গিয়াছেন রোমান্টিক ও ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী ইংরেজীর অনুবাদ ও অনুসরণ করিয়া। দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীচিত্র' (১৩১১) বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীচরিত্র' এবং 'পল্লীকথা'ও সবিশেষ উপভোগ্য রচনা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৬৭) বহু পল্লীকাহিনীকে গল্প-রূপ দিয়াছিলেন ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকার পৃষ্ঠায়। সেগুলি এখনও সংগৃহীত হয় নাই। যোগেন্দ্রকুমারের ষ্টাইল তাঁহার নিজস্ব, সহজ সরল স্পষ্ট। হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক রূপে ইনি যে সরল টিপ্পনীগুলি লিখিতেন তাহা 'বৃদ্ধের বচন' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

অবিনাশচন্দ্র দাসের (?-১৯৩৬) 'পলাশবন' (১৮৯৬)[৬] সুখপাঠ্য গল্পচিত্র।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৫৮-১৯৩৭) 'উড়িষ্যার চিত্র' (১৯০৩) অত্যন্ত উপভোগ্য লোকচিত্র। উড়িষ্যার সামাজিক ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান ইহাতে

[১] যেমন, 'আমাদের পুতুলের বিয়ে', 'শৈশবে ধর্মশিক্ষা', 'কন্যাদায়'। [২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত। [৩] ইঁহার রচনা সাধনায়ও ছিল। [৪] বিদ্যার্ণবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট লোকচিত্র রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (১৩০৮) বাহির হইয়াছিল। [৫] ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।
[৬] 'দাসী'তে (১৮৯৬) প্রথম প্রকাশিত।

সংগৃহীত আছে।[১] চিত্রগুলি প্রথমে কয়বছর ধরিয়া ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩০৭-০৯)। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই রচনাগুলির প্রতি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,

> লেখক উড়িষ্যাখণ্ডকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশিদিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোক জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার, জানিলেই জানানো যায় না। যতীন্দ্রবাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে। এবারে তিনি উড়িষ্যার মঠের ছবি দিয়াছেন—তাঁহার মঠের করুণহৃদয় ভক্ত মোহান্তের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া রহিলাম।

উড়িষ্যার চিত্র আঁকিবার পূর্বে যতীন্দ্রমোহন 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার' করিয়াছিলেন, এবং পরে লিখিয়াছিলেন উপন্যাস—'ধ্রুবতারা' (১৯০৭), 'অনুপমা' (১৯১৫ ?), 'সন্ধি' (১৯৩৩) ইত্যাদি। ধ্রুবতারা বইটি সাধারণ পাঠকের সমাদর পাইয়াছিল। কিছু কিছু গল্পও লিখিয়াছিলেন। গল্পের বই—'গল্পমাল্য' (১৯৩৬)। যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'বেহার-চিত্র' (১৯২১) গল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য রচনা। ইনি উপন্যাস ও কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

ডায়ারির ধরনের রচনার মধ্যে বস্তুগর্ভ হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (প্রথম খণ্ড ১৩১০)। ইহাতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মুখের বাণী যথাযথভাবে সঙ্কলিত॥

৩

সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিলেন তাহাই অনতিবিলম্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভাবান্ লেখকদের সুগমতম সরণি হইল। কিন্তু সে পথে সরিতে অগ্রগামীদের কিছু ইতস্তত করিতে হইয়াছিল। কবিতার বাঁধা রাস্তায় চলিলে সাধারণ পাঠকের অনুমোদনের অভাব হইত না। রবীন্দ্রনাথের কৃপায়

[১] বইটির একটি ইংরেজী নামপৃষ্ঠা আছে,—SKETCHES OF ORISSA: Or, An Ethnographical Study of Orissa. "Fact Draped with Fiction." গ্রন্থকার ১৮৯২ হইতে সাত বছর উড়িষ্যায় ছিলেন সেটল্‌মেণ্ট কর্মচারীরূপে। "এই সাতবৎসরে নানাস্থান দেখিয়া শুনিয়া ও বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার দ্বারা আমার নোট-বুকে অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ...এইসকল চিত্রে উড়িষ্যার বর্তমান সময়ের অবস্থা সকল যতদূর সম্ভব অবিকল অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বাস্তব নর-নারীর প্রতিকৃতি, আর কয়েকটি আমার কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তাহাদের উপাদান সত্যমূলক।"

সাধনার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

কবিতা লেখাও বেশ সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছিল। এই কারণে পরে যাঁহারা গল্পে-উপন্যাসে নাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কবিতালেখক রূপে মাসিক-পত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পরেই যিনি ছোটগল্প রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও (১৮৭৩-১৯৩২) এই নিয়মের অন্যথা করেন নাই।

কিছুদিন ধরিয়া প্রভাতকুমার গল্প ও কবিতা দুইই লিখিতেন, ১৩০৮ সালের পর প্রায় ছাড়িয়া দেন। তাঁহার কবিতা প্রধানত 'দাসী', 'ভারতী' ও 'প্রদীপ' এই তিন পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। প্রভাতকুমারের একটিমাত্র অতিক্ষুদ্র কবিতাপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—'অভিশাপ (ব্যঙ্গকাব্য)'। কবিতাটি ভারতীতে (১৩০৬) প্রথম বাহির হইয়াছিল।

প্রভাতকুমারের গল্পরচনায় যে একটি বিশিষ্ট গুণ—প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ কৌতুক—তাহা ইঁহার প্রথম-রচিত কবিতার মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন,

তাই আমি নাহি যা'ব চক্ষুকর্ণ রোধ করি
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি,
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
অতশীঘ্র অধমের মোক্ষে কাজ নাহি।[১]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মক্‌শই প্রধানত পাই। যেমন,

সারাদিন শুধু তাহারে ভাবিয়া
কাটিয়া যায়।
রাত্রি আসিয়া সে সুখ আমার
রাখে না হায়।
চেতনা, নিদ্রা; আলোক, আঁধার;
দিবস, যামিনী;—সব অধিকার,
তবে কি আমার অর্দ্ধ জীবন
যাবে বৃথায়?
তারে না ভাবিয়া নিশ্বাস লওয়া
—সে ত মিছায়।

চেতনা আমার আছেই তাহার
অনুক্ষণ।
সুপ্তিও চাহি করিতে মাত্র
তার স্বপন।

[১] 'মহাযাত্রা' (দাসী, সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। রচনাকাল ১২ কার্তিক ১৩০১।

কোন্ দেবতার কোন্ প্রকরণে
কতকাল ধরি নিয়ত পূজনে
আমার আকুল মনের বাসনা
হবে পূরণ ?
—জীবন হবে—কিছু—না—কেবল—
তার স্মরণ ?[১]

রবীন্দ্রনাথ যে বছর ভারতী সম্পাদনা করিয়াছিলেন সেই বছরে (১৩০৫) ভারতীতে প্রভাতকুমারের শুধু চারিটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে একটি তাঁহার ভালো কবিতার অন্তর্গত বলিয়া এখানে খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম।

সেকালের প্রতি

প্রণাম। শুনিয়া তব মহত্ত্বের কথা
আসিয়াছি দূর হতে দরশন আশে।
অবাক দাঁড়ায়ে আছি মন্দিরের পাশে ;
হেরিতেছি স্বর্ণময় চূড়ার উচ্চতা।...
কিন্তু হে পূজিত, ওহে বিরাট, মহান্,
প্রতিমূর্ত্তিখানি তব যেমন সুন্দর,
ছিল হেন তুষ্টি-সুখে চিরদীপ্যমান
সত্য কি জীবিতকালে তব কলেবর ?
—অথবা জর্জ্জর ছিলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
অভিশপ্ত "আজ-কাল", ইহারি দশায় ?

৪

কবিতা লেখার সূত্রেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের প্রথম যোগাযোগ। প্রভাতকুমারের লিখিবার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।[২] রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। প্রভাতকুমারের গদ্য লেখাতেই তাঁহার মনের সতেজ ভাব ও প্রকাশের ঋজুভঙ্গি প্রকট হইয়াছে। চিত্রার সমালোচনা এই গদ্য রচনাটি শুধু প্রভাতকুমারের গদ্য রচনার ইতিহাসে নয় সমসাময়িক সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও মূল্যবান্। রবীন্দ্রনাথের

[১] 'কামনা' (ঐ অক্টোবর ১৮৯৬)।

[২] "রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। ...ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, গদ্য রচনায় জন্য প্রধান জিনিষ হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে দাসীতে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলাম" (প্রভাত-কথা, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯)।

প্রতিভা সেকালের তরুণ ও অতরুণ শিক্ষিতসমাজকে কিভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহার ইতিহাস এই প্রবন্ধটিতে লভ্য। প্রভাতকুমার লিখিয়াছিলেন,

> যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্য যুবক;—ইঁহারা সকলেই প্রায় একপ্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দপারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক।... (খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইঁহারা অনেকে হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা-হুতাশ করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন ... (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি।...ইঁহারা অনেকে বিদ্বান্, কৃতী, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর; ...আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এইসকল যুবককে চিনিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে দেখিলে আপনা-আপনির মধ্যে কুৎসিত হাসি-তামাসা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপি তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোকসংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ...অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি।...বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জলপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয়বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোন ল্যাঠাই নাই; তাহার ভিতর এক ফোঁটাও জল প্রবেশ করিতে পায় না. এমন লোকে তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই।[১]

চিত্রা সমালোচনার পর দাসীতে (১৮৯৬) আর তিনটি মাত্র গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল—'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' (আগষ্ট), বলেন্দ্রনাথের মাধবিকার সমালোচনা (ঐ) ও নিজের প্রথম ছোটগল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত'

[১] দাসী, মে ১৮৯৬ পৃ ২৪১-৫৫।

১৩০২

(সেপ্টেম্বর)।[১] ১৩০৩ সালের শেষে তাঁহার দ্বিতীয় ছোটগল্প বাহির হয় 'ভূত না চোর'।[২] গল্প দুইটিই ইংরেজির ছায়া অবলম্বনে রচিত। অতঃপর তাঁহার প্রথম মৌলিক গল্প-চিত্র 'পূজার চিঠি' ১৩০৪ সালের কুন্তলীন প্রথম পুরস্কার লাভ করে "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" ছদ্মনামে। তাহার পর প্রদীপ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩০৫—বৈশাখ ১৩০৬) চারিটি গল্প বাহির হইল, 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'বেনামি চিঠি', 'অঙ্গহীনা' ও 'হিমানী'। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় মৌলিক গল্পরচনা।[৩] এ গল্পটিও বাহির হইয়াছিল "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" নামে। বেনামি-চিঠিতে (ভাদ্র ১৩০৫) কোন স্বাক্ষর ছিল না, তবে সূচীপত্রে "শ্রীমতী রাধামণি দেবী" নামে আছে। প্রদীপের গল্প চারিটির পরে প্রভাতকুমারের ছোটগল্প ভারতীতে বাহির হইতে থাকে, তাহার পর প্রবাসীতে, শেষে মানসী-মর্মবাণীতে।

১৯০১ জানুয়ারিতে প্রভাতকুমার বিলাতে যান ব্যারিস্টারি পড়িতে। ইহার পূর্বেই তাঁহার প্রথম গল্পের বই 'নবকথা' বাহির হইয়াছিল (১৯০০)। প্রথমে বইটিতে বারোটি গল্প ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি গল্প যুক্ত হয়।[৪] নবকথার গল্পগুলিতে কাঁচা হাতের ছাপ আছে, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ঋণ অবশ্যই আছে। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'র আদি ও অন্ত্য রবীন্দ্রনাথের ধরনের ; প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ ছিল বোধ করি। রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' পড়িয়া যে প্রভাতকুমার 'ভুলভাঙ্গা' লিখিয়াছিলেন তাহা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। 'দেবী'র কাহিনী রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।[৫] 'সারদার কীর্তি'র বস্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে।[৬] তবুও গল্পগুলিতে লেখকের নিজস্বতার নিঃসংশয়

[১] প্রভাতকুমারের প্রথম গদ্য রচনা 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

[২] ভারতী, চৈত্র ১৩০৩। দাসীর পরিচালকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হইয়া পড়ায় প্রভাতকুমার দাসীতে লেখা দেওয়া বন্ধ করেন। অতঃপর ভারতীতে ও প্রদীপে তাঁহার রচনা বাহির হইতে থাকে।

[৩] নবকথা দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩১৮) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[৪] 'কাজির বিচার', 'কাটামুণ্ড', 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'শাহজাদা ও ফকীরকন্যার প্রণয়কাহিনী' ও 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর'। 'কাটামুণ্ড' ও 'শাহজাদা ও ফকিরকন্যার প্রণয়কাহিনী' বিদেশী রচনার ছায়াবলম্বনে লেখা। 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' সত্যঘটনামূলক।

[৫] " 'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে দান করিয়াছিলেন" (দ্বিতীয় সংস্করণ নবকথার ভূমিকা)।

[৬] 'বালক' অংশ দ্রষ্টব্য।

পরিচয় আছে, এবং 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটিতে প্রভাতকুমারের গল্পলেখার ক্ষমতার প্রায় পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে গল্পটি নবকথার শ্রেষ্ঠ রচনা।

দ্বিতীয় গল্পের বই 'ষোড়শী'র (১৯০৬)[১] কয়েকটি গল্প বিলাত যাইবার পথে ও বিলাতে থাকিতে লেখা। যেমন 'ধর্মের কল', 'প্রণয়-পরিণাম', 'কলির মেয়ে', 'ছদ্মনাম', 'সচ্চরিত্র' ইত্যাদি। বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলের চিত্র ও চরিত্র তৃতীয় গল্পের বই 'দেশী ও বিলাতী'র (১৯১০)[২] "বিলাতী" অংশের গল্পগুলিতে এবং পরবর্তী কালের কোন কোন গল্পে নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত। এই গল্পগুলির দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়াধিকার লণ্ডন-এডিনবরা পর্যন্ত বিস্তারিত হইল। 'ষোড়শী' ও 'দেশী ও বিলাতী' বই দুইটির গল্পে লেখকের শক্তি পূর্ণবিকশিত।

প্রভাতকুমারের অপর গল্পের বই—'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩)[৩], 'গল্পবীথি' (১৯১৬)[৪], 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭),[৫] 'গহনার বাক্স' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক' (১৯২৩), 'বিলাসিনী' (১৯২৭) 'যুবকের প্রেম' (১৯২৮), 'নূতন বউ' (১৯২৯) ও 'জামাতা বাবাজী' (১৯৩১)।

গল্প লেখা আরম্ভ করিবার সময়েই প্রভাতকুমার একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই উপন্যাস লেখা বন্ধ হইয়া যায়। ১৩০২-০৩ সালের ভারতীতে এই 'লামাকুমারী' উপন্যাসের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াছিল। কাহিনী সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের (১৩০৫) ক্ষীণ ছায়া ইহাতে দেখা যায়। বহুকাল পরে উপন্যাসটি 'সত্যবালা' নামে মানসী-ও-মর্মবাণীতে আদ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২৯-৩০)।[৬]

প্রভাতকুমারের প্রথম রচিত সম্পূর্ণ উপন্যাস বিলাতে থাকিতে লেখা এবং ভারতীতে—প্রথমে 'সুন্দরী' পরে 'রমাসুন্দরী' নামে—ধারাবাহিকভাবে (১৩০৯-১০) এবং শেষে 'রমাসুন্দরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (১৯০৮)।[৭] উপন্যাসটির শেষ অংশের ঘটনাস্থল কাশ্মীর। এই উপন্যাসে কাশ্মীর-বর্ণনা পড়িয়াই

[১] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৫। [২] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৮, তৃতীয় সংস্করণ ১৩২২। [৩] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২২। [৪] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৫-?। [৫] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৮। [৬] পুস্তকাকারে ১৩৩১। [৭] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২১।

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র জন্মভূমি কাশ্মীর ভ্রমণে মন করেন (১৩২১)। প্রভাতকুমার কাশ্মীরে যান নাই। রমাসুন্দরীতে যে প্রত্যক্ষবৎ কাশ্মীরবর্ণনা আছে তাহা ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া বই পড়িয়া লেখা। এবিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

> রবিবাবু বলিলেন—"কাশ্মীরের দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি শুনি। তুমি ত গিয়াছিলে।"
>
> প্রভাতবাবু বলিলেন—"না, আমি কখনও যাই নাই।"
>
> একথা শুনিয়া রবিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"যাও নাই? —তবে রমাসুন্দরীতে ওসব বর্ণনা লিখিলে কেমন করিয়া?"
>
> প্রভাতবাবু বলিলেন—"ওসব বিবরণ, বৃটিশ মিউজিয়মে বসিয়া আমি লিখিয়াছিলাম।"
>
> রবিবাবু বলিলেন—"অ্যাঁ? বল কি! তুমি ত সাংঘাতিক লোক হে! নূতন সংস্করণ রমাসুন্দরী কাল তুমি আমায় দিলে, বুদ্ধগয়ায় তোমার বই পড়িতে পড়িতেই ত আমার কাশ্মীর দেখিবার সখ হইল। ভাবিলাম, প্রভাতকুমার গিয়াছিল, আমিই বা যাইব না কেন? —তুমি যাও নাই! —এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িলে মনে হয় স্বচক্ষে দেখিয়া এসব লিখিয়াছ।"[১]

সে সময়ের শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালীর মনে ইংরেজ শাসকের প্রতি বিদ্বেষ-প্রতিফলিত আত্মসম্মানবোধ কতটা উঁচু হইয়াছিল তাহার খানিকটা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে রমাসুন্দরীর স্থানে স্থানে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (রঙ্গপুর, ভাদ্র ১৩১৪) লেখক এবিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

> "লাঠ্যৌষধি" নামক দশম পরিচ্ছেদে পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তখন বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বাঙ্গালী এখন লাঠ্যৌষধির মহিমা বুঝিয়াছেন। ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছি।

প্রভাতকুমারের অপর উপন্যাস—'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২)[২], 'রত্নদীপ' (১৯১৫)[৩], 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭)[৪], 'সিঁদুর-কৌটা (১৯১৯)[৫], 'মনের মানুষ' (১৯২২), 'সত্যবালা' (১৯১৫), 'সতীর পতি' (১৯২৮) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অবিলম্বে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রভাতকুমারের পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যে নিজের পথ চিনিয়া লওয়া অত সহজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সহজ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সহজ

[১] 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে', সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মানসী, মাঘ ১৩২১, পৃ ৭১৬)।

[২] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, ১৩১৭-১৮। [৩] মানসীতে প্রথম প্রকাশিত।

[৪] ঐ মানসী (১৩২২-২৩)। "এই আখ্যায়িকাটির মূল ঘটনাটি সত্য।" (ভূমিকা)।

[৫] প্রথমপ্রকাশ মানসী-ও-মর্মবাণীতে ধারাবাহিক ভাবে।

দৃষ্টি বড় সহজ নয়। সে দৃষ্টি উপরের রঙে রসে জড়াইয়া পড়ে না, সে চলিয়া যায় জীবনের গভীর মূলে যেখানে অবোধ বাসনা ও অস্ফুট ব্যাকুলতা নিরুদ্ধ প্রকাশ-বেদনায় মূক ও মূঢ়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের গল্পপাঠে "অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে না হইল শেষ।"

প্রভাতকুমারের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অবিস্তীর্ণ ছিল না। তাঁহার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে, তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষা পাইয়াছিলেন বিহারে—মুঙ্গেরে ও পাটনায়। বিহারের ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থানের এবং সিমলার ও কলিকাতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ব্যারিস্টারী উপলক্ষ্যে রঙ্গপুরে ও গয়ায় কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও জীবনকে দেখিয়াছেন সহজভাবে, কিন্তু সে সহজ-দেখা "নিতান্তই সহজ সরল",—সে দৃষ্টি তলায় নামে না, উপর লইয়াই সে তৃপ্ত। অর্থাৎ প্রভাতকুমার জগৎ-ও-জীবনকে দেখিয়াছেন শুধু চোখ দিয়া। সে চোখে মনের রঙ যেটুকু লাগিয়াছে তাহা কৌতুকের ও তৃপ্তির। গভীর সংবেদনা এবং ইমোশন তাহার মধ্যে খুব স্পষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে, বিহারের ছাত্রাবাসে, উত্তরবঙ্গের ছোট শহরে, উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের রেল কোয়ার্টারে, কাশীতে গাজীপুরে, লণ্ডনে ব্রাইটনে এডিনবরায়—যেখানে যেখানে প্রভাতকুমার জন্ম, শিক্ষা অথবা কর্মসূত্রে ঘুরিয়াছেন থাকিয়াছেন, সর্বত্র মানুষই তাঁহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, বিশেষ করিয়া যাহারা সংসারে সমাজে মাথা তুলিতে পারিতেছে না এমন মানুষ, প্রভাতকুমারের সমবেদনার বৃহত্তম অংশ অধিকার করিয়াছে। পটলডাঙ্গা-বেনেটোলার মেস-বাসী কলেজের ছাত্র, হেদো-মানিকতলা-নিবাসী পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধ, বৌবাজারের বোর্ডিং-অধিষ্ঠিত নবীন কেরাণী, বাঁকিপুর-সাসারামের চাকুরে ও উকীল, মফস্বল আদালতের মোক্তার, অখ্যাত রেল-স্টেশনের ছোটবাবু, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ফিরিঙ্গি গার্ড, উত্তরবঙ্গের জমিদার, পশ্চিমবঙ্গের চাষী গৃহস্থ, মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক, চিৎপুরের জ্যোতিষী, পর্যটক বাজীকর, কাশীবাসিনী বিধবা, লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেডি ইত্যাদি রকমারি মানুষ প্রভাতকুমারের গল্পের মধ্য দিয়া আমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি পশুও বাদ যায় নাই। বাঙ্গালায় যথার্থ পশুঘটিত গল্প (animal story) রচনায় প্রভাতকুমারই পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ লেখক। রবীন্দ্রনাথ কোন পশুঘটিত গল্প লিখেন নাই—তবে

একটি গল্পে ('হালদার-গোষ্ঠী') পশু গল্পরঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়াই প্রস্থান করিয়াছে। হাতি ও কুকুর লইয়া লেখা প্রভাতকুমারের দুইটি গল্প ('আদরিণী' ও 'কুকুরছানা') এ ধরনের গল্পের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাতকুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্বদেশী আন্দোলন, বোমা, ডাকাতি, নন্‌কোঅপারেশন—সবই তাঁহার গল্পের রস ও রসদ যোগাইয়াছে।

প্রভাতকুমারের দৃষ্টি কৌতূহলী ও কৌতুকী প্রেক্ষকের—সে দৃষ্টিতে সমবেদনা যথেষ্ট কিন্তু সংবেদনা এতটা পর্যাপ্ত নয় যাহাতে চরিত্রের অন্তরে বা ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটার একটা তাৎপর্যে পৌছানো যায়। সে দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘটনা হইতে গল্পের উপাদান খুঁজিয়া লইতে পারে, তবে সে উপাদানে ঘটনাসংযোগটাই প্রধান, মানুষ তাহার উপকরণ মাত্র। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পগুলির প্লট বিরচিত, তবুও প্রভাতকুমারের গল্পে প্রত্যাশিত অশ্রুসজলতার দীর্ঘনিঃশ্বাস-পরম্পরার সাক্ষাৎ পাই না। লেখকের দৃষ্টিতে জীবনের মূল্য আছে, সবকিছু জালজঞ্জাল আশানিরাশা সত্ত্বেও। তারুণ্যের উৎসাহ কৌতূহল ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা—এই মনোভাব গল্পগুলির বিষয়-নির্বাচনে ও নির্মাণে লেখককে যেন অবাধ অধিকার দিয়াছিল। জীবনের প্রতি যাহার কৌতূহল জাগ্রত তাহার গল্পবস্তু অভাব কোথায়।

অতঃপর বোধকরি এ কথা বলা অনাবশ্যক যে প্রভাতকুমার ছিলেন "জন্ম-রোমান্টিক"। তবে প্রভাতকুমারের গল্পে সাধারণত যে রোমান্‌স-রস পাই তাহা মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙ্গালী ঘরের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ছেলের নিতান্ত ঘরোয়া অথচ উজ্জ্বল প্রীতি ও প্রেম রস। রচনার পর এই শতার্ধ বৎসরে বাঙ্গালীর জীবন ভূমিকায় পরিবর্তন আসিয়াছে। গোলদীঘিতে আর তৃণশয্যা আতিথ্য বিস্তার করিয়া নাই, হেদো এখন মানিকতলা হইতে বীডন ষ্ট্রীটে পড়িবার টানা রাস্তা, বীডন্‌-গার্ডেন তো বহুদিন পরিত্যক্ত, লণ্ডনে এখন ভারতীয় ছাত্রাবাস ব্যারাকে পরিণত। তা হয় হউক। বাঙ্গালা সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রভাতকুমারের গল্পের পটলডাঙ্গা-ঠন্‌ঠনে-হেদো-বেজ্‌ওয়াটার-আর্ল্‌স্‌কোর্ট-ব্রাইটনের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবে।

প্রভাতকুমারের দৃষ্টিকোণ বাস্তবাভিমুখ। তবে সে বাস্তবাভিমুখিতা সেই ধরনের যাহা অপ্রিয়কে অপ্রিয় ছাড়া এবং বদলোককে বদলোক ছাড়া অন্য

কিছু করিয়া দেখায় না। প্রভাতকুমারের গল্পে-উপন্যাসে বদলোক আছে (যেমন অদ্বৈত, বদনচন্দ্র), কিন্তু লেখক তাহাদের প্রতি বিরূপতা অবলম্বন না করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতেই তাহাদিগকে দেখাইয়াছেন। তবে মোটের উপর প্রভাত-কুমারের প্রসন্নতা শহরবাসী শিক্ষিতের উপর এবং অপ্রসন্নতা পাড়াগেঁয়ে বর্ষীয়ান্ কুচক্রীর প্রতি। কিন্তু নারীর প্রতি অনুকূলতা সর্বদা সজাগ।

প্রভাতকুমারের গল্পের প্লট ঘটনানির্ভর, ব্যক্তিনির্ভর নয়—একথা মনে রাখিতে হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার গল্প অধিকাংশই পরিণামরমণীয়। তবুও তাঁহার যে যথার্থ ট্র্যাজিক গল্প নাই, এমন কথা বলা চলে না ('প্রিয়তমা', 'কাশীবাসিনী') এবং নিষ্ঠুর গল্পও আছে ('হীরালাল')।

রচনারীতি নিতান্ত সরল। ভাষা কথ্য না হইলেও কথ্যের তুল্য। শব্দ প্রায় সবই চলিত এবং সুপরিচিত। বর্ণনা-অংশ নিতান্ত অল্প, ভাব-অংশ একেবারেই নাই। ভূমিকাগুলি নিজের ভাষাই বলে, তা সে কলিকাতার কলেজী ছাত্রই হউক, বীরভূমের চাষাই হউক, ভোজপুরী কনেষ্টবলই হউক। ভাষার লঘুতা ও উজ্জ্বলতা প্রভাতকুমারের গল্প-কাহিনীর গতি মসৃণ ও ক্ষিপ্র করিয়াছে।

কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম যুগের শেষ গল্প 'কুড়ানো মেয়ে'। একটিমাত্র ভূমিকা—সীতানাথ মুখোপাধ্যায়—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গল্পটিকে উজ্জ্বল ও বাস্তব করিয়াছে। 'প্রিয়তম'এর[১] কাহিনীতে বিশিষ্টতা আছে। নববিবাহিত ও বিধবা—দুই তরুণী সখীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে একটু নূতনত্ব আছে। প্রিয়তমের মত 'কাশীবাসিনী'তেও[২] মনোগহনের নির্দেশ আছে। গল্পটির কাহিনী-পরিচালনায় ও চরিত্রচিত্রণে স্বাভাবিকতা লঙ্ঘিত হয় নাই, এবং ভাবোচ্ছ্বাসের সুযোগ সত্ত্বেও লেখকের শিল্প-সংযম বাস্তবতা ও রসসঙ্গতি দুইই বাঁচাইয়া গিয়াছে। এই গল্পটিতে প্রভাতকুমার পরবর্তী যুগের গল্পলেখকদিগের দিগ্‌দর্শন করিয়া দিয়াছেন। 'প্রত্যাবর্তন'[৩] গল্পে শিক্ষিতসমাজে জাতিবিচার সমস্যার উজ্জ্বল ও বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে। মেসের ছাত্র, পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ, কটকের নেটিভ খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিবিধ ভূমিকা গল্পটিতে দেখা দিয়াছে এবং ভিড় না করিয়া নিজের নিজের চিত্রে ও চরিত্রে স্পষ্ট হইয়া ব্যক্তি হইয়া ফুটিয়াছে। বাস্তবতার সঙ্গে

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৬; ষোড়শীতে সঙ্কলিত। [২] বিলাত যাইবার পথে জাহাজে লেখা (জানুয়ারী ১৯০১); প্রথমপ্রকাশ ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮; ষোড়শীতে সঙ্কলিত। [৩] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬; দেশী-ও-বিলাতীতে সঙ্কলিত।

সরসতার, চিন্তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের, চরিত্রের সঙ্গে উক্তির সামঞ্জস্যে রচনাটি নিখুঁত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। গল্পটি পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত স্থিতধী মনীষীও বিচলিত হইয়াছিলেন।[১]

প্রভাতকুমার বিহারে মানুষ হইয়াছিলেন, ভোজপুরী ভাষায় তাঁহার দখল ছিল। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় 'নিষিদ্ধ ফল'[২] গল্পে কনেষ্টবলের উক্তি।

> কনেষ্টবল বলিল, "ভাগ গেলই কা?—আপন আঁখিয়ামে হাম্ কুদতে দেখলি হো, তোহর্ কির্।"

'অদ্বৈতবাদ'[৩] অত্যন্ত রিয়ালিষ্টিক ও উজ্জ্বল গল্প। প্রায় এমনি বিষয় লইয়া পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র 'বৈকুণ্ঠের উইল' লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে গল্প অদ্বৈতবাদের কাছে তরল ও নিস্প্রভ। বীমার টাকার লোভে কাঠ-গুদাম পোড়াইয়া দিয়া বড় ভাই অদ্বৈত ছোট ভাই নিতাইকে যে সাফাই দিয়াছিল তাহা অসাধুর চিরকালের ন্যায়ের ফাঁকি। অল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়াই অদ্বৈত-ভূমিকার বাস্তবতা মূর্তিমান্।

> হাঁা, এমন যদি হত, যে, একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি—ও টাকাটা দিয়ে তার ব্যবসা মাটি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম আছে—তার ক্ষতি করছি। এ যে কোম্পানি হে, কোম্পানি। এ কি একজনকার? এই ধর, শিবপুরে কোম্পানির বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি দুটো কুল পেড়ে খাই তাতে কি কোনও পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই-ই—যার কুলগাছ সে ত জানতেও পারবে না। অধর্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ?

'রসময়ীর রসিকতা'র[৪] মত গল্প যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের প্রতিযোগী। প্লটের গঠনকৌশলে অতি অনায়াসে ডিটেক্‌টিভ গল্পের ঔৎসুক্য ও ভূতের গল্পের ভীতি একত্র সঞ্চারিত। অথচ কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা অথবা অলৌকিকত্ব নাই।

ষোড়শীর 'সচ্চরিত্র' এবং হতাশ-প্রেমিকের 'অলকা' অনেকটা একই বিষয় লইয়া রচিত। দুইটি গল্পের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় বিশ বছরের। এই বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে সংস্কারের বন্ধন কতটা শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ মিলে গল্প দুইটির বিভিন্ন পরিণামে। সচ্চরিত্রে নায়ক প্রেম উপেক্ষা করিয়া সংস্কার বজায় রাখিল, অলকায় সংস্কারকে উপেক্ষা করিয়া সে

[১] দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' দ্রষ্টব্য (প্রবাসী ১৩১৬)। [২] পত্রপুষ্প।
[৩] ঐ। [৪] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৬; গল্পাঞ্জলিতে সঙ্কলিত।

প্রেমের মর্যাদা স্বীকার করিল। সচ্চরিত্র গল্পটির আরও একটু মূল্য আছে, সে রজনী দাদার চরিত্র। চরিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব ও হৃদ্য।

'হীরালাল'[১] গল্পটি বোধকরি প্রভাতকুমারের একমাত্র নির্মম গল্প। এ গল্পটির প্লট স্বচ্ছন্দে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অথবা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের হইতে পারিত। গল্পটি সত্যঘটনামূলক, এবং সে সত্যঘটনা পরে লেখক অন্যত্র বিবৃত করিয়াছেন।[২]

নবকথা, ষোড়শী ও দেশী-ও-বিলাতী হইতে দশটি গল্প ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া বাহির হইয়াছিল *Stories of Bengali Life* নামে (১৯১২)। চারিটি গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন স্বয়ং লেখক—'উকীলের বুদ্ধি' ('The Wiles of a Pleader'), 'খালাস' ('His Release'), 'হাতে হাতে ফল' ('Swift Retribution') ও 'কাশীবাসিনী' ('The Lady from Benares')। বাকি ছয়টি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন মিসেস নাইট (Mrs. M. S. Knight): 'কলির মেয়ে' ('Signs of the Time'), 'বন্যশিশু' ('The Forest Child'), 'কুড়ানো মেয়ে' ('The Foundling'), 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' ('The Fulfilment of a Vow'), 'ভুলশিক্ষার বিপদ' ('The Danger of Being Wrongly Taught') এবং 'ছদ্মনাম' ('Pseudonyms')।

কয়েকটি সংস্কৃত খোশগল্পকে প্রভাতকুমার নূতন করিয়া লিখিয়াছেন।[৩] এগুলিতে সেকালের উইটের সঙ্গে একালের হিউমারের যোগ হইয়াছে।

প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় নাই। ইহার হেতু লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। প্রভাতকুমারের শিল্পী-মন জীবনকে তলাইয়া দেখে নাই। জীবনের যে গভীরতর অংশ ঘটনার অন্তরালে চাপা পড়িয়া থাকে সে বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল ছিল না। সেই কারণে উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—চরিত্র-অনুসারে ধারাবাহিকতা এবং চরিত্রের দিক দিয়া ঘটনার নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্যবিশ্লেষণ—তাঁহার উপন্যাসে পাই না। প্রভাতকুমারের

[১] হতাশ-প্রেমিক।

[২] জামাতা-বাবাজীতে সঙ্কলিত 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী'।

[৩] যেমন বিলাসিনীতে সঙ্কলিত 'ভোজরাজের গল্প'। কালিদাসের সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন অঞ্চলের গল্পও প্রভাতকুমার সরসভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এগুলি মানসী-ও-মর্মবাণীতে বাহির হইয়াছিল।

উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা আছে, ভূমিকার ভিড় আছে। কিন্তু সে ঘটনা যেন রেলগাড়িতে বসিয়া বাহির পর্যবেক্ষণ এবং সে ভিড় যেন রেলষ্টেশনে যাত্রীর ভিড়। অর্থাৎ প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পাই চিত্র-পরম্পরা বা ছোটগল্পের মালা, পাই না মানুষের জীবনের কোন কাহিনী। প্লট রোমান্টিক—তাঁহার ছোটগল্পের চেয়েও রোমান্টিক, এবং কাহিনী চিত্রবহুল এবং তাহার মধ্যে চমকপ্রদ ঘটনাও যথেষ্ট আছে। তবে চিত্র ও ঘটনা প্রায়ই কাহিনীর মধ্যে মিশাইয়া মিলাইয়া যাইতে পারে নাই। ইমোশনের অভাব আছে। আসলে প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কাব্যধর্মের অপেক্ষা নাটকধর্মের লক্ষণই অধিক।

প্রভাতকুমারের অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট সত্যঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বোধকরি কোন কোন ভূমিকা যতটা উজ্জ্বল হইয়া ফোটে অপর ভূমিকাগুলি তেমন ফোটে না। অর্থাৎ যেখানে লেখকের সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব আছে সেখানে রঙ ফিকা হইয়া গিয়াছে। প্রায়ই অবান্তর চিত্রের উজ্জ্বলতায় অথবা ঘটনার চমৎকারিত্বে মূল কাহিনীর কৌতূহল খর্ব হইয়া গিয়াছে, এবং সে কারণে প্রধান চরিত্রগুলি প্রাণহীন ও অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম পাই একটি জায়গায়, রত্নদীপে বৌ-রাণীর ভূমিকায়। (রত্নদীপের কাহিনীর অনুরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সার্ধ শত বৎসরের মধ্যে দুইতিনবার ঘটিয়া গিয়াছে।) ছোট ছোট চরিত্রগুলির অধিকাংশই লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে নেওয়া। তাই সেখানে সার্থকতা সুস্পষ্ট। প্রভাতকুমারের হিউমার অথাৎ স্মিতকৌতুক-ভাব ছোট-খাট চরিত্রগুলিকে—বিশেষত পাষণ্ড-ভূমিকাগুলিকে—হৃদ্য করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে নবীন-সন্ন্যাসী খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তাহার গদাই পাল আবহমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পাষণ্ডদের পংক্তিতে ভাঁড়ু-দত্তের ও ঠক-চাচার পরের আসনেই অধিষ্ঠিত॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) বোধকরি ঠাকুর-বাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট বলিয়াই সাধনার সম্পাদকের মর্যাদা পাইয়াছিলেন সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইবার আগেই। সাধনায় ইঁহার গদ্যপদ্য রচনা কিছু কিছু বাহির হইয়াছিল। তবে প্রথম দিকে কবিতা রচনার প্রতিই ঝোঁক ছিল। ইঁহার কবিতাগুলি 'বৈতানিক' (১৯১২) ও

'দোলা' (১৯১৩) পুস্তিকা দুইটিতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। শান্ত ও বাৎসল্য রসের অন্তর্বাহী ধারা সুধীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষত্ব। এখানে লেখক কতকটা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবে পড়িয়াছেন বলিতে পারি। কবিতাগুলি প্রায় সবই চতুর্দশপদী, এবং এগুলির গঠনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। সুধীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

এণা

জননী অদূরে বসি' কোলের ছেলেরে
স্নেহের বন্ধনে বক্ষে ধরি' বাহুফেরে
দিতেছিল সুধা-নীর—আর মাঝে মাঝে
কত না অপূর্ব ভাষে খোকা-মহারাজে
করে সম্ভাষণ ;—যত না আদর বাড়ে
কন্যা জ্বলে' যায় তত—চাহে আড়ে আড়ে ,—
খেলা তার হ'ল ভার, আসি' একছুটে
মায়েরে জড়ায়ে ধরি'—আধ কথা ফুটে,—
বলে, "মা, খোকারে রাখি' লহ না আমারে!"—
"লহ না আমারে!" কেঁদে বলে বারে বারে।
খোকারে নামায়ে তবে থামে সে রাক্ষসী,
জননীর কোলে যেন হাতে পেল শশী![1]

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচয়ের মুখ্য প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্পে। এগুলি প্রথম এবং প্রধানত 'সাহিত্য' পত্রিকাতেই বাহির হইত। ইঁহার গল্প-সঙ্কলন হইতেছে 'মঞ্জুষা' (১৯০৩) ও ইহার পরিবর্ধিত সংস্করণ 'চিত্রালী' (১৯১৬), 'চিত্ররেখা' (১৯১০) এবং 'করঙ্ক' (১৯১২)। 'মায়ার বন্ধন' (১৯০৪) বড় গল্প। 'প্রসঙ্গ' (১৯১১) প্রবন্ধের বই।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গল্পগুলি শান্ত বাৎসল্যের করুণ মাধুর্যে অভিষিক্ত। 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা',[2] 'বুড়ী', 'পাগল', 'পোড়ারমুখী' ইত্যাদি গল্পগুলির মূল্য স্থায়ী। 'কাসিমের মুরগী'[3] বাঙ্গালা ভাষায় দুই-তিনটি যথার্থ পশু-গল্পের অন্যতম। 'সন্তোষিণীর ডায়ারি'[4] কথ্যভাষায় লেখা। ভাব ভাষা ও বস্তু সব দিক দিয়াই গল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে॥

[1] বৈতানিক। [2] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৭। [3] ঐ ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৮। [4] মঞ্জুষা।

৬

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) ছিলেন সাময়িকপত্র-সেবী সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে ও মধ্য জীবনে দুই চারি বছর বিদ্যালয়ে ও গৃহে শিক্ষকতা ছাড়া তিনি পর পর এই সাময়িকপত্রগুলির সম্পাদনকার্যে সহায়তা অথবা সম্পাদন করিয়াছিলেন —'গ্রামবার্তা', 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' এবং 'ভারতবর্ষ'। জলধর সাহিত্যের দীক্ষা পাইয়াছিলেন হরিনাথ মজুমদার ওরফে "কাঙ্গাল হরিনাথ"এর কাছে। হরিনাথের গ্রামবার্তাতেই ইঁহার প্রথম রচনাগুলি বাহির হইয়াছিল। হরিনাথের জীবনী লিখিয়া[১] এবং হরিনাথের গ্রন্থাবলী সঙ্কলন করিয়া (১৩০৮) জলধর উপযুক্ত শিষ্যকৃত্য করিয়াছেন। সংসারের দুঃখশোকে বীতস্পৃহ হইয়া জলধর যৌবনে বছর তিনেকের জন্য (১২৯৭-৯৯) দেরাদুনে শিক্ষকতাকার্য গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে তাঁহার হিমালয়-চিত্রাবলী ভারতী পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে (১২৯৯-১৩১০)। 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও জের চলিল (১৩০১-১৩০৭)। 'প্রবাস-চিত্র' (১৩০৬), 'হিমালয়' (১৩০৬), 'পথিক' (১৩০৮), 'হিমাচল-বক্ষে' (১৩১১) 'হিমাদ্রি' (১৯১১) ইত্যাদিতে সঙ্কলিত এই হিমালয়-ভ্রমণের ছবিগুলি বহু পাঠককে সহস্রধারা দেবপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ যোশীমঠ পাণ্ডুকেশ্বর বদরিকা গঙ্গোত্রী ইত্যাদি তীর্থে ও সংকটে আনন্দের মানসভ্রমণ করাইয়া ফিরিয়াছে। পরবর্তী কালে জলধর অনেক গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন কিন্তু মনোহারিত্বে ও স্থায়িত্বগুণে এই ভ্রমণচিত্রগুলিই শ্রেষ্ঠ।

জলধরের প্রথম ছোটগল্প বাহির হয় দাসীতে, প্রভাতকুমারের প্রথম ছোটগল্প বাহির হইবার পরের মাসে।[২] তাহার পর ইঁহার গল্প সাহিত্যে বাহির হইতে থাকে। 'ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প' জলধরের প্রথম গল্পসংগ্রহ। দুইটি গল্প দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। মহিষাদলে শিক্ষকতা করিবার সময় জলধর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সংস্পর্শে আসেন। সাহিত্যরচনার এই প্রথমদিকে দীনেন্দ্রকুমারের সহযোগিতা জলধরের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। (দীনেন্দ্রকুমারও ছিলেন গল্প-চিত্রকর, হিমালয়ভ্রমণের নয় গ্রামজীবনের।) দ্বিতীয় গল্পসংগ্রহ 'নৈবেদ্য' (১৩০৭)। তাহার পর 'নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প'

[১] দুই খণ্ড 'কাঙ্গাল হরিনাথ' (১৩২০, ১৩২১)। মানসীতে প্রথম প্রকাশিত।

[২] 'পোষ্টমাষ্টার', অক্টোবর ১৮৯৬।

(১৩১১), 'পুরাতন পঞ্জিকা' (১৩১৬), 'আমার বর ও অন্যান্য গল্প' (১৩১৯), 'পরাণ মণ্ডল' (১৩২১), 'আশীর্বাদ' (১৩২৩), 'এক পেয়ালা চা' (১৩২৫), 'পাগল' (১৩২৭), 'কাঙ্গালের ঠাকুর' (১৩২৭), 'মায়ের নাম' (১৩২৮) ও 'বড় মানুষ' (১৩৩৬)।

প্রথম বড গল্প 'দুঃখিনী' (১৩১৬) তাঁহার প্রথমজীবনের রচনা।[১] পরে 'বড়বাড়ী' নামে প্রকাশিত (১৩২৩) 'মিত্র-পরিবার'ও এই সময়ের লেখা। জলধরের প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস 'বিশুদাদা' (১৯১১, দ্বি-স ১৯১৫)।[২] তাহার পর বাহির হয় 'করিম সেখ' (১৩১৯), 'কিশোর' (১৯১৫), তিন খণ্ড 'অভাগী' (১৯১৫-৩২), 'ঈশানী' (১৩২৫), 'হরিশ ভাণ্ডারী' (১৩২৬), 'চোখের জল' (১৩২৭), 'যোল আনি' (১৩২৭), 'সোনার বালা' (১৩২৮), 'দানপত্র' (১৩২৯), 'শিবসীমন্তিনী' (১৩৩১), 'পরশ-পাথর' (১৩৩১), 'ভবিতব্য' (১৩৩২), 'তিন পুরুষ' (১৩৩৫)[৩] এবং 'উৎস' (১৩৩৯)।[৪]

জলধরের রচনার বিশেষ গুণ সারল্য ও স্বচ্ছতা। পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্র-জীবনের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখবেদনা ইঁহার গল্প-উপন্যাসের বিশেষ বস্তু। নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীর পক্ষ লইয়া জলধর সাহিত্যের দরবারে নালিশ নহে, ক্ষীণ অনুযোগ তুলিয়াছিলেন। সে কাজ হরিনাথের শিষ্যেরই উপযুক্ত। পতিত নারীর পক্ষ নেওয়াতে জলধরকে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বগামী মনে করিলে ভুল করিব না॥

৭

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (?-১৩৩৮) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার গভীর অধিকার ছিল সঙ্গীতবিদ্যায়। গদ্য রচনায় সুরেন্দ্রনাথের ষ্টাইল তাঁহার নিজস্ব। সে ষ্টাইল বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। সকৌতুক ব্যঙ্গ—তা প্রণয়কাহিনী হউক অথবা ভ্রমণবৃত্তান্ত হউক—সুরেন্দ্রনাথের রচনাকে অননুকরণীয় করিয়াছে। গল্পগুলি দুইটি সঙ্কলনে প্রাপ্তব্য—'ছোট ছোট গল্প' (১৯১৫) এবং 'কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৬)।

[১] প্রথমপ্রকাশ জাহ্নবী, ১৩১৫। [২] ঐ মানসী, ১৩১৬-১৭। [৩] ভারতবর্ষে এই উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'তিনপুরুষ' উপন্যাসের নাম পালটাইয়া দেন।

[৪] প্রথমপ্রকাশ 'টিউবওয়েল' নামে (গল্পলহরী, ১৩৩৮-৩৯)।

সুরেন্দ্রনাথের গল্প ও চিত্র এখন অপরিচয়ের রাহুগ্রস্ত। তাই তাঁহার রচনারীতির কিছু নিদর্শন দেওয়া আবশ্যক মনে করি। অল্প পয়সায় আনন্দপর্যটনের অভিলাষী হইয়া লেখক তিন বন্ধু ও দুই পাড়াপ্রতিবেশী সহকারে এক শনিবার প্রাতঃকালে ঘাটালের ষ্টীমারে উঠিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'আনন্দ পর্যটন' গল্পচিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পর্যটকেরা গেঁওখালি হইতে নৌকা করিয়া বেলা তিন প্রহর অতীত হইলে তেরোপেক্যা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

> তেরোপেক্যা গ্রামটি দ্বাপর যুগের বলিয়া বোধ হইল। কোনও রোগ শোক নাই। তবে কখনও কখনও বিসূচিকা হয়। গ্রামের বিশেষত্ব এই যে, সেটা মাঠের মধ্যে, এবং মাঠের বিশেষত্ব এই যে, সেটা গ্রামের মধ্যে। উভয়ে উভয়,—হরিহরাত্মা। মানুষ মাঠে চরিয়া বেড়ায়, এবং গাভীগণ সবৎস গ্রামে চরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। স্ত্রীলোকগণের চুল ছোট ও পুরুষগণের দীর্ঘ।
>
> দীনুবাবুর কাছারী-বাটী পহুঁছিয়া আমরা একটি বৃহৎ আটচালা অধিকার করিলাম। কাছারী-বাটীর নিকটেই একটি পুষ্করিণী, কিন্তু সেটা নূতন কাটান হইয়াছে। মাছ নাই। জল অতিশয় সুমিষ্ট। পূর্বে সেখানে চিনির আড়ত ছিল।...
>
> নিকটেই মিষ্টান্নের দোকান। তাহাতে একই প্রকার মিষ্টান্ন। সেটাকে সন্দেশ, কিংবা মনোহরা, কিংবা রসকরা, অথবা তিলের নাড়ু বলিতে পারেন। একাধারে বহু মুখরোচক পদার্থ সন্নিবিষ্ট ও সুচারুভাবে মিশ্রিত। প্রত্যহ একই ভাব, একই ওজনে প্রস্তুত হয়, এবং প্রত্যহ একই লোকে খায়। খাদ্য ও খাদকের এই চিরন্তন পরিচয় ও স্নেহ-সম্বন্ধ অটুটভাবে কলের ন্যায় চলিতেছে। কেবল আমাদিগের সমাগমে ওজনটা অর্দ্ধসের বাড়িয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে গভীরতা নাই, তবে উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণ আছে। আর আছে চাপা হাসির তড়িৎদীপ্তি। কঠিন গল্প একটি মাত্র আছে, 'যে হেতু ও সে হেতু'।[১] প্লট-নির্মাণের কৌশলে ও রচনারীতির থর্বছন্দে বিষয়ের কদর্যতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যেকালে গল্পটি লেখা হইয়াছিল সেকালের পক্ষে কাহিনীর বাস্তবতা অসমসাহসিক বলিতে পারি॥

৮

প্রভাতকুমার গল্প লিখিতে সবে শুরু করিয়াছেন এমন সময় ছোটগল্প রচনার এক নূতন রকম প্রেরণা আসিল। স্বদেশী গন্ধতৈল কুন্তলীন প্রস্তুতকারী হেমেন্দ্র-মোহন বসু তাঁহার তৈয়ারী দ্রব্যের প্রচার উদ্দেশ্যে গল্প রচনার জন্য কয়েকটি

[১] প্রথমপ্রকাশ সাহিত্যে (১৩১১)।

কুন্তলীন-পুরস্কার পুস্তিকার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা
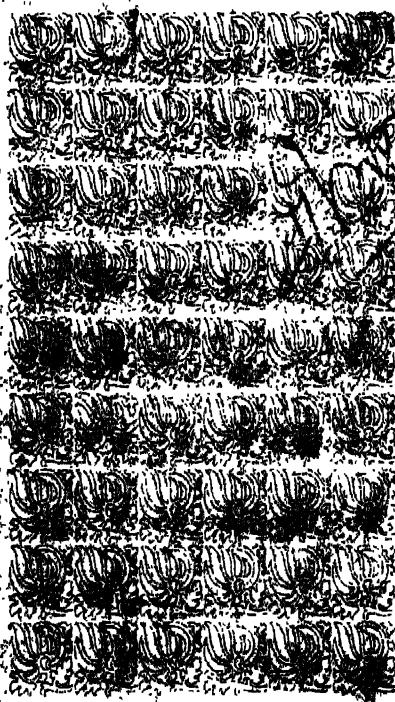
পুরস্কার বৎসর বৎসর দিতে থাকেন (১৩০৩ হইতে)। গল্প ভালো হওয়া চাই এবং তাহাতে স্থকৌশলে তাঁহার প্রস্তুত দেলখোস ও কুন্তলীনের নাম থাকা চাই। এ পুরস্কার অর্থমূল্যে মোটা রকম কিছু ছিল না, তবে যশের দিক দিয়া উপেক্ষণীয় নয়। কুন্তলীন-পুরস্কার প্রত্যাশায় অনেক তরুণ লেখক গল্পরচনায় হাত দিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান্ সাহিত্যসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১] কুন্তলীন-পুরস্কারপ্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও ঘটিয়াছিল, তবে অযাচিতভাবে। 'কর্মফল' গল্পটি যখন কুন্তলীন-পুরস্কার রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩১০) তখন রবীন্দ্রনাথ "গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন"এ এই কথা লিখিয়াছিলেন,

> আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন।

লিখিয়া টাকা পাওয়া রবীন্দ্রনাথেরও বোধ করি এইই প্রথম।

কুন্তলীন-পুরস্কারের মূল্য ছিল তিরিশ (প্রথমে পঁচিশ) হইতে পাঁচ টাকা, এবং পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণত পনের। তবুও পুরস্কারের কৌলীন্যের জন্য প্রার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়াই চলে। ১৩১০ সালে পুরস্কৃত রচনাগুলির মুখবন্ধে[২] প্রকাশক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সাহিত্যের এই নবমধুচক্রে মধুলোভীর ভিড় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি।[৩]

> …মহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যে পুরুষলেখকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এবারের পঞ্চদশটী পুরস্কারের মধ্যে দুইটী ভিন্ন সমস্তই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতীব আনন্দের বিষয়।
>
> এবার পুরস্কারের জন্য সহস্রাধিক লেখক লেখিকার গল্প আমাদের হস্তগত হইয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী হইতে লক্ষপতি রাজকুমার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লেখকই ছিলেন, তাঁহাদের লেখা যে পুরস্কারলাভের যোগ্য হয় নাই, ইহাতে আমরা দুঃখিত আছি। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই গল্প লেখেন নাই; কেহ লিখিয়াছেন 'নন্দী-ভৃঙ্গি-সংবাদ', কেহ লিখিয়াছেন 'ইলোরা-ভ্রমণ', কেহ 'ছারপোকার আত্মকাহিনী', বা আরবা

[১] যেমন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ছদ্মনামে), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বেনামিতে), জগদানন্দ রায়, ইন্দিরা দেবী (চুঁচুড়া), নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী, নগেন্দ্রবালা বসু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

[২] ১৩১১ সালে ভাদ্রমাসে প্রকাশিত।

[৩] এই 'প্রকাশকের নিবেদন' ১৩১০ সালের পুরস্কার-নির্বাচক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা বলিয়া অনুমান করি।

উপন্যাসের গল্প রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন; একজন লেখক গীতা ও দর্শন লইয়া একটি সুদীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন! কোন কোন গল্পের ভাষা ভাল, আখ্যানভাগ নৈপুণ্যের সহিত সম্বদ্ধ—কিন্তু তাহা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের হস্তে অসঙ্কোচে প্রদান করা যায় না। আবার কোন কোন গল্প বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট গল্পলেখকগণের বহুপূর্বলিখিত গল্পের নকলমাত্র!…

আবার কেহ কেহ আমাদের ঠিক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এমন গল্পও লিখিয়াছেন যে, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অর্ধ রাজ্য ও এক রাজকন্যা লাভ হইল, কিম্বা দেলখোসের আঘ্রাণে মৃতপ্রায় রোগী উঠিয়া দৌড়িতে লাগিল!

৯

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরও অনেক লেখকের দুই চারিটি ভালো গল্প সাহিত্যে এবং অপর মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে গল্পলেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) কবিতাও লিখিতেন। 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প' (১৮৯৮) গল্পের বই, 'শতদল' (১৯১০) কবিতাগ্রন্থ। সরোজকুমারীর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সিভিলিয়ান) সাহিত্য-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইনি 'মনীষা' (১৯১৯) নাটকের রচয়িতা। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) গল্পগুলি 'সাজি'-তে সঙ্কলিত। ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (?-১৯৩২) মানসীর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'পরিকথা' (১৯১১), 'ঘরের কথা' (১৯১০) ইত্যাদি। সুবোধচন্দ্র মজুমদার ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়। ইনি কতকটা সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'গল্প' (১৩১৩)।

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস মানসী-ও-মর্মবাণীতে বাহির হইবার আগে 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকায় (১৩১৪-১৭) কিছু গল্প ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার গল্পের বই 'পূর্ণিমা' (১৯২০), 'পঙ্কক' (১৯২২); উপন্যাস[১]—'অপরাজিতা' (১৯২০), 'মানদা' (১৯২১), 'অশ্রুকুমার', 'মোক্ষদা' (১৯২২), ইত্যাদি। গল্পে ও উপন্যাসে মনোমোহন প্রভাতকুমারকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'দাসী' ও 'আর্যাবর্ত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (জন্ম ১৮৭৬) কিছু গল্প ও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন।

[১] প্রথমে মানসী-ও-মর্মবাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

ইঁহার গল্পের বই 'প্রেমমরীচিকা' (১৯০৯) ও 'হৃদয়শ্মশান' (১৯১৯), আর উপন্যাস 'অধঃপতন' (১৮৯৯), 'বিপত্নীক' (১৯০২), 'প্রেমের জয়' (১৯০২), 'নাগপাশ' (১৯০৮), 'অদৃষ্টচক্র' (১৯১৩), 'প্রত্যাবর্ত্তন' (১৯১৯), 'নাতবৌ' (১৯২৩), 'রক্তের সম্বন্ধ' (১৯২৭), 'সান্ত্বনা' (১৯৩৬) ইত্যাদি। ইনি ছেলেদের গল্পও কিছু লিখিয়াছেন।

অন্যান্য গল্প-রচয়িতার মধ্যে ইঁহারাও এখানে উল্লেখযোগ্য—প্রকাশচন্দ্র দত্ত (সাহিত্যের লেখক)[১], পাঁচুলাল ঘোষ[২], ভবানীচরণ ঘোষ (১৮৬২-১৯২৫)[৩], সরোজনাথ ঘোষ (১৮৭৮-১৯৪৪)[৪], আমোদিনী ঘোষ[৫] ইত্যাদি॥

[১] গল্পের বই 'পঞ্চমুখী' (১৯০৪)। [২] গল্পের বই 'আঙুর' (১৯১১), উপন্যাস 'আঁধারের শিউলী' (১৯২১) ইত্যাদি। [৩] গল্পের বই 'পরিণয়-কাহিনী'। [৪] গল্পের বই 'মস্তকের মূল্য' (১৯০২) ইত্যাদি। [৫] গল্পের বই 'যূথিকা' (১৯১১)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম দশবছরের কবিতা

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে বাঙ্গালা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রতাপের শুরু। তরুণ ও শিক্ষিত লেখকলেখিকারা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিচিত্র ভাব, সরল ও হৃদ্য রীতি, এবং মসৃণ ও মধুর ছন্দ অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই প্রণোদিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের স্বাদ কিছুমাত্রও অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষমতা থাকিলে কবিতারচনায় হাত দিতে ইতস্তত করিতেন না। সেকালের মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহার প্রচুর সাক্ষ্য মিলিবে। বহুশাখ ও বহুবিসর্পিত রবীন্দ্র-কবিতার অনুকরণে বাহবা পাওয়া যেমন অ-কষ্টসাধ্য, অনুসরণে নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করা তেমনই অসাধ্য। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আদ্য—এই দুই দশকে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অগনতি, কিন্তু লব্ধকাম কবির সংখ্যা দুই চারিটির বেশি নয়। তথাপি একথা স্বীকার করিব যে অনেকেই দুইএকটি করিয়া ভালো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বাঙ্গালা কবিতা নবনব রূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। কবি আপনার সৃষ্টির মায়া পদে পদে কাটাইয়া নূতন নূতন সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার পিছু পিছু অনুকারকেরাও ছুটিয়াছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'শিশু'র কবিতাগুলিকে মাসিকপত্রে ছাপাইতে রাজি হন নাই।[১] পরবর্তী কালেও দেখিয়াছি মাসিক-পত্রিকায় বলাকার সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দের কবিতার নকল, পলাতকার কবিতা-প্যাটার্ণের মক্‌শের পর মক্‌শ।

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে যাঁহারা ব্যাপকভাবে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)। (একদা ইনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে 'কণিকা' উৎসর্গ করিয়াছিলেন (১৮৯৯)।[২]) সকল প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রিকাতেই প্রমথনাথের কবিতা প্রকাশিত হইত।

১ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড পৃ ১০৫।

২ প্রমথনাথের গ্রন্থাবলী জলধর সেনের সম্পাদনায় সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৫-১৬)।

রবীন্দ্রনাথ কবিযশঃপ্রার্থীদের সর্বদা উৎসাহ দিতেন এমন প্রমাণ পাই নাই, তবে গদ্যরচনায় তিনি যে নবীন লেখকদের উৎসাহিত করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। কবিতারচনার অধিকারবাদ স্বীকার করিতেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ জানিয়া শুনিয়া ভালোমানুষি করিয়া সর্বদা কবিতারচনার সমর্থন করেন নাই। তবে তাঁহার স্নেহভাজন কবিযশঃপ্রার্থীরা তাঁহার কাছে প্রশ্রয় পাইত, এবং তিনি তাঁহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দিতে কখনো অনবসরের অজুহাত দেখান নাই। (এ কথা কোন কোন কাব্যকর্তা স্বীকার করিয়াছেন।) ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তদানীন্তন শিক্ষক (পরে কলিকাতায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য টেনিসনের 'এনক্ আর্ডেন' অবলম্বনে 'গৃহহারা' (১৩১২) রচনা করিয়াছিলেন। এই গাথা-কবিতাটির মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন,

> পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি অনুগ্রহপূর্বক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

গৃহহারায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শ সহজেই ধরা পড়ে।

কাব্যকর্তার স্বীকারোক্তি না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের রিপুকর্ম বোঝা যায় অনেকের রচনায়। শুধু তাহাই নয়। বহু নবজাতকের যেমন তেমনি বহু কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট হাত ছিল। প্রমথনাথ চৌধুরীর 'পদচারণ' কাব্যের নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া, নিরুপমা দেবীর 'গোধূলি' (১৩৩৫) কাব্যের নামও রবীন্দ্রনাথ রাখিয়াছিলেন॥

২

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধি-দশক দুইটিতে, রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে দুইজন মাত্র কবি ছিলেন যাঁহাদের রচনার প্রভাব সমসাময়িক তরুণ কবিতা-লেখকদের উপর অল্পস্বল্প পড়িয়াছিল। ইঁহারা হইতেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। দেবেন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার অজস্রতা প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এবং তাঁহার প্রভাব এই সন্ধি-যুগান্তের দিকেই কার্যকর হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা নয়, বৈঠকি-হাসির-গানগুলি কোন কোন শক্তিমান্ লেখককে গান-রচনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। আলোচ্য সময়ে গানরচনার ধারাটি বিশেষভাবে বেগবান্ হইয়াছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত ও স্বদেশীগানের গভীর আবেদনে এবং অংশত দ্বিজেন্দ্রলালের বৈঠকি গানের জনপ্রিয়তায়।

রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রেরণায় যাঁহারা গান লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রজনীকান্তের গান দেশের সর্বত্র জনগণের চিত্তে যতটা আবেগচঞ্চলতা জাগাইয়াছিল ততটা রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর কোন রচনার দ্বারা হয় নাই। কবিতা হিসাবে রজনীকান্তের রচনার বিশেষ দাম নাই, কিন্তু গান হিসাবে তাহার সাময়িক মূল্য ছিল। এই বিষয়ে রজনীকান্তকে কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রজ বলিতে পারি।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।[১] তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ভাবুক ভক্ত ছিলেন। এই গুণ রজনীকান্তেও বর্তিয়াছিল। রজনীকান্ত অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীতপটু ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি তাই গানের মধ্য দিয়াই পথ খুঁজিয়াছিল।

প্রথম জীবনে রজনীকান্ত কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। রাজশাহীতে যখন তিনি উকীল, সেই সময়ে (১৮৯৫) তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত পরিচিত হন। সেই হইতে রজনীকান্তের হাসির-গান রচনার সূত্রপাত। ইনি ভক্তিরসের গানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান এবং কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল গান হইতে। (হরিনাথের এক প্রধান ভক্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রজনীকান্তের সুহৃৎ ছিলেন।) রজনীকান্তের কোন কোন গানে "কান্ত" ভনিতা দেখা যায়। এই ভনিতা দেওয়ার রীতি হরিনাথের রচনাসূত্রে পাওয়া।

রাজশাহী-সিরাজগঞ্জের বাহিরে বৃহৎ বাঙ্গালাদেশের মর্মস্থল কলিকাতায় রজনীকান্তের প্রতিষ্ঠালাভ হইল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" গানটির দ্বারা। গানটির সম্বন্ধে কবি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ডায়ারিতে লিখিয়াছিলেন,

> স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবি ব'লে তারা আমাকে ভালবাসে।[২]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছিলেন,

> ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েক দিন পরে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।[৩]

১ 'পদচিন্তামণিমালা' (১২৮৩)।

২ 'কান্তকবি রজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৭৩।

৩ ঐ ৭৬।

গানটির সাহিত্যিক মূল্য কিছুমাত্র না থাকিলেও ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যই এখানে সমগ্র উদ্ধৃত হইবার যোগ্য।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

হাসির গানের উদাহরণরূপে 'তিনকড়ি শর্মা'র' শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

(এই) দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ
(ছাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব।
(দেখো) আমি তিনকড়ি শর্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(ছাখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী
আমি যার জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হামবড়া" প্রেসে,
সোণার আঁখরে ছাপ্‌ব।

রজনীকান্তের সরল নম্র স্নিগ্ধ বিশ্বস্ত আনন্দময় কবিহৃদয়ের প্রকাশ রহিয়াছে তাঁহার ভক্তিরসের গানগুলির মধ্যে। মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্বে রজনীকান্ত যখন হাসপাতালে তখন তাঁহার আগ্রহ জানিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখা করিতে গিয়া-

১ 'বাণী'।

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব করিতে চূর" এই গানখানি রচনা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা শুধু রজনীকান্তের কবি-আত্মার প্রশস্তি নহে, সবদেশের সবকালের মহৎ মানবাত্মার অনুপম জয়কার।

> সে দিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সে দিন আপনি আমার "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—
>
> "—এ রাজ্যেতে
> যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
> যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
> পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
> ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"
>
> ঐ কথা হইতে আমার মনে হইয়াছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সে দিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।
>
> আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।

মরণান্তিক রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের গান ও কবিতারচনা বন্ধ হয় নাই। কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান এই সময়েই লেখা।

রজনীকান্তের প্রথম বই 'বাণী' (১৯০২) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উদ্যোগে

বাহির হইয়াছিল। কবির জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত অপর গ্রন্থ হইতেছে 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'আনন্দময়ী' (১৯১০) ও 'বিশ্রাম' (১৯১০)। পরে বাহির হয় 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩) ও 'শেষদান' (১৯২৭)॥

৩

অতুলপ্রসাদ সেনও (১৮৭১-১৯৩৪) সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন এবং কবিতারচনা দিয়া সাহিত্যজীবন শুরু করিয়া অচিরে শুধু গানেই নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।[১] তাঁহার কোন কোন গান কবিতার ছাঁদে লেখা। অতুলপ্রসাদের গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে। পশ্চিমী গজল প্রভৃতির ঢঙে সুর তিনিই বাঙ্গালা গানে প্রথম চালাইয়াছিলেন। গানগুলির রচনায় রবীন্দ্র-রচনার ছায়া ও কায়া বেশ স্পষ্ট। আসলে তাঁহার গানের পসরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানের টুকরা দিয়া সাজানো। যেমন, "কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা"—রবীন্দ্রনাথ, "আমি কি আর কব"; "ওহে নীরব! এস নীরবে"—রবীন্দ্রনাথ, "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"; "আর কত কাল থাকবে বসে দুয়ার খুলে, বঁধু আমার"—রবীন্দ্রনাথ, "দিবসরজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি"; "একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে"—রবীন্দ্রনাথ, "কূল থেকে মোর গানের তরী দিলাম খুলে"; ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুইএকটি গানে অতুলপ্রসাদ দাশরথি-নীলকণ্ঠের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। যেমন, "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায় বলছ হরি 'আমায় ধর'"। গানটির শেষের দুই ছত্র,

> শকতি নাই তোমায় ধরি
> হার মেনেছি, হে শ্রীহরি!
> দিয়ে খুলি চোখের ঠুলি
> দেখা দাও হে দুঃখহর।

অতুলপ্রসাদের দুই-তিনটি জাতীয়-সঙ্গীত একদা বহুপ্রচলিত ছিল। যেমন, "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মি! উঠ আজি জগতজন-পূজ্যা"; "হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর"; "বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে"। শেষের গানটির প্রচলন এখনও আছে।

[১] ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে অতুলপ্রসাদের 'চোর' কবিতা বাহির হইয়াছিল।

অতুলপ্রসাদের গানের সংকলন 'কয়েকটি গান' ইহারই পরিবর্ধিত সংস্করণ 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১)॥

৪

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দুইজন তরুণ কবির রচনায় স্বকীয়তা প্রকাশোন্মুখ হইয়াছিল। এক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার কবিতার আলোচনা গদ্যরচনার প্রসঙ্গে করিয়াছি। অপর প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। প্রিয়ম্বদার মাতা প্রসন্নময়ী বিগতযুগে কবিতারচয়িত্রী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[১] মাতুল প্রমথনাথ চৌধুরী পরবর্তী কালে সাহিত্যের দিক্‌পাল হইয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথ ও প্রিয়ম্বদা প্রায় একসময়েই লেখা শুরু করিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদার প্রথম কবিতা ও বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা ১২৯৩ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কবিতা দুইটির মধ্যে বাহ্য ও আন্তর সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। বলেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল চিত্রকর্মের দিকে, তাই তিনি অনতিবিলম্বে গদ্যের পথেই স্বচ্ছন্দতা বোধ করিলেন। প্রিয়ম্বদার রচনা ভাবগভীর লিরিকের সরণি ধরিয়া রহিল। বলেন্দ্রনাথের মত প্রিয়ম্বদারও কবিকর্মে নিষ্ঠা ছিল। উভয়েরই রচনার বিশিষ্ট গুণ বাক্‌শুচিতা এবং সুগভীর সৌন্দর্যানুভূতি। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বাস্তবস্বীকারী ও বুদ্ধিনিষ্ঠ, প্রিয়ম্বদার প্রতিভা ভাবপরতন্ত্র ও হৃদয়নিষ্ঠ। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় হৃদয়াবেগহীনতা ও নিরাসক্তির প্রকাশ, প্রিয়ম্বদার কবিতায় হৃদয়াবেগ অত্যন্ত গভীর বলিয়াই তাহার প্রকাশ মৃদু এবং অচঞ্চল।

রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতীর সম্পাদক (১৩০৫) তখন একটি সংখ্যায় (কার্তিক) প্রিয়ম্বদার পাঁচটি কবিতা[২] ও দুইটি গদ্যরচনা বাহির হইয়াছিল। কবিরূপে প্রিয়ম্বদার এইই যথার্থ আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন প্রিয়ম্বদার দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ। ইতিমধ্যে 'রেণু' (১৩০৭) বাহির হইয়া লেখিকার কবিপ্রতিষ্ঠা অসংশয়িত করিয়াছিল। রেণুর অধিকাংশ কবিতা সনেট। বলেন্দ্রনাথের কবিতার ফর্মও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য-ফর্মের মধ্যে নবীন কবিরা সনেটই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ভাবের অস্ফুটতা ও বস্তুর ক্ষীণতা চতুর্দশপদীর আধারে যেমন গাঢ়তা পায় গীতিকবিতার অন্য ফর্মে

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৩৮৮ দ্রষ্টব্য।

[২] 'চাঞ্চল্য', 'ম্লানিমা', 'প্রেমকোজাগর', 'অজ্ঞাতে' ও 'প্রত্যাগমন'।

তেমন পায় না। প্রধানত এই কারণেই সনেট-ফর্মের কবিজনপ্রিয়তা হইয়াছিল সেকালে। প্রিয়ম্বদার রচনায় সনেটের রূপ একটু নূতনতর হইয়াছে।

রেণুর অখণ্ডগ্রথিত ভাবৈকরস কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের লাজনম্র প্রকাশভীরু কুণ্ঠিত প্রেমের করুণ আত্মনিবেদন একতানে কলগুঞ্জরিত। নারী-হৃদয়ের গোপনকরুণ ব্যাকুলতা স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া কবিতাগুলির মধ্য দিয়া যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে অন্তরের অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়াছে।

একটি উদাহরণ দিই।

বড় যত্নে, বড় স্নেহে কত শতবার
এতটুকু ঠাঁইজোড়া নামটি তোমার
লিখে মুছে ফেলি তবু, মসি-রেখা-জালে
বহু ধৈর্যে লুপ্ত তারে করি এককালে!
হেথায় নিভৃতকক্ষে মর্ম-অন্তঃপুরে
যেথা লেখা তব নাম সর্ব ঠাঁই জুড়ে
কোন চেষ্টা নাই সেথা মুছিতে তাহারে,
নবীন সুন্দর বর্ণে শুভ্র আলোধারে
করিতে উজ্জ্বলতর নিত্য সাধ যায়,
পত্র-পুষ্প-লতিকার লাবণ্য-লেখায়!
ললিত মধুর ছন্দে আনন্দ সঙ্গীতে
বেষ্টিয়া রাখিতে তারে দিবসে নিশীথে।
সেথা শুধু দেবতার করুণ নয়ন,
বাহিরে নিষ্ঠুর বিশ্ব, কৌতুক বচন!

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। তাহা থাকিবেই, নহিলে কবিতা হইত না। কিন্তু সে প্রভাব প্রিয়ম্বদার কাব্যলতিকার অবলম্বনী নয়, স্থিতিভূমি। 'রেণু' প্রকাশিত হইলে সর্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিল। কাব্যটির সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই যথার্থ মর্মানুধাবন।

> 'রেণু' ব্যাপক প্রতিভার চতুর্দিক্‌ব্যাপ্ত অসংখ্য ভাবফুলের আকাশ-ভরা গন্ধরেণু নহে—একটিমাত্র ভাবের বাগানে একজাতীয় মাত্র ফুলের রেণু,—আপনার মধ্যে আপনি এত সম্পূর্ণ যে, প্রথমটা ভাবিয়া পাই না,—এ কবির আর কোন দিকে বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না। কিন্তু আর একটু অনুধাবন করিলে একটি রন্ধ্র পাওয়া যায়। বাস্তবিক দুঃখে অভিভূত করিয়া ভাঙিয়া দেয়, আনন্দে অভিভূত করিয়া সবল করে। রেণুর কবি বিশ্বাসের বলে যেন শেষোক্তরূপেই অভিভূত। তাই তাঁহার উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া রেণুতে যে প্রকৃতির ছবিগুলি দেখিলাম, কিংবা অন্য দুই-একটি

ভাবের আলোচনা দেখিলাম—তাহাতে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-মিলনের ছায়ালোকপাত থাকিলেও, সেগুলির মধ্যে যেন কবির একটু স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সেগুলি যেন ঐ সর্বগ্রাসী ভাবটির ছায়া ছাড়াইয়া একটু এদিকে ওদিকে কাঁপিতেছে। এই পথে রেণুর কবির বিকাশের সম্ভাবনা যেন আছে বলিয়া বোধ হয়।

রেণুর পরে প্রিয়ম্বদার কবিতা আরও আঁটসাঁট, ক্ষুদ্রতর রূপ ধরিল। তাহাতে তাঁহার কাব্যে যেন সংস্কৃত কবিতার সংহতি দেখা দিল। চতুর্দশপদী হইল অষ্টপদী ও ষট্পদী। যেমন,

আশ্বাস

যে-মিলন অসম্পূর্ণ রহিল জীবনে
পূর্ণ তাহা হবে পরে অজানা ভুবনে,
এ আশায় আছি বুক বেঁধে, তাই যবে
সন্ধ্যারবি অস্ত যায় একান্ত নীরবে,
বিরহকাতর শ্রান্ত হৃদয়েরে বলি—
হে আর্ত আশ্বস্ত হও, অই গেল চলি
দিবস মিলনহীন ;—দেখ আনিয়াছে
প্রিয়-সম্মিলন আরো একদিন কাছে ॥[২]

এই রকম কতকগুলি কবিতা রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (১৩০৮ হইতে) বাহির হইয়াছিল। এগুলিতে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের সংশোধনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও উৎকর্ষ বিস্ময়াবহ। এরকম কয়েকটি কবিতা পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা বলিয়া ভুল করিয়া 'লেখন'এ (১৯২৭) স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন। যেমন,

শুভলক্ষণ

আকাশ গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
ও কি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি! পূর্ণনাম ধরে'
আজি ডাকিবার দিন ; এ হেন সময়
সরম সোহাগ-হাসি-কৌতুকের নয়!
আঁধার অম্বর, পৃথ্বী পদচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন ![৩]

'রেণু'র পথ বাহির হয় 'পত্রলেখা' (১৯১০) ও 'অংশু' (১৯২৭) এবং মৃত্যুর পরে 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯)।

[১] সমালোচনী, প্রথম বর্ষ (১৩০৮-০৯)। [২] প্রথমপ্রকাশ ঐ।
[৩] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯।

প্রিয়ম্বদার কবিতার বাণী স্মিত এবং প্রসন্ন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্যঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করেনি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপর যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।" প্রিয়ম্বদার কবিতায় আমরা রচয়িত্রীকে কবি এবং নারী দুই রূপেই প্রকাশিত দেখি।

প্রিয়ম্বদার গদ্যরীতিও সহজ ও সরল। তাঁহার গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিশুপাঠ্য 'কথা ও উপকথা'। গল্পগুলি ইংরেজি মূল অবলম্বনে কথ্যভাষায় লেখা এবং 'মুকুল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ॥

৫

কাব্যপ্রতিভায় সফলতার অসন্দিগ্ধ আশ্বাস লইয়া সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) দেখা দিয়াছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্ষণকালের জন্য। ১৩০৮ সালের শেষে তাঁহার রচনার প্রকাশ শুরু, ১৩১০ সালের মাঘ মাসে তাঁহার জীবনান্তের সঙ্গে অবসান। ইহারই মধ্যে সতীশচন্দ্র অল্প যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি ও গদ্য লেখকদের মধ্যে সম্ভাবিত শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিতটুকু মাত্র আছে।[১]

কলিকাতায় বি এ পড়িতে আসিয়া সতীশচন্দ্র পরীক্ষার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ অজিতকুমার চক্রবর্তী। সতীশচন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন না, অভাব যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্তররসে পরিপূর্ণ ছিল। অজিতকুমার লিখিয়াছেন,

> কলিকাতায় তাঁহার বাসায় তাঁহার হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশা দেখিলে সেখানে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে হইত। দারিদ্র্য যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কররূপে ঘিরিয়া আছে তাহা সেই নিয়তরসপিপাসু কবিটি বোধহয় ভাল করিয়া জানিতেনই না। আনন্দের সম্পদ তাঁহার এতই অধিক পরিমাণে ছিল।[২]

[১] সতীশচন্দ্রের অনেক রচনা প্রথমে রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ও তাহার অনুজা সমালোচনীতে বাহির হইয়াছিল (১৩০৮ চৈত্র হইতে ১৩১১ বৈশাখ)। অজিতকুমার চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন হইতে 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' বাহির করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী-পত্রিকায় (ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। [২] 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮)।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে-ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে।[১]

রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র পরীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া কাহারো কোন কথা না শুনিয়া আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন প্রাণমন দিয়া (১৩০৮ সালের শেষে)। তাহার আগে থেকেই তিনি কবিতা লিখিতেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

> সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া সতীশচন্দ্র পরিপূর্ণ ও অভেদ ভাবে পাইলেন বিশ্ব-প্রকৃতিকে ও রবীন্দ্রনাথকে। এই পাওয়াতেই তাঁহার অন্তর-বাহির ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার রচনার অসামান্যতা আর অনুজ্জ্বল ও প্রচ্ছন্ন রহিল না। সতীশ-চন্দ্রই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব" বলিয়া স্বীকার করিলেন। অজিতকুমারকে লেখা একটি চিঠিতে এই কথা পাই।[২]

> 'গুরুদেবের' রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি—কারণ কি জান? এই দেখ চারিদিকে দুপুরের রৌদ্র নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে—এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না—এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ সুদূর আকাশ হইতে আমাদের উপবনে আমাদের প্রাণের উপর চাঁপাফুলের জ্যোতিঃ ফেলিয়াছে—মাঠের একদিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেকদিকে পালাইতেছে—যে এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে—আর মনে পড়িতেছে অন্তর-বাহির-সুন্দর আমাদের ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেইজন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত করি, তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে 'গুরুদেব' বলিলাম—।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিয়া সতীশচন্দ্র আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিতেছিলেন। সেই চেনার ও বোঝার আলোয় তাঁহার জীবনভাবনা ও রস-দৃষ্টি প্রসন্নতর হইতেছিল। প্রায়-বালকবয়সী তরুণটিও তাহার হৃদয়মাধুর্যে ও মননশীলতায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্থানলাভ করিয়াছিল। প্রথম বয়সের পর

১ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৩৪৮)।

২ বিশ্বভারতী-পত্রিকা (ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পৃ ১৮৫-৮৬।

রবীন্দ্রনাথ খুব কম ব্যক্তির প্রতিই এতটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের স্মৃতি যে তাঁহার অন্তরের কত বড় সম্পদ এবং শান্তিনিকেতনের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে তাহা অনেক উপলক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন গদ্যে পদ্যে। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই রবীন্দ্রনাথ স্বসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন,

> সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পাবে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।
>
> কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।
>
> আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না।[১]

সতীশচন্দ্রের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের অন্যরচনার মধ্যেও লুকোচুরি খেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজপুত্তুর'[২] সতীশচন্দ্রের কথা স্মরণ করায়। সতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'রাজকন্যা'।[৩] রাজকন্যাকে তিনি মাটির জগতে খুঁজিয়া পান নাই এবং খুঁজিয়া পাইতে চাহেনও নাই, "রাজকন্যা চিরকাল পরে পরে তাহার সুখ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক—প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া পৃথিবীর উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক"। রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্রকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও, "আর রাজপুত্তুরের এ কি বেশ? এ কি চাল? গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি করে' বাসাখরচ চালায়।" রাজপুত্তুরের পরিণাম সতীশচন্দ্রেরই, "সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগেছিলেন। তিনি যম।"

১ 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০)। ২ লিপিকা।

৩ প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১০।

'স্পাই' কবিতাটিতেও[১] সতীশচন্দ্রের ভূমিকা—জোড়াসাঁকোর আসরে।

দেয়াল ঘেঁষে ঐ যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার ঊর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চষমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে লেখে, হয়ত বা সে কবি
কিম্বা আঁকে ছবি।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মবান্ধবের পরে সতীশচন্দ্র আসিয়াছিলেন শিক্ষক হইয়া। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন যাহাকে বলে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ বা ডিসিপ্লিনেরিয়ান, আর সতীশচন্দ্র ছিলেন "আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।" এই দুই ব্যক্তি অচলায়তনের যথাক্রমে মহাপঞ্চক ও পঞ্চক ভূমিকা-দুইটির বাস্তব বীজ বলিয়া মনে করি।

সতীশচন্দ্রের প্রতিভা অনুশীলনের দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছিল। ছাত্রজীবন হইতে তিনি ছিলেন ইংরেজী কাব্যরসিক, বিশেষ করিয়া ব্রাউনিঙের ভক্ত পাঠক। কালিদাসের কাব্যেও তাঁহার অন্তরঙ্গ অধিকার ছিল। শান্তিনিকেতনে আসিয়া তিনি কাব্য ও ভাষা দুইয়েরই ব্যাকরণের রীতিমত চর্চা শুরু করিয়াছিলেন। "শ্রীযুক্ত রবিবাবুর lines অনুসারে বাঙ্গালায় ছন্দশাস্ত্র লিখিব কল্পনা করিতেছি।"[২] সতীশচন্দ্র বাঙ্গালা পড়াইতেন, "ছন্দ শুনাইয়া ছন্দবোধ এবং ছন্দরচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন।"[৩] নিজের সাহিত্য সাধনার আদর্শ যে কী তাহা তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে প্রকারান্তরে জানাইয়াছিলেন।

[১] রচনাকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯। [২] অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্র (বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পৃ ১৮৭। [৩] অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ঐ পৃ ২০৯)।

Prophets কিছু রোজ আসে না—interimগুলি আমাদিগকে সাহিত্যের democratic culture দিয়া ভরিয়া রাখিতে হইবে। স্বদেশের ভাবগতি এবং conditions দেখিয়া তাহার মধ্যে মানবের Highest ideals of beauty জাজ্বল্যমান করিয়া দেখিতে হইবে।—এ ত গেল পরের কাজ—তার পরে আত্মোৎকর্ষের পক্ষে আমার ত মনে হয় সাহিত্য নিতান্ত দরকার। সাহিত্যেই আমরা আমাদিগকে ideally create করি—যেমন progenyতে আমরা আর এক দিকে create করি।……আমার আশা এই যে একটি নিঃস্বার্থ, বিপুল উৎসাহ-প্রবাহ আসিয়া আমাদের সাহিত্যকে সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়া যাইবে—এবং তারি একটি রুদ্ধ waterhead আপনি। Culture এবং পরিশ্রমের দ্বারা আপনার ভিতর হইতে সেই রুদ্ধ স্রোত বাহির হইবে এই আশায় আমি বসিয়া আছি। আমি এখন শুধু নিজেকে তৈয়ার করিতেছি এবং আজকালকার আমার লেখা অল্পাধিক experimental জানিবেন।[১]

সতীশচন্দ্র অল্প কয়দিন ডায়েরি লিখিয়াছিলেন।[২] সেই ডায়েরিটুকুর মধ্যে তাঁহার জীবনভাবনার ও সাধনার মর্মকথা আছে। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন,

কবিতারচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা-সৌন্দর্য এবং বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্তিগুলি কবে বাহির হইবে? আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে রসিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির মধ্যে রোমান্টিক ভাবটাই প্রবল ছিল—সে রোমান্স বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবিমানসের ঐক্যতান। সেই সঙ্গে ছিল চোখের ভালো-লাগা। সতীশচন্দ্রের কবিতায় ইহা ছবির রঙ লাগাইয়াছে। যেমন,

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল্।
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল!
কুন্তলে তোর বিকচ কুসুম
পাতা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে যেন অজানা গগনতল!
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্।[৩]

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।

১ বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ঐ পৃ ১৭৭-৭৮।
২ সতীশচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রকাশিত। ৩ 'প্রাতঃপ্রবুদ্ধা' (প্রথমপ্রকাশ সমালোচনী, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৮-০৯)।

কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল।
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান।[১]

তোমার চরণমূলে কুণ্ডলিয়া রব—
সুখ দুঃখ হর্ষ আশা দৈন্যে নোয়াইয়া,
ধীরে ধীরে গর্ব ভাঙ্গি লুটাইব হিয়া!
তুমি দিও পাদস্পর্শ নিত্য অভিনব!
নিত্য মোরে জাগাইও বিরল প্রত্যূষে—
শিশিরের বিন্দুসম-শষ্পে লম্বমান—
এক ফোঁটা অশ্রু যেন,—কোবো অবসান
নিত্য মোব—দুদণ্ডেই তব তাপে শুষে।[২]

কাহিনী-গর্ভ (ballad) কবিতায় সতীশচন্দ্রের সফলতা সবচেয়ে পরিস্ফুট। যেমন, 'দুয়ো-রাণী'[৩] ও 'চণ্ডালী'[৪]। ভাষায় ভাবে ও ছন্দে দুয়ো-রাণী নিটোল রচনা। যেমন,

তার তরে শুধু ব্যাপিয়া হৃদয়
সুগভীর ম্লানছায়া লেগে রয়—
যাহা নাই তারি অভিমুখে বয়
নদীর মতন বনছায়া দিয়া
আপনার মাঝে আপনি কাঁদিয়া!
নিজে সে কি ধায়? হায়, মূঢ় হিয়া!

'চণ্ডালী' কবিতা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে লেখা। তিনিই কবিতাটিকে নাট্যরূপ দিতে বলিয়াছিলেন।[৫] খানিকটা লেখাও হইয়াছিল।[৬] শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ

[১] 'নিশীথিনী' (প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১১)।

[২] 'আত্মসমর্পণ' (প্রথমপ্রকাশ সমালোচনী, আষাঢ় ১৩০৯)।

[৩] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

[৪] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১০।

[৫] "রবিবাবুর অনুদিষ্ট 'আনন্দ ভিক্ষু'র কাহিনীটিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবু উহাকে ভাল বলিয়াছেন—তবে তাঁহার ইচ্ছা ওটাকে Drama করি। কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন যেন হইতেছে না।" অজিতকুমারকে লেখা চিঠি (বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৮৭)। এই চিঠিতে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি সংযুক্তার স্বয়ংবর লইয়া একটি কাহিনী-কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুল'এ ছাপাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

[৬] "বৌদ্ধ নাটক বাড়ীতে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া, প্রথম অঙ্কের কতদূর লিখিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছি।" সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি (বিশ্বভারতী-পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৭৯)।

নিজে কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন 'চণ্ডালিকা' নামে (১৯৩৩)। চণ্ডালীর কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

সেই বটতরুমূল, আভরণহীনা সেই ছবি,
সেই চমকিত চোখ!—নিখিল পুড়িছে—দীপ্ত রবি—
তার মাঝে বটচ্ছায়ে তৃষাতুরে করে জলদান—
বহ্নিবর্ণে কে লিখিল নিদারুণ এই ছবিখান
ভিক্ষু আনন্দের বুকে! দাঁতে দাঁত ঘরষি' সন্ন্যাসী
নিজমর্ম হ'তে যেন আক্রোশে উৎসারি রক্তরাশি
চাহিল ভুলিয়া যেতে'!—হায়!—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধঝটিকা বিদারি'!
হাহা করি চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—
বিশ্ব দাবাইয়া নভ বারবার করে গরজন—
আপনার সঙ্গে যুঝি' তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি'
আনন্দ, প্রান্তরপথ চলিছেন অতিক্রম করি';
শাখাপত্র ওড়ে মুখে, ত্রিবস্ত্র বাহিয়া পড়ে নীর—
কি টানে চলিছে ভিক্ষু অম্বিকার সুদূর কুটীর!

সতীশচন্দ্রের শেষ রচনা দুইটি কবিতা—'তাজমহল' ও 'আগ্রাপ্রান্তরে'।[১] শান্তিনিকেতন হইতে সতীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন সেইসঙ্গে কবিতা দুইটিও পাঠাইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের শোচক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ তাজমহল কবিতার ভাববিশ্লেষণ করিয়া তাহার সহিত সতীশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর তাৎপর্য অনুভব করিয়া লিখিয়াছিলেন,

মমতাজের সৌন্দর্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌন্দর্যের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সম্মুখবর্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ গত মাঘীপূর্ণিমার দিনে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

তাজমহলে একটি চমৎকার উৎপ্রেক্ষা আছে,

আমি দেখি নাই সেই মর্মর কবর,
জ্যোৎস্নাচন্দনের রসে রাত্রি জরজর—

গদ্যরচনায় সতীশচন্দ্রের প্রবীণতা আরও পরিস্ফুট। ব্রাউনিঙের 'আরো একটি

[১] প্রথমপ্রকাশ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০।

কথা' কবিতার ও প্যারাসেল্‌সাস কাব্যের, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণের, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর রেণুর ভাব- ও রস-বিশ্লেষণ করিয়া সতীশচন্দ্র যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডায়েরিতে যতটুকু পাই তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন শক্তির আবির্ভাব সূচিত করে। মহাভারত হইতে উতঙ্কের কাহিনী লইয়া সতীশচন্দ্র 'গুরুদক্ষিণা' নামে বালকপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (১৯০৪)। বইটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ্য ছিল।

সতীশচন্দ্রের বাল্য এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় আর এক সুহৃৎলাভ হয়—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার রচনাশক্তি যেন এই দুই বন্ধু ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। অজিতকুমার প্রবন্ধে ও সমালোচনায় সতীশচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কাল্‌চার ও পরিশ্রমের দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন রসদ যোগাইতে প্রবৃত্ত হইলেন॥

৬

মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এবং কবিতার বই প্রকাশ করিয়া যাঁহারা অল্পবিস্তর কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ইহাদের রচনার মধ্যে ভালো কবিতা কিছু কিছু আছে। অনেকের বাণীতে প্রসন্নতাও ছিল। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের কথা বলিতেছি।

সতীশচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মাঝামাঝি একজন লেখকের নাম অবশ্য-কর্তব্য। ইনি চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩-?)। তিনখানি ছোট কবিতা-পুস্তক ছাড়া ইঁহার আর কোন বই নাই। এই তিনখানি বই হইতেছে 'অঞ্জলি' (১৯০৭, দ্বি-স ১৯১৯), 'তপোবন' (১৯১২) এবং 'ধ্যানলোক' (১৯১৯)। নানা মাসিক পত্রিকায় ইঁহার কবিতা ছড়াইয়া আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতই ইনি দেশপ্রেমিক এবং প্রাচীন ভারতাদর্শের অনুরাগী। ঋগ্‌বেদের দুইএকটি সূক্ত ইনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

সুখরঞ্জন রায়ের (জন্ম ১৮৮৯) কবিতা সবই গাথা শ্রেণীর। রচনারীতিতে গদ্যের শুষ্কতা ও দৃঢ়তা আছে। ইনি প্রবন্ধ ও গল্পও লিখিতেন। তাহা ভারতীতে ও মানসীতে বাহির হইত। সুখরঞ্জনের 'শুক্লা' (১৯১০) একটি আখ্যায়িকা কাব্য। কাহিনীকে বলিতে পারি অভিনব স্বপ্নপ্রয়াণ। অতিপরিচয়ে গার্হস্থ্য প্রেম

বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কবি স্বপ্ন-অভিসার করিয়াছেন অতীত কাহিনীতে। সেই কল্পিত কাহিনীই কাব্যের বিষয়। পরস্পর প্রেমমুগ্ধ দুই ভগিনীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি—পুরুষের—আবির্ভাব, এবং কনিষ্ঠ ভগিনী শুক্লার ঈর্ষালু ও অশান্ত প্রকৃতির জন্য দুইজনের জীবননাশ এবং একজনের—নায়িকা শুক্লার—অভিশপ্ত জীবন-যাপন। স্বপ্ন যখন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন কবি বুঝিতে পারিলেন যে তিনিই পূর্বজন্মে ছিলেন নায়ক পূর্ণেন্দু। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি পত্নীর মূর্তিতে শুক্লাকে চিনিতে পারিলেন। অমা, শুক্লা, পূর্ণেন্দু, উদয়ন, যূথী, কুর্চিকা—এই নামগুলি হইতে এবং কাহিনী হইতে বোঝা যায় যে লেখক কাব্যের মধ্যে একটু রূপকের ইঙ্গিত করিয়াছেন। চরিত্রচিত্রণ মোটামুটি ভালোই। ছন্দ একটানা ষোল-অক্ষরের দীর্ঘায়িত পয়ার, অনেকটা গদ্যেরই মত। স্থানে স্থানে রবীন্দ্র-রচনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ভালো লাগে।

কাব্যটি 'সূচনা'য়, দুইখণ্ডে চার ও সাত 'শাখা'য় এবং 'পরিশিষ্ট'এ বিভক্ত। সূচনার প্রথমেই দেখি কবি নিদ্রামগ্ন। গৃহিণী কাজকর্ম সারিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া স্বামীকে জাগাইলে কবি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

নাঃ আর লাগে না ভালো
এই শুষ্ক চুম্বনের মালা রচে' যাওয়া দিন
হতে দিনান্তের পানে, অনন্ত কর্তব্য ভার।
বড়ই পুরানো তুমি, তেলেতে কালীতে ম্লান,
আগুনে শোষিতরস, জীর্ণ গৃহব্যবহারে,
স্বপ্ন-স্বর্গলোকভ্রষ্ট একখণ্ড গতবহ্নি
ধরার প্রস্তর! হায়! সমস্ত পরাণখানা
আর ত যায় না গলি অধর-সঙ্গমে!

জায়া

বটে,
আমি পুরাতন! আর তোমায় বসন্ত আসি
বরণ করিয়া গেছে, শুধু বর্ষ লাগি নয়,
অন্তহীন রূপ-যৌবরাজ্যে, ধরা-ক্ষয় 'পরে
অফুরান শ্যামল যৌবনে! যাও তবে ত্বরা,
নূতনে লওগে খুঁজি।

কবি

ধরণী পরাণহীন;
চিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত জড়; হৃদয়-নির্ঝর তব,
উৎস মোর কবিতার, আজি শুষ্কপ্রায়; আর

ঝরে না ত ঝরঝরি বসন্ত মুঞ্জরি সম
কাব্য-পুষ্প মোর কল্প-কুঞ্জবনে!

জায়া

দোষ এটা
পুরানো প্রেমের, দেখ আবার পাগল করে'
যে দিবে তোমায় খুঁজে পাও কিনা তায়।

কবি

সত্য
যাইব বিদেশে আমি ভাবিয়াছি মনে, দেখি—

জায়া

আকাশে পাতিয়া কান গান কারো যায় কিনা
শোনা!

কবি

ইচ্ছাটা তেমনি তবে দেখা যাক্। মালা
ছিল, ফুলগুলি গেল যবে, ডোরের বাঁধন
আজিকে ছিঁড়িব আমি।

রমণীমোহন ঘোষ (?-১৯২৮) এই সময়ের কবিদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে রবীন্দ্র-অনুগত ছিলেন। তিনখানি কবিতার বই ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন—'মুকুর' (১৮৯৯, দ্বি-স ১৯০৮), 'মঞ্জরী' (১৯০৭) ও 'ঊর্মিকা' (১৯১৩)। রমণীমোহনের রচনায় রবীন্দ্র-অনুগতির ও স্বচ্ছতার কিছু নিদর্শন দিই।

আজি নব বসন্তের বিজন নিশাতে
আসিয়াছি কাছে ল'য়ে আকুল হৃদয়,
আজি চাহি আপনারে দিতে তব হাতে
দেখাতে এ পরাণের নিভৃত নিলয়।
হৃদয়ের অন্তস্থলে আজি দেখ নামি'
সেই দুটি ক্ষুদ্র কথা—'ভালবাসি আমি'।[১]

আবার নব হরষভরে বরষা আসে ভুবনে
ফুল্ল করি তাপিত তরু লতিকা,
গগনপথে নবীন মেঘ বেড়ায় ভাসি পবনে,
কাননে ফুটে কামিনী জাতী যুথিকা।[২]

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর উল্লেখ আগে করিয়াছি। ইনি কিছুদিন 'সুহৃৎ' পত্রিকা চালাইয়াছিলেন। ইঁহার পদ্য ও নাট্যরচনাবলী জলধর সেনের সম্পাদনায়

[১] 'দুটি কথা' (মুকুর)। [২] 'বর্ষা' (ঐ)।

কয়েক খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। প্রমথনাথের রচনার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—'পদ্মা' (১৮৯৮), 'দীপালী' (১৯০১), 'আরতি' (১৯০২), 'যমুনা' (১৯০৫), 'গৈরিক' (১৯১৩) ইত্যাদি কাব্য ; 'ভাগ্যচক্র' (১৯১৩), 'হাম্বির' (১৯১৫), 'দিল্লি অধিকার' (১৯২৪) ইত্যাদি নাটক।

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০) কতকটা রমণীমোহন ঘোষের সমানধর্মা। দুইজনেই 'সাহিত্য'গোষ্ঠীর সভ্য হইলেও বরাবর রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। ভুজঙ্গধরের কবিতার বই—'মঞ্জীর' (১৯০৮, দ্বি-স ১৯১০), 'গোধূলি' (১৯১১), 'শিশির' (১৯১৪), 'ছায়াপথ' (১৯১৪) ও 'রাকা' (১৯১৬)। ইনি বসিরহাট হইতে 'পল্লীবাসী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন দুই বৎসর (১৩২৪-২৬)।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯৩৫) অনেকগুলি কবিতা রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। ইনি এই কাব্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা—'পরিমল' (১৯০০), 'বেলা' (১৯০৩), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৪) এবং 'অর্পণ' (১৯৩০)।

সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪-?) দুইখানি ছোট কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী—'সঙ্গিনী' (১৯০১) ও 'রঙ্গিনী' (১৯০২)। শেষের বইটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করি। বইটির বাহিক সৌষ্ঠবে নূতনত্ব ছিল, গোলাপি কাগজে লাল হরফে কুন্তলীন প্রেসে ছাপা, আকার 'কুন্তলীন পুরস্কার'এর মত।

'অশ্রু'র (১৯০৮) রচয়িতা বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের (জন্ম ১৮৮৭) কবিতার ভাষা সহজ, ছন্দ হালকা। ফিট্‌জেরাল্‌ডের ইংরেজী অবলম্বনে ইনি ওমর খয়্যামের 'রোবাইয়াৎ' অনুবাদ করিয়াছিলেন (দ্বি-স ১৯২৩) এবং ইংরেজী হইতে জেব্-উন্নিসার ফারসী কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯) অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতাপুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। যেমন, 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৯৭), 'ছাইভস্ম' (১৯০০), 'আরাম', 'আমোদ' (১৯৮৩), 'পরিহাস' (১৯২৮) ইত্যাদি। প্রথম বইটি ছাড়া সবই হাস্যকৌতুকের কবিতা ও প্যারডি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্ত জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর (?-১৯২৯) কবিতাসংগ্রহ—'মাধুরী' (১৪০৭), 'অরুণ' ও 'প্রভাতী'। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮) 'শোকগাথা' (১৯০৬) ও 'প্রীতি' ১৯১০)

লিখিয়াছিলেন। অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬) লিখিয়াছিলেন 'প্রীতি ও পূজা' (১৮৯৭) ও 'খোকা' (১৯০২)। ইঁহার 'কৃষ্ণকেলিরসালাপ' (১৯৩৪) বৈষ্ণব-কবিতার মত ভক্তিরসময় রচনা। নগেন্দ্রবালা বসু সরস্বতীর (১৮৭৮-১৯০৬) রচনা পূর্ববর্তী খণ্ডে উল্লিখিত আছে।

এই সময়ে অনেক মহিলা কবির রচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই—আত্মরচনার প্রতি মোহহীনতার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে—কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হন নাই। কেহ কেহ হয়ত একটি-দুইটি বই বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু আত্মীয়বন্ধু সমাজের বাহিরে প্রচার না হওয়ায় সেগুলি এখন নিতান্ত দুর্লভদর্শন। রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ কন্যা লজ্জাবতী বসুর (১৮৭৩-১৯৪২) বহু কবিতা বামাবোধিনী-পত্রিকায় এবং অন্যত্র বাহির হইয়াছিল। বিনয়কুমারী বসুর কবিতা বেশীর ভাগ সাহিত্যে প্রকাশিত হইত। জীবনানন্দ দাশের মাতা কুসুমকুমারী দাসীর কবিতা একাধিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

আলোচ্য সময়ে কবিতা রচনায় মুসলমান লেখকেরা আগেকার তুলনায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'জীবনমঙ্গল' ও 'মুকুর' (১৯২১) রচয়িতা দৌলত আহাম্মদ, 'নবনূর'এর (১৯০৩ হইতে) সম্পাদক ও 'ডালি'র (১৯১২) রচয়িতা সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-?) এবং কাজী ইমদাদুল হক। হকের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

হাসি

ভাল নাহি লাগে তত চন্দ্রিকার খেলা
চঞ্চলবাহিনী বুকে—লহরে লহরে
জ্যোছনার ছুটাছুটি। স্থির সরোবরে
ফুল্ল-কুমুদিনী-হাসি কৌমুদীর মালা
হৃদে ধরি,—তাও নহে তত প্রাণময়।
নিরজন রসময় কুসুমের হাসি
মলয়-চুম্বনে মৃদু, বড় ভাল বাসি,—
সে হাসিরাশিতে তবু হয়না হৃদয়
কখনো আপনাহারা। নিকুঞ্জকাননে
উষাদেবী হাসে যবে, কত মনোহর
হয় সে যে, ছোটে তাহে সুধার লহর—
সে হাসি মলিন আজি আমার নয়নে।

আমি যে হেরেছি হাসি সে চাঁদ-মুখের
উচ্ছ্বাসের প্রতিমূর্তি আমার বুকের ॥[১]

ইমদাদুল হকের অন্য রচনাও আছে। ইঁহার উপন্যাস 'আব্‌দুল্লাহ্' (১৯৩২) পাঠকদের সমাদর লাভ করিয়াছিল ॥

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ ৪৬৩।
[১] সমালোচনী, প্রথম বর্ষ (১৩০৮)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুগান্তরাল

১

'অচলায়তন' রচনা (আষাঢ় ১৩১৮), পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পুনর্মিলন (পৌষ ১৩১৮), রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা (১৪ মাঘ ১৩১৮), তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভ (কার্তিক ১৩১৯), সবুজপত্র প্রকাশ (বৈশাখ ১৩২১) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)—এই ঘটনাগুলি বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগান্তরাল বর্ষ দশকের (১৯১১-২০) ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা কোন বড় রকমের গঠনাত্মক কর্মক্ষেত্র না পাইয়া বাহিরের দিক হইতে ধীরে ধীরে থামিয়া আসে এবং ভিতরের দিকে খানিকটা কেন্দ্রীভূত হইয়া হিংসাত্মক বিপ্লব-পন্থার সুড়ঙ্গপথ খুঁজিতে থাকে। একদিকে তীব্র আবেগ-উত্তেজনার পর নিষ্ফলতার নিরুদ্যম, অপরদিকে শাসনকর্তাদের ক্রমবর্ধমান পরুষ ও ক্রুদ্ধ আচরণ—এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া দেশের কর্ম- ও চিন্তা-নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালা দেশ একত্রিত হইলে খানিকটা আত্মতৃপ্তি আসিলেও গোল মিটিল না। নূতনতর বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দিল,—স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম সমাজ ও অশিক্ষার জালজঞ্জালগুলিকে মহীয়ান্ এবং আত্মত্রাণের শেষ উপায় ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার পুনশ্চেষ্টা, অর্থাৎ বিগত শতাধিক কালের অগ্রগতি হইতে পশ্চাদপসরণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই জালজঞ্জালগুলি জড়াইয়া আছে বলিয়াই আমাদের অগ্রগতি সব দিকেই ব্যাহত হইতেছে। জীবনমরণের এই সমস্যাকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমাধান দেখাইলেন। যেমন কড়া রোগ তেমনি ঝাঁঝালো ঔষধ। উচ্চতম শিল্পের মিষ্টতম মধুর অনুপান সত্ত্বেও ঔষধে কতটা উপকার দিল তাহা ক্রমশ বিবেচ্য। তবে ঝাঁঝটা লাগিল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক অন্তঃপুরে লাঠি চালাইছেন বলিয়া প্রতিবাদ উঠিল। এ প্রতিবাদ অনেকটা ক্ষীণকণ্ঠ, কেননা অচলায়তনের মর্মানুধাবন ও রসগ্রহণ তখনও প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এই প্রতিবাদের সূত্রেই জানিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ কোন্ অচলায়তনের উপর আঘাত হানিয়াছেন এবং কেন, আর আসল রোগটিই বা কি।

আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। ...দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে—সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু-বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে? আর, যত মমতা ওই পাপের প্রতি? ...আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সে দিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই—এই পাষাণ-প্রাচীরের চারিদিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। ...অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।[১]

২

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিশাল বিচিত্রতা ও প্রাচুর্য সাহিত্যে পুরাতনপন্থীদের মুখ বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্র-বিদ্বেষ তবুও শান্ত হয় নাই। তাঁহার যশ-অসহিষ্ণু কোন কোন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ও গোষ্ঠীপতি পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্র-রচনার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেছিলেন। তবে ইঁহাদের দল দিন দিন হতবল হইয়া আসিতেছিল। ইঁহাদের চূড়ান্ত পরাজয় হইল বলিতে গেলে ১৪ মাঘ ১৩১৮ (২৮ জানুয়ারি ১৯১২) তারিখে, যেদিন বাঙ্গালা দেশের নবীন-প্রবীণ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ-বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে টাউন হলে প্রকাশ্যভাবে বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে সংবর্ধিত করিলেন। এই অনুষ্ঠান যেন বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার রাজ্যাভিষেক।[২] রবীন্দ্রনাথের

[১] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮)। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড, পৃ ৫০৮-১০ দ্রষ্টব্য। [২] ইহার পরেও বিরুদ্ধবাদীরা একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হন ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে ষ্টার থিয়েটারে আনন্দবিদায়ের অভিনয়-বিড়ম্বনায়।

একপঞ্চাশ জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কবির অচিরাগামী অভূতপূর্ব সম্মানের ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে।

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।

১৯১৩ নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্তির খবর বাহির হইল। এই ঘটনার প্রধান তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য মনীষা আপনার সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় মনীষার সমকক্ষতা স্বীকার করিয়া লইল। ভারতবর্ষ জাতে উঠিল বলিতে পারি। দেশের মধ্যে ইহার ফল কম গুরুতর হইল না। বুঝুক বা নাই বুঝুক রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বাতিশায়িত্ব সর্বসাধারণে মানিয়া লইল। বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালা সাহিত্যের দরও বাড়িল। দুই চারি মাস আগেও যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করিতেছিলেন তাঁহারাও স্পেশাল ট্রেনে ছুটিলেন (২৩ নভেম্বর ১৯১৩) বোলপুরে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে। এই হৈচৈ রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগিল না। তিনি সংবর্ধনার প্রতিভাষণে যাহা বলিলেন তাহা সত্য ও হিতকর কিন্তু কিছুতেই বিরুদ্ধবাদীদের মনোহর হয় নাই।

সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনেকেরই ভালো লাগে নাই। কিন্তু তাঁহারা জানেন নাই যে তাঁহাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে গাত্রদাহের জ্বালায় বিলাতে পর্যন্ত বিষ ছড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সমসাময়িকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করি।[১]

> লণ্ডন মহানগরীতে কবির অভ্যুদয় লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকাগুলি মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কবির প্রশংসায় লণ্ডন সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। এ সময়ে দেশ হইতে সংবাদ আসিল—"কবির এ সব তর্জমা স্বকীয় নহে—কারণ কবির ইংরাজী জ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ।" এরূপ উক্তির পিছনে কতিপয় স্বদেশবাসীর নীচ মনের পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল ইহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আচরণ ও উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছিল॥

[১] 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ-প্রবাসের স্মৃতিকথা', শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন (বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৮)।

৩

প্রমথনাথ চৌধুরীর গাঢ়বন্ধ ও অ-গতানুগতিক পদ্য ও গদ্যরচনা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, ইঁহাকে নায়ক করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে আধুনিকতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এবং বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গদর্শনের আসর জাঁকিয়া বসিয়া উল্‌টা স্থরের তান ভাঁজিতেছিলেন। বিপ্লবপন্থার দিকে উস্‌কানি এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার ও চিন্তার বিরূপ সমালোচনা তাঁহার এক লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তায় আর তেমন ফাঁক নাই, তাঁহার রচনা-শিল্পের উপর ঠোকর মারাও অসম্ভব। তাই বিপিনচন্দ্র আক্রমণ করিলেন রবীন্দ্র-রচনার ভাব ও বস্তু। রবীন্দ্রনাথের রচনা যে "বস্তুতন্ত্রতাহীন" তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। প্রতিবাদও উঠিল। প্রবাসীতে অজিতকুমার চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে রীতিমত রবীন্দ্র-কাব্যালোচনা শুরু করিলেন। কিন্তু যেভাবে আক্রমণ সেভাবে তো আত্মসমর্থন অসম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করিলেন আধুনিকতম অস্ত্র—নির্মল বুদ্ধির, অনাবিল চিন্তার ও শাণিত বচনের—যাহা প্রতিপক্ষের বর্ম ও মর্ম ভেদ করিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে পাঠক ও লেখক মনের জড়তা হইতে, সাহিত্যসৃষ্টির তুচ্ছতা ও পুনরাবৃত্তির গোলকধাঁধা হইতে মুক্ত হইবার দিশা পাইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রমথনাথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' বাহির করিলেন (১৫ বৈশাখ ১৩২১)। কোন রকম লাভের উদ্দেশ্য ছিল না, তাই বিজ্ঞাপনবিরহিত। এই দিক দিয়া সবুজপত্র সাধনার একধাপ উপরে উঠিল। পত্রিকাটি বাহির করিবার সঙ্কল্প শুধু প্রমথনাথের একার নয়, রবীন্দ্রনাথেরও।[১] এবং সবুজপত্র নাম বোধকরি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া।

> সবুজপত্র উদ্‌গমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই।[২]

১ "সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে শুধু চিন্তা করলে হবে না—কিছু লিখতে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কিরকম হয়। আকারে ছোট—বয়সেও।" চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭১।

'কনিষ্ঠ' নামটি রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন বোধহয় বিরুদ্ধবাদী 'জ্যেষ্ঠ' অর্থাৎ জ্যাঠাদের লক্ষ্য করিয়া।

২ ৫ মার্চ ১৯১৪ তারিখে প্রমথবাবুকে লেখা চিঠি। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭১।

আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুএকটা লেখা দিতে পারব।[১]

সতেজ প্রাণের ও সজীব চিন্তার লাঞ্ছন রূপে তালপাতার ছবি সবুজপত্রের সবুজ মলাটে কালো রঙে ছাপা হইত। যুগান্তরালের সাহিত্যচিন্তায় সবুজপত্র এই ইঙ্গিতগুলি বহন করিয়া আনিল—(১) জীবনের সঙ্গে মননের সোজাসুজি ও জাগ্রত সংযোগ না থাকিলে সাহিত্যরচনা বহুলাংশে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই অতীত ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া বর্তমান জগতের রিয়ালিটিকে মানিয়া লইয়া নিজের শক্তির ও সাধনার সীমায় সচেতন থাকিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হইবে। (২) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য আমাদের মানসমুক্তি দিয়াছে। সেই প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া এবং বাঙ্গালীর জীবনে ও চিন্তায় যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া আমাদের নিজস্ব অথচ স্বাধীন ভাবে মনন ও বাচন না করিলে চলিবে না। (৩) অন্যমনস্ক ও পুঁথিগত চিন্তারীতিকে সংযত ও জীবসঞ্চারিত, এবং গতানুগতিক রচনারীতিকে সংহৃত করিতে হইবে। ভাষার শৈথিল্য ও নিরর্থ আড়ম্বরের জন্য সাহিত্যচিন্তার যে দুরবস্থা তাহা দূর না করিতে পারিলে সাহিত্যের মান উন্নত হওয়া অসম্ভব। (৪) এইজন্য সংস্কৃত-অনুগত ও শিক্ষার্থী-অনুশীলিত বক্তৃতা-উপদেশেরই উপযুক্ত সাধুভাষার পরিবর্তে সহজ চিন্তার বাহন মুখের কথার কাছাকাছি চলিত-ভাষাকে লিখিবার ভাষা করা নিতান্ত আবশ্যক।[২]

সবুজপত্রের তথা রবীন্দ্রনাথের বিরোধীরা সাত মাস পরেই তাঁহাদের মুখপত্র বাহির করিলেন 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ ১৩২১)। পত্রিকাটির পোষক ও সম্পাদক হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। মুখ্য লেখক বিপিনচন্দ্র পাল আগে থেকেই রণংদেহি জুড়িয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের বাগ্মিতাশক্তি ছিল, বাঙ্গালা রচনাতেও দক্ষতা ছিল। তিনি সবুজপত্রের মাথা মুড়াইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু গাণ্ডীবী প্রমথনাথের সম্মুখে কতক্ষণ তিষ্ঠিবেন। অন্তরালে সারথী রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণী,

বি— এবং বি—র পালকবর্গ যে তোমার সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম।...

• যাই হোক আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে

[১] ২৩ মার্চ ১৯১৪ তারিখে প্রমথবাবুকে লেখা চিঠি। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭৩।

[২] 'সবুজপত্রের মুখবন্ধ' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২১)। প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

তুলছিল—বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন ? দেশের কোন জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবেনা ? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়।[১]

প্রমথনাথের "অ-সাধু" ভাষার খুঁত বাহির করিতে গিয়া বিপিনচন্দ্র হাতে-নাতে ধরা পড়িলেন।[২]

সবুজপত্রের নৌকায় সম্পাদক চলিত-ভাষার পাল তুলিয়া দিলেন। কাণ্ডারী হাল ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার গল্প (যেমন, 'স্ত্রীর পত্র') ও উপন্যাস ('ঘরে বাইরে') বাঙ্গালা সাহিত্যের অভিনব পণ্যের বোঝাই লইয়া যাত্রা করিল নূতন বন্দরের দিকে। বাঙ্গালা সাহিত্যে "আধুনিকতা"র এই শুভ যাত্রারম্ভ ॥

৪

দিল্লী-দরবারে (ডিসেম্বর ১৯১১) পঞ্চম জর্জ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পুনর্মিলন এবং বিহার ও উড়িষ্যার ছেদ ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীর বিক্ষত আত্মসম্মানে খানিকটা মলম পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তায় অন্যমনস্কতা দেখা দিয়াছে। স্বদেশী শিল্পপ্রচেষ্টার প্রথম উদ্যমগুলির ব্যর্থতা আশাভঙ্গের সূচনা করিয়াছে। উৎসাহী দৃঢ়সঙ্কল্প তরুণসমাজে বিপ্লবপন্থার মোহঘোর ঘনাইয়াছে। চিন্তাশীল নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য ঘটিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্তেরা জাতীয় আন্দোলন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিয়াছে। ভালোর মধ্যে দেখা দিয়াছে কর্জনের ইউনিভার্সিটি আইনের দরুন (১৯০৯ হইতে) উচ্চশিক্ষার প্রসার। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের প্রবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার গভীরতার ও বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে উচ্চশিক্ষিতের অর্থোপার্জনের পথ সঙ্কীর্ণতর হইতে চলিয়াছে।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পড়িল (আগষ্ট ১৯১৪)। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আঁচ আমাদের দেশে লাগে নাই। তবে সাধারণ জীবনযাত্রায় খানিকটা অসুবিধা হইল বিদেশী মালের অভাবে। লাভের মধ্যে হইল কোন কোন দেশীয় শিল্পের উন্নতির সুবিধা এবং চাকুরিয়া নয় এমন শহরবাসী মধ্যবিত্তের কতকটা আর্থিক উন্নতি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের সুযোগে শিক্ষিত ছাত্রেরা বিদ্যাবলে উচ্চতর রাজকর্মে নিযুক্ত হইবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইল ॥

১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি (২ আগষ্ট ১৯১৪)। চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

২ 'কৈফিয়ৎ' (প্রথম প্রকাশ সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩২১)। 'বীরবলের-হালখাতা' দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সমসাময়িক কবিতা

১

যুগান্তরালের মুখ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। এই সময়ের কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার ইঙ্গিতই তাঁহার রচনায় উপেক্ষিত হয় নাই, এবং অধিকাংশ সমবয়সী ও কনিষ্ঠ কবিতালেখকদের উপর তাঁহার রচনার প্রভাব স্পষ্ট প্রতিভাত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সম্বন্ধে এখনকার সাহিত্যসমালোচকের অভিমত খুব স্পষ্ট নয়। সেইজন্য ইঁহার রচনার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি।[১]

সত্যেন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতির গঠন তাঁহার পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের সূত্রে পাওয়া। অক্ষয়কুমারের তথ্যদৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রিয়তা সত্যেন্দ্রনাথে বর্তাইয়াছিল। অনুবাদদক্ষতায় পৌত্র-পিতামহ দুইজনেই সমান ক্ষমতাবান্ ছিলেন। ধর্মবিষয়ে নিরুৎসুকতায়ও দুইজনের মধ্যে মিল পাই। অক্ষয়কুমারের প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে স্পষ্ট। শেষের দিকে তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কখনও লুপ্ত হয় নাই। ১৩০৮ সালের দিকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার (সহপাঠী?) সুহৃদ্দ্বয় অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গসৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৩১০ সালে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইঁহার কাব্যশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকেন। সতীশচন্দ্রের রোমান্টিক নিসর্গদৃষ্টি এবং সমাজসচেতনতা সঞ্চারিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পকে নিজস্ব পরিণতির নির্দেশ দিয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থা হইতে কবিতা লেখা শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার যেকয়টি বাল্যরচনা তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দুইটিতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে বিশেষ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল এই চারি কবির রচনার অনুসরণ চোখে পড়ে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের রীতি অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় রঙ ধরিতে থাকে। সহজ ভাষা ও প্রসন্ন-চপল ছন্দ—এই দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের ঋণ গুরুতর। ভাবের ঋণও কোন কোন কবিতায় দেখা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি নিজের পথ চিনিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঋণ চুকিয়া যায়।

[১] এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' দ্রষ্টব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ চারি বৎসর কলেজে পড়িয়াছিলেন (১৮৯৯-১৯০৩)। কলেজি বিদ্যায় তাঁহার মন ছিল না। কিন্তু শেষ অবধি জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়ে তাঁহার অটুট আদর ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ প্রবল ছিল। তাই তাঁহার কবিতা যত তথ্যবহুল, তত ভাবগভীর নয়। মানব-সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সকল সামগ্রীর প্রতিই কবির যে সজাগ কৌতূহল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে সর্বদা লভ্য, তা সে প্রাচীন ইতিহাস হউক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হউক। কবিতারচনার জন্য জ্ঞানের সঞ্চয় আধুনিক কালে আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথের রচনায়ই প্রথম প্রতিফলিত।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ স্বদেশপ্রীতিতে ও জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রিয়তায়। সদাজাগ্রত দেশচেতনায় ও সমাজচেতনায় তাঁহার কাব্যসম্পদ্ প্রায় সর্বত্র অনুস্যূত। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তিকা 'সবিতা'র (১৯০০) "সূচনা"য় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

> প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার। এত উৎসাহ—এত তেজ আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবের এমন গুরু আর নাই। তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে। ...পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় শত শত লোক বর্ষে বর্ষে অনশনে প্রাণ হারাইতেছে, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? ...তাই যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখন ও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য। সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।...এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন।

২

সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে এই পুস্তিকপুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল,—'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬, দ্বি-স ১৯২২), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'জন্মদুঃখী' (১৯১২)[১], 'চীনের ধূপ' (১৯১২)[২], 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩)[৩], 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫),

[১] অনুবাদ, উপন্যাস। [২] অনুবাদ, প্রবন্ধ। [৩] অনুবাদ, ছোট ছোট নাট্য।

'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), ও 'হসন্তিকা' (১৯১৭)। **কবির মৃত্যুর পর তিনখানি বই বাহির হয়,**—'বেলা শেষের গান' (১৯২৩), 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৯২৯)[১]। বেলা-শেষের-গানের "উৎসর্গ"[২] হইতে অনুমান করি, কাব্যটির গ্রথন ও প্রকাশসঙ্কল্প কবির জীবৎকালেই হইয়াছিল।

কবিমানসের ধারা ও কাব্যশিল্পের ইতিহাস অনুসরণ করিলে কাব্যগ্রন্থগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়,—(১) বেণু-ও-বীণার অধিকাংশ কবিতা; (২) সবিতা,[৩] হোমশিখার দ্বিতীয় হইতে সপ্তম কবিতা, এবং সন্ধিক্ষণ[৪]; (৩) বেণু-ও-বীণার অবশিষ্ট কবিতা[৫] এবং হোমশিখার শেষ কবিতা ('সাম্যসাম'); (৪) তীর্থসলিলে ও তীর্থরেণুতে সঙ্কলিত অনুবাদ কবিতা এবং ফুলের-ফসল; (৫) কুহু-ও-কেকা; (৬) হসন্তিকা, এবং অভ্র-আবীর হইতে শেষ পর্যন্ত ॥

৩

বেণু-ও-বীণার অধিকাংশ কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের "কৈশোরক" কালের (১৩০০-১৩০৬) রচনা বলিতে পারি। তাহার মধ্যে আদিমতম বলিয়া বোধ হইতেছে চতুর্দশপদী পয়ার কবিতাগুলি। ষোড়শপদীগুলি কিছু পরবর্তী কালের রচনা। 'উল্কা', 'প্রবালদ্বীপ', 'আগ্নেয়দ্বীপ',—এগুলির বিষয় যোগাইয়াছে পিতামহের 'চারুপাঠ'। 'ঝড় ও চারাগাছ,' 'অপূর্ব সৃষ্টি', 'অক্ষয় বট' ও 'শাহারজাদী'—এই চারিটি কবিতায় মাইকেলের ভাবভঙ্গির অনুসরণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের চৈতালীর চতুর্দশপদীর অনুকৃতি দেখা যায় 'শিশুর আশ্রয়', 'অরণ্যে রোদন' ও 'দেবতার স্থান'—এই তিনটিতে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব অনুভূত হয় কয়েকটি কবিতায়,—'অনিন্দিতা', 'মূল ও ফল', 'হাসি-খেলা', 'জীর্ণ-পর্ণ' ইত্যাদিতে। অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনার ইঙ্গিত বোঝা যায় এই কবিতাগুলিতে—'ফাগুনে', 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা', 'স্খলিত পল্লব', 'ভ্রষ্ট' ইত্যাদি। কাহিনীগর্ভ কবিতাগুলিতে এবং বিশেষ করিয়া 'আলেয়া' ও 'মমতাজ' কবিতা দুইটিতে সতীশচন্দ্র রায়ের অনুসরণ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপকতম। প্রথম দিকে পাই মানসীর ছায়া, মাঝের

[১] নাটিকা। [২] "পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীমতী মহামায়া দত্ত পূজনীয়াসু"।

[৩] 'সবিতা' হোমশিখার প্রথম কবিতারূপে অন্তর্ভুক্ত। [৪] 'সন্ধিক্ষণ' বেণু-ও-বীণার দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত। [৫] 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' (রচনাকাল আষাঢ় ১৩০০), 'অক্ষয় বট', 'আলোকলতা', 'চিত্রার্পিতা,' 'উল্কা', 'স্বর্ণগোধা', 'প্রবালদ্বীপ', 'আগ্নেয়দ্বীপ', 'ঝড় ও চারাগাছ' ইত্যাদি।

দিকে দেখি চৈতালী, কথা-ও-কাহিনী, কণিকা, কল্পনা, ক্ষণিকা ও শিশুর ছায়া, শেষের দিকে পাই বাউল গানের ছায়া। শেষ পর্যন্ত এই প্রভাব ছন্দে ও ভাষাতেই পর্যবসিত।

বেণু-ও-বীণায় বিবিধ কবির ও কাব্যশিল্পের প্রভাবের কিছু কিছু নিদর্শন দিতেছি।

মাইকেলের অনুসরণ,

জন্ম তব সত্যযুগে, হে অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি ? কহ তা' মোরে তুমি
বড় সাধ মনে, যেতে তোমার নিকট,
ধন্য সে, বক্ষে যে হেরে তব পীঠ-ভূমি।[১]

দেবেন্দ্রনাথের অনুসরণ,

ওরে দিদি, দেখি, দেখি—একবার আয়,
ওই দুষ্ট হাসি যেন দেখেছি কোথায়!
যে বুড়া হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই।
ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের
ও যেন রে কর্তব মধুর গানের,
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে-ও আর নাই।[২]

অক্ষয়কুমারের অনুসরণ,

স্বপনে দেখিনু রাতে, হে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্যের চন্দ্রমা,
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীনা আমি,—
শুনিনু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা।[৩]

সতীশচন্দ্রের অনুসরণ,

পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পাব জুড়াবার ঠাঁই ?
জ্বালার অবধি মোর নাই।[৪]

[১] অক্ষয়-বট। [২] হাসি-চেনা। [৩] দ্বিতীয় চন্দ্রমা। [৪] আলেয়া।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ,

(ক)

বরষার নিবিড়তা দিক্ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য নিবিয়া যাক্, ধরণী ডুবিয়া থাক্,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক ফুটিয়া।[১]

(খ)

বহুদিন পরে চলিয়াছি গ্রামে,
নূতন হয়েছে পুরাণো
চোখের উপরে বেড়ে ওঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফেরানো।
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে,
জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা
বেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে।[২]

(গ)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলা রে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের হাল্‌কা ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করিয়াই বেণু-ও-বীণার নিজস্ব সুরটুকু বাজিয়াছে। দুইটি উদাহরণ দিতেছি। একটিতে শিশুর "তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া" কবিতার ছাপ, অপরটিতে কথা-ও-কাহিনীর 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' এবং কল্পনার 'প্রকাশ' ইত্যাদির অনুবৃত্তি। এই ছন্দচটুলতার পথই সত্যেন্দ্রনাথ নিজের বলিয়া অচিরে চিনিয়া লইয়াছিলেন।

তুমি গো আছ মগন ঘুমে
ফুলের বিছানা ;
জানালা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা।[৪]

[১] দুর্যোগ। [২] বর্ষায়। [৩] কোন্ দেশে ("বাউলের সুর")। [৪] জ্যোৎস্নালোকে।

ঝর্ঝর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ ;
গর্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্বদেশ।
এ পারে বজ্র অট্ট হাসিল, ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।[১]

রচনাকালের হিসাবে প্রথম কবিতা 'আরম্ভে' বেণু-ও-বীণার শেষ কবিতা। কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যনামের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জীবনে দুঃখ-দুর্দশা-অসফলতার বেদনার দ্যোতক "বেণু", আর কামনা-বাসনা-ভালোবাসার ব্যাকুলতার প্রতীক "বীণা"। 'বেণু ও বীণা' নাম দিয়া কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাঁহার কবিতার বস্তুগত ও ভাবগত তত্ত্ব।

বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা' ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি' বাজে।…

হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে-গানে,
শিহরি, মূরছি—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, দুলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে ?

বেণুর তান জোরে বাজিয়াছে সেই পাঁচটি কবিতায়[২] যেখানে কবি শহরের হৃদয়হীন ঐশ্বর্যের মাঝখানে অনাথ নিপীড়িত দুর্বল লাঞ্ছিত মানবের ছবি আঁকিয়াছেন। বীণার তারে ঝঙ্কার উঠিয়াছে সেখানে যেখানে মাঠের ঘাটের চিত্ররসে কবির নয়ন মগ্ন।

কলায়ের সুঁটে প্রজাপতি ফুটে,—
প্রজাপতি লুটে বেড়ায় খালি,
নারিকেল-শিরে বেজে ওঠে ধীরে
শত জোড়া ছোট হাতের তালি !
কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুরণি-ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান্,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুমি।[৩]

[১] মেঘের কাহিনী।

[২] পথে, অন্ধশিশু, অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী, বিকলাঙ্গী, "কুস্থানাদপি"। [৩] শিশুহীন পুরী।

আর একটি ভালো কবিতা, "রম্যাণি বীক্ষ্য"।

আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ;
আর নিশীথের আলো
আজ হেথায় কিসে এল?
আরেক সাঁজের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান;
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা।

৪

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তিকা দুইটি, 'সবিতা' (১৯০০) ও 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হোমশিখা' (১৯০৭) এক স্তরের রচনা। নামগুলিও সব দেবতা- এবং আরাধনা-ঘটিত। সবিতা হোমশিখার প্রথম কবিতারূপে অন্তর্ভুক্ত, এবং সন্ধিক্ষণ দ্বিতীয় সংস্করণ বেণু-ও-বীণার অন্তর্গত। কেবল হোমশিখার শেষ কবিতা 'সাম্য-সাম' এই স্তরের বাহিরে। এইটিকে বাদ দিলে হোমশিখা স্তরের কবিতা-রচনার কাল ১৩০৫ হইতে ১৩১২ সাল ধরিতে হয়।[১] সবিতা, সন্ধিক্ষণ এবং হোমশিখার সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যে তুচ্ছ হইলেও উল্লেখযোগ্য একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কবিতাগুলির নাম সবই স-কারাদি: সবিতা, সোম, সর্বংসহা, সমীর, সিন্ধু, স্বর্ণগর্ভ, সাগ্নিকের গান, সাম্য-সাম, সন্ধিক্ষণ। কবিতানামের এই আদ্যানুপ্রাস যে কবির ইচ্ছাকৃত তাহা বোঝা যায় 'স্বর্ণগর্ভ' হইতে। এই দেবতা বেদে হিরণ্যগর্ভ নামেই প্রসিদ্ধ। অনুপ্রাসের খাতিরে সত্যেন্দ্রনাথ হিরণ্যের প্রতিশব্দ স্বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন।

হোমশিখায় সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্যাপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় বেদ এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য হইতে গৃহীত কপালটুকি উদ্ধৃতিগুলিতে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানযজ্ঞোপাসনার প্রতি ঝোঁকও লক্ষণীয়। বইখানি পিতামহের

[১] হোমশিখার ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "এই কবিতাগুলি ১৩০৫ হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত।" সাম্য-সাম সর্বশেষে লেখা বলিয়া মনে করি। সবিতার রচনাকাল ১৩০৫, সন্ধিক্ষণের ১৩১২। সন্ধিক্ষণ বিক্রয়ার্থ ছাপা হইয়াছিল। সবিতা আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে বিতরণের জন্য ছাপা হইয়াছিল। সেই কারণেই বোধহয় সন্ধিক্ষণ হোমশিখায় সঙ্কলিত হয় নাই।

নামে উৎসর্গিত, তাহাও তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্যগ্রন্থের নামকরণের হেতু সূচিত হইয়াছে এই কয় ছত্রে,

প্রাচীন বেদীর 'পরে, নূতন সমিধ, সাজাইয়া,—
তীর্থ-জলে রচিয়া পরিখা,—
ব'সে আছি প্রতীক্ষায়, আকাশের পানে তাকাইয়া,
কেমনে জ্বালিব হোমশিখা ?
গগনে বাড়িল বেলা,— মানবের মেলা পথে ঘাটে,
আচম্বিতে আমারি সকাশে—
বিদ্যুৎ পড়িল খসি' ! সোনায় মুড়িয়া শুষ্ক কাঠে,
হোমশিখা উঠিল আকাশে ।

সাম্য-সাম ছাড়া, সবিতা হইতে সন্ধিক্ষণ অবধি সব কবিতাই সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক 'মহিলা' কাব্যে ব্যবহৃত ছোটবড় আট ও দশ ছত্রের স্তবক-বদ্ধ ছন্দে লেখা।[১] সবিতায় জ্ঞানের ধ্যান। তাই কবিতাটির কপালটুকি উদ্ধৃতি হইতেছে গায়ত্রী ঋক্। কবি তাহার অনুবাদও দিয়াছেন গায়ত্রী ছন্দে,

ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়।
রমণীয় দীপ্তিদেবতায়।
আমাদের বুদ্ধি-বিধাতায়॥

সবিতার প্রথম স্তবক,

তিমির-রূপিণী নিশা—সবিতা-সুন্দর !
সে তিমিরে তোমার সৃজন,
বিমল উজ্জ্বল আলো' সৌন্দর্য্য-আধার !
ফুল্ল-উষা—অপূর্ব-মিলন।
কুসুমিতা বসুন্ধরা—
দ্যু-লোক আলোক-ভরা—
জনয়িতা সবিতা সবার !
বরণীয়—রমণীয় নিত্য-জ্ঞানাধার !

সোম প্রেমের দেবতা।

সারা দিনমান করি ক্ষয়
নিশি আনে মহেন্দ্র সুযোগ,
সোম, সোম, কি আনন্দময়,
নয়নের মনের সম্ভোগ ;

১ আটের কমছত্রের স্তবকও আছে।

রূপ মাঝে মোহ বীজ,—
স্বর্ণকোষে প্রেমাঙ্কুর,
মধু! সোম! মনসিজ!
দেহ লবে আনন্দ প্রচুর,
গণ্ডূষে শুষিব সুধা সব,
সোম, সোম—আজি মধুৎসব।[১]

সর্বংসহা শৌর্যের দেবতা, পৃথিবী।

শক্তি দাও ছিঁড়িব শৃঙ্খল,
সর্বংসহা!—সহেছি অনেক!
দূর কর সর্ব অমঙ্গল,—
দূর কর প্রভেদের ভেক;
মুক্তিজলে সর্বজনে কর অভিষেক!
মুক্ত হ'ব শক্তি কর দান,
দুঃখ হতে কর পরিত্রাণ।[২]

সমীর প্রাণের দেবতা, সিন্ধু দুঃখের। স্বর্ণগর্ভ আকাশের—আনন্দের—অধিদেবতা, ব্রহ্ম। সাগ্নিকের গানে অগ্নির অর্থাৎ কর্মতপস্যার জয়কার। এই ছয়টি বিশ্বপ্রকৃতিক (elemental) দেবতা ও অধিদেবতার স্তুতির পরে হোমশিখার শেষ কবিতা সাম্য-সামে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বপ্রাণিক জন্মসত্ব হইতে বঞ্চিত দরিদ্র ঘৃণিত নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা অভিব্যক্ত। ছন্দে ভাষায় ও ভাবে এই কবিতায় কবির মৌলিকতার ও "আধুনিকতা"র প্রকাশ আছে।

খনির তিমিরে, কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যারা শোনো তাহাদের গান।
দূর সাগরের হলহলা সম উঠিছে তাদের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি';
অশ্রু হারায়ে রক্ত নয়ন জ্বলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্খলিত বচন,—নাহি সে মানুষ যেন!
শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে;
জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।
হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি,
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী!

[১] পৃ ৪০-৪১। [২] পৃ ৬১।

নরবাহনের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল ধরম, মরিল সরম, ধরণী গুমরি' ধায়।
তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ![১]

সন্ধিক্ষণে স্বদেশী আন্দোলনের যুগোদ্‌বোধন ও কর্মপ্রশস্তি। শেষ স্তবক,

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুক';
বঙ্গ-ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণ-যুগ!

পিতামহের মত পৌত্রেরও অনুবাদ-কাজে সহজ প্রবণতা এবং দীপ্ত উৎসাহ ছিল। ভাষান্তর হইতে বাঙ্গালায় কবিতার অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম হইতেই শুরু করিয়াছিলেন এবং অনুবাদের কাজেই তাঁহার কবিতারচনায় হাত পাকে। হোমশিখার পরে তাঁহার দুইখানি অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থ পর পর বাহির হইয়াছিল,—'তীর্থসলিল' (১৯০৮, দ্বি-স ১৯১২) ও 'তীর্থরেণু' (১৯১০)। পাঁচ বছর পরে আরো একখানি প্রকাশিত হইল,—'মণি-মঞ্জুষা' (১৯১৫)। এই কাব্যত্রয়ীকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিশ্বসাহিত্য-কবিতাসমুচ্চয় বলা যাইতে পারে। সব দেশের সব ভাষার (—অবশ্য অধিকাংশই ইংরেজি অনুবাদ হইতে—) প্রাচীন ও নবীন গান ছড়া ও গীতিকবিতার সহিত বাঙ্গালী পাঠক এখন পরিচয়ের পথ পাইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। বই তিনখানিতে সর্বসমেত প্রায় সাড়ে পাঁচ শ[২] অনুবাদ কবিতা আছে। ভারতীয় ভাষার অধিকাংশ এবং ফরাসী কবিতা সবই মূল হইতে অনূদিত। তবে তামিল তেলুগু মুণ্ডারি প্রভৃতি ভিন্নগোত্রীয় ভারতীয় ভাষার এবং ফরাসী ও ইংরেজি ছাড়া অন্য অভারতীয় ভাষার কবিতা ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ। অনুবাদে দক্ষতা প্রথম হইতেই পরিস্ফুট। তবে ভাষায় ও ছন্দে দখল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের মসৃণতা বাড়িতে থাকে।

[১] পৃ ১৪১-৪২। [২] তীর্থসলিলে ১৮০, তীর্থরেণুতে ২০৪, মণিমঞ্জুষায় ১৫৭।

'তীর্থসলিল' নামটির ইঙ্গিত হোমশিখার ভূমিকা-কবিতাটিতে আছে।[১] তীর্থ-সলিলে সত্যেন্দ্রনাথ এই কৈফিয়ৎ দিতেছেন,

আনন্দের আত্মীয়তা করিতে স্থাপন,—
লঙ্ঘিয়া সকল বাধা,—ভাষা, কাল, দেশ,
বর্ণ, জাতি, পাঁতি, কুল,—ছিল এ মনন,
নাহি জানি কি করিতে কি করিনু শেষ।[২]

তীর্থরেণুর কৈফিয়ৎ,

তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
করিয়াছি এক ঠাঁই,
বিশ্ব-বীণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই,

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় লেখা। তীর্থসলিলে সত্যেন্দ্রনাথ গানটির এই অনুবাদ দিয়াছেন,[৩]

বন্দনা করি মায়!
সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চন্দন-শীতলায়!
যাঁহার জ্যোৎস্না-পুলকিত রাতি
যাঁহার ভূষণ বনফুল-পাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী—সুখদায়—বরদায়!
বন্দনা করি মায়!
সপ্তকোটির কণ্ঠনিনাদ যাঁহার গগন ছায়,
চোউদ্দ কোটি হস্তে যাঁহার
চোউদ্দ কোটি ধৃত তরবার,
এত বল তাঁর তবু মা আমার অবলা কেন গো হায়?
বন্দনা করি মায়!

অনুবাদ বই তিনখানিতে বাঙ্গালীর লেখা ইংরেজি কবিতারও অনুবাদ কিছু আছে।[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক ইংরেজি কবিতাটির অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। এটিতে রবীন্দ্রনাথের ভাব সত্যেন্দ্রনাথের কলমে কেমন রূপ লইতে পারে তাহার নিদর্শন মিলিবে। কবিতাটির নাম 'একটি গান'।

১ "প্রাচীন বেদীর 'পরে, নূতন সমিধ্ সাজাইয়া,—তীর্থজলে রচিয়া পরিখা,—"।

২ সমাপ্তে। ৩ জাতীয় সঙ্গীত (ভারতবর্ষ)।

৪ তীর্থসলিলে আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের, স্বামী বিবেকানন্দের এবং সরোজিনী নাইডুর; তীর্থরেণুতে আছে অরবিন্দ ঘোষের, তরু দত্তের ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের, মণি-মঞ্জুষায় আছে অরবিন্দ ঘোষের, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তরু দত্তের কবিতা।

পাখী গাইত নিতি হৃদয়-খোলা খেয়ালে খুসী
ও সে মেল্‌ত পাখা মেঘের সীমানায় ;
আহা কোন্ ক্ষণে প্রেম সঙ্গ নিলে কোন্ আশা পুষি
পাখী জান্‌লে নাক' হায় !
আজ সে পাখীর স্বস্তি নাহি আর,—
হারিয়েছে নীড়,—হিয়ায় হাহাকার।
আর সে খেয়াল নাই গো উড়িবার,—
গানের-বিহার বন্ধ আজি তার।
বন্দী সে আজ প্রেমের বন্ধনে,
তবে চরম কথা মরম ক্রন্দনে
নিক্ সে ক'য়ে হায় !
আজ ফুরিয়েছে তার গগন-বিহার
হারিয়েছে কুলায়।

অনুবাদ-কবিতার মধ্য দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গীতিকবিতায় নূতন নূতন ফর্ম ও ছন্দোরীতি আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেমন জাপানি 'তান্‌কা'[১], ফরাসীর মাধ্যমে মালয় 'পান্তুম্'[২], হুগোর (Victor Hugo) ও ভেয়ারলেনের (Paul Verlaine) বিচিত্র স্তবক নির্মাণরীতি ইত্যাদি। তান্‌কার উদাহরণ,[৩]

জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এমনি কুয়াসা ;—
দৃষ্টি নাহিক চলে,
'বেলা হ'ল' তবু বলে !

পান্তুমের উদাহরণ,—বোদ্‌লেয়ারের (Charles Baudelaire) *Harmonie du Soir* কবিতার অনুবাদ 'সন্ধ্যার সুর',[৪]

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হা হুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন।

১ তান্‌কা দুই রকমের। এক রকমে—তিন ভাগ, অক্ষরসংখ্যা পাঁচ, সাত, পাঁচ। আর এক রকমে—পাঁচ ভাগ, অক্ষরসংখ্যা পাঁচ, সাত, পাঁচ, সাত, সাত।

২ পান্তুমে পূর্ববর্তী স্তবকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্র পরবর্তী স্তবকের যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় ছত্ররূপে পুনরাবৃত্ত।

৩ তীর্থ-রেণু।

৪ তীর্থ-রেণু।

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন গো ব্যথিত মন ;
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন গো ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
সুন্দর ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হ'য়েছে অদর্শন।

অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্য দিয়া সত্যেন্দ্রনাথের আর একটা প্রয়াস প্রকটিত। সে হইল ইউরোপের নবীন ও প্রবীণ সমসাময়িক কবিদের নামের ও রচনার সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় করিয়া দিয়া সাহিত্যে নূতন সৃষ্টির পথ দেখানো। নবীন কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন,—[ইংরেজিতে] অষ্টিন (Alfred Austin), ব্রিজেস্ (Robert Bridges), ইয়েট্‌স্ (William Butler Yeats), ও'শনেসি (Arthur O' Shaughnessy), পাউণ্ড (Ezra Pound) ; [ফরাসীতে] প্রুধোম্ (Sully Prudhomme), ভেয়ার্‌হেরেন (Emile Verhaeren), মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck), ভ্যালেরি (Paul Valery) ; [জার্মানে] ডেহ্‌মেল (Richard Dehmel), হোল্‌ৎস্ (Arno Holz) ; ইত্যাদি। ইউরোপের এই সমসাময়িক কবিদের রচনার অনুবাদের উৎকর্ষ নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে বোঝা যাইবে।

ইয়েট্‌সের *The Lake Isle of Innisfree*,

এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুটছি এবার জলটুঙিতে,—
ছোট্ট আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌ব সেথায় কাদার ভিতে ;
হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁসা,
পাহাড়তলীর নিদ্‌মহলে মৌমাছিদের শুন্‌ব ভাষা।...[১]

পাউণ্ডের অনুবাদ 'স্বর্ণমৃগ',

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে
পাহাড়ের জঙ্গলে
দুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে !

[১] মণি-মঞ্জুষা ; 'জলটুঙি' (প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৯)।

তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত-শুভ্র হাওয়া !
চিরকামনার স্বর্ণমৃগ সে
কীর্ত্তি তাহার নাম
শিকারী এবং কুক্কুরদলে
দেয় না সে বিশ্রাম।[১]

মেটারলিঙ্কের একটি কবিতার অনুবাদে ('চোখের চাহনি')[২] সত্যেন্দ্রনাথ সিঁড়িভাঙা ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন। তখনো 'বলাকা' বাহির হয় নাই, তবে এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সবুজপত্রে ও অন্যত্র ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাটির প্রথম অংশ এই,

ক্লান্ত শত নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন
আর এই আমাদের দৃষ্টি চির ক্ষীণ !
আর যারা গেছে চিরতরে, ফিরিবে না আর
তাদের চাহনি করুণার !
আর যারা হবে,
যারা আজ রয়েছে সম্ভবে,
আর যারা হল না, পেল না হ'তে হায়,
তাহারা সবাই আজ আঁখি দিয়ে আঁখি মোর ছায়।
কারো আঁখি যেন চির-অনাথ-আতুর,
করুণায় কারো পরিপূর,
কারো আঁখি দয়া করে তফাতে থাকিয়া,
যেন দয়া-দেখানোর অজানিত স্বাদ আল্‌গোছে দেখিছে চাহিয়া,
চাহনি সে নানা
কারো আঁখি ধব্‌ধবে ফরাসের পরে
কালোকোলো ছাগলের ছানা।

তীর্থ-রেণু পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের যথার্থ মূল্য বিচার হইয়া গিয়াছে।

এক রকম অনুবাদ আছে যাহা রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মত—তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায় কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না—অর্থাৎ তাহাতে খানিকটা পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে ইহা সৃষ্টিকার্য্য।

[১] তীর্থ-রেণু। [২] মণি-মঞ্জুষা।

'চীনের ধূপ' (১৯১২)[১] গদ্য পুস্তিকা হইলেও তীর্থ-সলিল তীর্থ-রেণু মণি-মঞ্জুষার সমপর্যায়ভুক্ত। চীনের অধ্যাত্মচিন্তার পরিচয় তাহার কবিতায় পাই না। সেই অভাব পূরণের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকায় চারিটি প্রবন্ধে তাও ও কন্‌ফুসিয়সের ধর্ম ও নীতি চিন্তার সহজ এবং মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়াছেন। চারি স্তবকের একটি কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ ভূমিকারূপে দিয়াছেন। কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে বোঝা যাইবে কবি সত্যেন্দ্রনাথ কোন আশা লইয়া বিশ্বসাহিত্যকে বাঙ্গালায় রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

বিশ্বে মহামানবের মানস-সুন্দরী
উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন 'পরে,
দিগ্‌গজেরা তীর্থজলে অভিষেক করি'
দিকে দিকে মন্ত্রধ্বনি করে হর্ষভরে।

সুরূপা য়ুরোপা তারে অঞ্জন জোগায়,—
ভারত সে অনবদ্য লীলাপদ্মখানি ;
বিশ্বরাজ-সমাগম-আসন্ন-আশায়
বিশ্বে মহামানবের সাজে চিত্তরাণী।

৬

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার দ্বিতীয় স্তরে (১৩১৩-১৩২০) যে কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল সেগুলি প্রধানত তিনটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল,—'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) ও 'তুলির লিখন' (১৯১৪)। এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের শক্তির মুখ্য বিকাশ। তাঁহার কাব্যভাবনায় আত্মচিন্তার স্থান বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকুও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইবার চেষ্টায় এখন ঘুচিয়া গেল। চোখে রঙের নেশা আর কানে ধ্বনির রেশ কবির মনে ঘোর ধরাইয়া দিল। ধ্বনির প্রবাহ ও নৃত্যচাপল্য ভাষায় ও ছন্দে ধরিবার চেষ্টাই এখন তাঁহার কাব্য-সাধনার ঈপ্সিত হইল।

'ফুলের ফসল' নামটি নেওয়া ফারসী "ফস্‌ল্‌-ই গুল্‌" হইতে।[২] গোড়াতেই

[১] বইয়ে রচনাকালের উল্লেখ নাই। ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের অপর যে বইয়ের বিজ্ঞাপন আছে তাহাতে হইতে বোঝা যায় যে চীনের-ধূপ জন্মদুঃখীর পরেই বাহির হইয়াছিল। পুস্তিকাটি "কবি-বন্ধু ভাবসঙ্গী পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে" উৎসর্গিত।

[২] তুলনীয় হাফেজ, "কায়্‌ বেখবর্‌ অজ্‌ ফস্‌ল্‌-ই গুল্‌ ও তবকে শরাব্‌" ; প্রমথ চৌধুরী, "জীবনে কদিন আসে বসন্তের ঋতু ? ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি ময়্‌সে তৌবা ?" (রচনাকাল ২৭ অক্‌টোবর ১৯১২)।

দুই স্তবকের একটি কবিতা, হজরৎ মোহম্মদের উক্তির অনুবাদ। এই কবিতাটির মধ্যে ফুলের-ফসলের মর্মকথা নিহিত।

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি',
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী !

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা।

ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "এই কবিতাগুলি ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত।"

বেশির ভাগ কবিতাই আকারে ছোট, কতকগুলি গানের ধরণের। কতকগুলি কবিতায় (সম্ভবত গোড়ার দিকে লেখা) রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ বেশ স্পষ্ট। যেমন,

হায় ! বারণ করে !
বারণ শুনি'—কি গো—তটিনী ফেরে ?
তবু, বারণ করে !
চরণ-ধ্বনি—তার—যখনি শুনি
বুকে সে বাজে—লাজে—কথা না সরে ![১]

সত্যেন্দ্রনাথ যে ১৩১৬-১৭ সালের দিকেই ছন্দ লইয়া পরীক্ষা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দুই চারিটি কবিতায় আছে। এখানে কবি চেষ্টা করিয়াছেন—অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে—পর্বে আদি অক্ষরে ঝোঁক ফেলিয়া গড়ানে ছন্দকে নৃত্যবৃত্ত করিতে। যেমন, 'স্রোতের ফুল', রবীন্দ্রনাথের "যদি বারণ কর তবে গাহিব না" গানের ছন্দের প্যাটার্নে।

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল !
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।
যুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল !

১ 'গান' (পৃ ২১)।

নিম্নের উদাহরণটিতে ছন্দের কুশলতা আরও পরিস্ফুট।

ওগো নবীনা লতা!
কেন দোলায়ে পাতা
বাতাসে জানাও
কচি কুঁড়ির কথা!
এই তো সকল
শাখা উঠিতে পুরি',
এই তো নকল
রাখী বাঁধিছে ঝুরি!
নহে বিহ্বল
আছো বহুল পাতা,
এখনি কেন গো
এত চঞ্চলতা?[১]

কোন কোন কবিতায় ধ্বনি ও চিত্রের একাত্মতা ঘটিয়াছে। এইগুলিই ফুলের-ফসলের বিশিষ্ট রচনা। যেমন,

হাওয়ার মত হাল্‌কা হিমের ওঢ়ন দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা শূন্য চোখে চায়,
তারার আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি অশ্রু-পরিপূর।[২]

সত্যেন্দ্রনাথের আঁকা বাঙ্গালা দেশের পল্লীশ্রীর এইরকম ধ্বনিচিত্র সমসাময়িক কবিতা-লেখকদের অনেককেই এই ধরণের রচনার দিকে প্রবলবেগে টানিয়াছিল,

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছ-রাঙা চায় শীকার ভুলে
কুহরে পিক অনর্গল,
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।[৩]

'ঘুমের রাণী'[৪] ফুলের-ফসলের শেষ কবিতার অন্যতম। ইহাতে দেখি যে কবির মন চোখের চেয়ে কানের উপর বেশি ঝুঁকিয়াছে।

[১] লতার প্রতি। [২] হেমন্তে। [৩] কিশোরী। [৪] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮।

দেখা হ'ল ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যা বেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে,
পরণে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়্‌না ওড়ে অঙ্গে,
দেখ্‌লে সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে?…

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দা,
হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজ্‌না শোনায় তারে!

এই ছন্দটি পরে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে॥

৭

ফুলের-ফসলের এক বছরের মধ্যেই 'কুহু ও কেকা' বাহির হইল। তবে বইটির পরিকল্পনা ফুলের-ফসলের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতীর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই কথা পাই,

> আগামী পূজার পূর্বেই তাঁহার মৌলিক কবিতার পুস্তক 'ফুলের ফসল' প্রকাশিত হইবে। এবং আগামী বড়দিনের সময় আর একখানি মৌলিক কবিতার পুস্তক 'কুহু ও কেকা' প্রকাশিত হইবে এরূপ সম্ভাবনাও আছে।

কাব্য নামটির ইঙ্গিত কবি পাইয়াছিলেন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের এই গান হইতে—"ওপারে মুখর হল কেকা এপারে নীরব কেন কুহু হায়।" বেণু-ও-বীণার মত কুহু-ও-কেকায়ও সত্যেন্দ্রনাথ একটু রূপকের ইশারা দিয়াছেন। তাহা বোঝা যায় প্রথম কবিতা 'দুই সুর' হইতে।[১] কুহু রঙের, সুরের, রসাবেশের রূপক। কেকা রূপের, গন্ধের, সুখ-উল্লাসের রূপক। এবং এ রূপক দুইটি দুইদিকেই খাটে —বনে ও মনে।

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি মন চুরি!
কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী! …

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে—কানন ভরে সৌরভে;
কলাপ মেলি করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে!

১ ফুলের-ফসলের 'ধারা' কবিতায় ইহার আভাস আছে।

মনের রঙ মনের রূপ কবি-অনুভাবগম্য। কাব্যে তাহার প্রকাশ সঙ্গীতের ইঙ্গিতে, আর সে বড় কঠিন কাজ। তাই

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে!
কামনা বুঝি কনক-ধুনী সুমেরু-চূড়া লঙ্ঘিতে!
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।

শুধু কাব্যনামে নয়, কুহু-ও-কেকার অধিকাংশ কবিতায় দেখি যে কবি রঙ ছাড়িয়া সুরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যচিন্তা ধ্বনির পথ বহিয়া রূপের অভিসারে অগ্রসর। ইহাও স্পষ্ট যে রূপের বিষয়ে কবি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন এবং ধ্বনিই উদ্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ধ্বনি ও রূপের সহযোগিতা কয়েকটি কবিতাকে অসাধারণ চিত্রসৌন্দর্য দিয়াছে, এবং এইখানেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের চরম বিকাশ। কুহু-ও-কেকায় এই ধরনের যে কয়টি কবিতা আছে তাহা সমসাময়িক কবিদের পল্লী-প্রীতির প্রেরণা দিয়াছিল।

'পাল্কীর গান' যেন খর গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের পল্লী-প্রকৃতির রূপবাণী।

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে—ডাগর
চক্ষু মেলে!—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

'ভাদ্রশ্রী' কবিতায় শরতের শান্তশ্রীর বর্ণনা চলিত কথায় গাঁথা।

টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুঞ্জগুলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পুবে বাতাস লাগছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

এই কবিতাটি ফুলের-ফসলের 'কিশোরী' কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। কিশোরীতে পল্লী-

প্রকৃতির ছবিটি রঙে রূপে উজ্জ্বল, ভাদ্রশ্রীতে সে রূপ যেন ধ্বনিমুখরতায় অবগুণ্ঠিত।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে কবির নিজের কথা নাই বলিলেই হয়। কেবল কুহু-ও-কেকার দুইটি কবিতায় ইহার ব্যতিক্রম দেখি।[১] সহজ সরল আন্তরিকতায় কবিতা দুইটি সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য। কয়েকটি কবিতায় 'শিশু'র ও 'গীতাঞ্জলি'র ভাবপ্রেরণা আছে।[২] এই কবিতাগুলির মধ্যেও আন্তরিকতার অনুভূতি। এই ধরনের কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'নমস্কার'।[৩] শেষ স্তবকটি এই,

> সৃজন-ধারার সোনার কমল
> ধরেছে যে জন বুকে,—
> শমীতরু সম রুদ্র অনল
> বহিছে শান্তমুখে,—
> অনুখন যেই করিছে মথন
> অতীতের পারাবার,—
> অনাগত কোন অমৃতের লাগি',—
> তাহারে নমস্কার !

হোমশিখার 'সাম্য-সাম'এর ধারা চলিয়াছে কয়েকটি কবিতায়।[৪] জাতীয় উৎসাহ-উদ্যমের নূতন সুর বাজিয়াছে কয়েকটিতে।[৫] বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবিহৃদয়ে আশার অন্ত নাই।

> অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
> বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
> প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
> লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
> মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
> মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।[৬]

কুহু-ও-কেকায় যে কয়টি প্রেমের কবিতা আছে সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র।[৭] কবিহৃদয়ের অতর্কিত প্রকাশ হইয়াছে এগুলিতে।

[১] সংকারান্তে, ছিন্নমুকুল। [২] আবার, প্রভাতের নিবেদন, পরীক্ষা, পথের পক্ষে, যথার্থ সার্থকতা, পিপাসী, সফল, অশ্রু, প্রার্থনা, ভিক্ষা, আকিঞ্চন ইত্যাদি। [৩] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। [৪] শূদ্র, মেথর, পথের স্মৃতি, দুর্ভিক্ষে, হাহাকার, নফর কুণ্ড ইত্যাদি। [৫] ঝোড়ো হাওয়ায়, বন্দরে, ছেলের দল, আমরা। [৬] আমরা (প্রথমপ্রকাশ 'বাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)।

[৭] লব্ধ-দুর্লভ, প্রিয়-প্রদক্ষিণ, তুমি ও আমি, অকারণ, মুগ্ধা, কনক-ধুতুরা ইত্যাদি।

দুইটি হাল্‌কা চালের কবিতা নারীর উক্তি।[১] প্রেমের কবিতা হিসাবে এ দুইটি ভালো রচনা। বিরহিণীর পত্র,

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাব্‌ছি আমি কোথায় তুমি হায় যে কতদূর,
কোথায় সহর কল্‌কাতা আর কোথায় কুসুমপুর।
না জানি কি ভাব্‌ছ এখন কর্‌ছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা? পরেছ কোন্‌ সাজ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
করছ কি যে পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুন্‌তে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের![২]

'সহজিয়া' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি হয়ত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে পড়িয়াছে কবির মনের গোপন কথাটি।

আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশ্‌গুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

কুহু-ও-কেকায় একটিমাত্র গাথা ধরনের কবিতা আছে। কবিতাটি একোক্তিক নয় বলিয়াই তুলির-লিখনে স্থান পায় নাই।

ইতিমধ্যেই যে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ছন্দ-অন্বীক্ষায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন তাহার প্রমাণ কুহু-ও-কেকার অনেক কবিতায় মিলিবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দুই সুর', 'পাল্কীর গান', 'ভাদ্রশ্রী', 'সাগর-তর্পণ', 'কবি-প্রশস্তি', 'বিশ্ববন্ধু', 'বন্দরে'। 'রিক্তা' ও 'যক্ষের নিবেদন' কবিতা দুইটিতে যথাক্রমে সংস্কৃতের মালিনী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দ অনুকৃত হইয়াছে। 'এখন ও তখন' কবিতাটির ছন্দ কবি নির্দেশ করিয়াছেন (সংস্কৃত) রুচিরা বলিয়া। কিন্তু প্রায় এই ছন্দেই রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে কবিতা লিখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল-বাতাস লেগে,

[১] সাড়ে চুয়াত্তর, অন্তঃপুরিকা। [২] সাড়ে চুয়াত্তর। [৩] চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে হৃদয় নাচে ;
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার ব্যাকুলিয়াছে।[১]

'সিংহল' কবিতাটির ছন্দও রবীন্দ্রনাথ হইতে পাওয়া বলিতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়াছেন, "Young Lochinvar-এর ছন্দে" লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ !

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।[২]

তফাৎ এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যতির শেষ ব্যঞ্জন স্বরহীন নয়॥

৮

'তুলির লিখন'এর কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে লেখা এবং সবগুলিই "একাত্মিকা পদ বা একোক্তি গাথা"। সর্বসমেত সতেরোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে কোন না কোন অপূর্ণ বাসনার বা আকুলতার অভিব্যক্তি ধ্বনিত। প্রথম কবিতা 'বিদ্যুৎপর্ণা'য় অমর্ত্য অপ্সরীর কামনা মর্ত্য সৌন্দর্যের জন্য।

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

দ্বিতীয় কবিতা 'সূর্য-সারথি'তে অকালজন্মা অরুণের আকুতি।

পঙ্গুর এই ভঙ্গুর দেহ
চালাবে আলোর রথ,
রশ্মি হেলনে সপ্ত অশ্ব
ছুটাইবে যুগপৎ,
দীপ্ত ললাটে উজলি চলিবে
আকাশের রাজপথ।

[১] ঝুলন (সোনার তরী)। [২] গীতাঞ্জলি (কবিতাসংখ্যা ৮)।

'শোভিকা'য় মথুরা-নাগরীর প্রেমবেদনা।

অনেক যামিনী ব্যর্থ গিয়েছে
অনেকের পরিচর্যা করি;
ক্ষণিকের মোহ ক্ষণে সে টুটেছে
ভুলেছি, ঠেলেছি, রাখিনি ধরি'।
না পেয়ে নাগালে যে পাওয়া পেয়েছি
তারি লেখা শুধু পরাণে ভায়,
হায় গো হায়!

'অনার্য্যা'য় পরের বাছার জন্য সন্তানহারা জননীর অন্তর্দাহ। 'পরিব্রাজক'এ গুপ্ত আত্মদৌর্বল্যের পরম অনুতাপ। কবিতাটি তুলির-লিখনের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। 'বাজশ্রবা' পুত্র নচিকেতার জন্য পিতার খেদ। 'রাজবন্দিনী' ইতিহাসের আভাস লইয়া লেখা। দেশশত্রুর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার পর আত্মত্যাগের ব্যাকুলতার প্রকাশ ইহাতে। 'যশ্‌মন্ত্‌'এ বাদশাজাদীর প্রেমের দুরাশায় উন্মত্ত শিল্পীর আর্তি।

আয়ী! আমায় ছেড়ে দে গো করব না কিছু,
(শুধু) নীল যমুনায় দেখ্‌ব গো জল, শির করে নীচু,
ডবল্‌ শিকল পরাস্‌—যদি উঁচু চোখে চাই,
নীল যমুনার জল দেখিতে বারণ তো কই নাই।

তুকতাকের দ্বারা স্বামীকে বশ করিতে গিয়া স্বামিঘাতিনীর বেদনার প্রকাশ 'দুর্ভাগা'য়। বয়স্ক বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ-কামনা অভিব্যক্ত 'বিদ্যার্থী'তে। 'শবাসীন'এ ব্রহ্মচারীর প্রেমতন্ময়তা। 'পরেয়া'য় আর্যদের প্রতি অনার্যদের ধিক্কার। 'সতী' সতীদাহের উজ্জ্বল ও দীপ্ত কাহিনী। 'বিষকন্যা'য় ও 'দেবদাসী'তে ভাগ্যবঞ্চিত নারীহৃদয়ের ক্রন্দন। 'মরিয়া'য় ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একদা প্রচলিত নরবলিপ্রথার কাহিনী। শেষ কবিতা 'শেষ'এ অতলের ভাণ্ডারী শেষনাগের জবানি।

যত সে হারা মন
পুরাতন
হারাপ্রাণ,—
হারানো আলোছায়া
স্নেহমায়া
ভোলা গান।...

যা' কিছু নিবে যায়
　　উবে যায়
　　　　মম ভায়
　　　　　　রহে সে,
যা' কিছু উঠে হেসে,—
　　　　ডুবে ভেসে
　　　　　　জমে এসে
　　　　　　　　এ দেশে;
আমারি মণি-ঘরে
　　থরে থরে
　　　　অবিরল
জমিছে আসলের
　　ফসলের
　　　　শেষ ফল॥

৯

'অভ্র-আবীর' (১৯১৬) বইটিতে ১৩১৯ সালের শেষার্ধ হইতে ১৩২২ সাল পর্যন্ত লেখা কবিতা সঙ্কলিত আছে। কাব্যনামের ইঙ্গিত রহিয়াছে দ্বিতীয় কবিতা 'অঞ্জলি'র শেষ স্তবকে।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি;
　　"আবিব্" "আবিব্" মন্ত্র-রাবে
　　কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

১৩২০ সালে শরৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ পশ্চিমভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীরভ্রমণে সঙ্গে ছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে অভ্র-আবীরের কতকগুলি কবিতা লেখা হইয়াছিল।[১] কতকগুলি কবিতা মনীষী-বন্দনা। এধরনের কয়েকটি কবিতা কুহু-ও-কেকায় দেখা গিয়াছিল। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া দুইটি কবিতা আছে[২], তাহার মধ্যে একটি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ বিষয়ে।[৩] কয়েকটি গান ও ছোট কবিতা আছে হাল্কা চালে লেখা। যেমন,

তোমার বিচার মিছার বিধি!
　　　　চাইলে মিলে না!
ক্ষুধাই শুধু দিলে মোদের
　　　　সুধা দিলে না!

[১] তাজ, কবর-ই নূরজাহান্, ইৎমদ্-উদ্দৌলা, বিশ্রাম-ঘাটে, বৃন্দাবনে, যমুনার জল, গুরু-দরবার, জাফ্রানের ফুল। [২] ইজ্জতের জন্য, মৃত্যু-স্বয়ম্বর। [৩] ইজ্জতের জন্য।

ক্ষুধাই কেবল চাইছে সুধা,
সুধার প্রাণে দাওনি ক্ষুধা!
তাইত এমন—হয় না সহজ—
দেনা কি লেনা।[১]

কবিহৃদয়ের অন্তরের আকুলতার প্রকাশ আছে কয়েকটি কবিতায়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুইটি,—'ঊর্ধ্ববাহুর প্রেম' এবং 'বৈকালী'। জীবনের বঞ্চনা প্রথমটির বক্তব্য।

অসময়ের এই যে মাতন জম্‌ল না সে তেমন ক'রে
দরদী ঠিক জুটল না কেউ প্রৌঢ়দিনের শেষ বাসরে;
কোথায় কিসের রইল বাধা
গেল না ঠিক কাউকে বাঁধা
উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর এই একটা বাহুর বাহুর ডোরে।

বৈকালী তান্‌কা ছন্দে লেখা।

অভ্র-আবীরের অনেকগুলি ও বিশিষ্ট কবিতায় দেখা যায় কবিভাবনার রঙে অনুরক্তি, মোটা রঙে। যেমন, 'সূর্য্যমল্লিকা', 'সবুজ পাতার গান', 'সবুজ পরী', 'কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ', 'জর্দ্দাপরী', 'লাল পরী', 'নীল পরী', 'চিত্র শরৎ', 'জাফ্‌রানের ফুল', 'সন্ধ্যামণি'। তবে প্রায়ই ধ্বনির মুখরতায় রঙের জেল্লা ফিঁকা হইয়া গিয়াছে।

সব্‌জে তোমার দোব্‌জাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সা রে গা মা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়্‌জে জাগে, বসন্তের সুর পঞ্চমে।[১]

'জাগৃহি' কবিতাটিতে বিজ্ঞান ও পুরাণকাহিনী মিলাইয়া জীবন-উন্মেষের রূপক-বর্ণনা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিভাবনার একটু বিশেষ প্রকাশ ইহাতে আছে। 'ইন্দ্রজাল' কবিতাটিও বিশিষ্ট রচনা। ইহাতে বেদ হইতে বর্তমান ইতিহাস যুগপৎ প্রতিফলিত হইয়াছে প্রাবৃট্‌বর্ণনায়। কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও ইহাতে প্রকট।

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি
ফিরে কি আবার ত্রিলোক শোষে?
কাহারে দমন করিতে দেবতা
বাহিনী সাজায় জ্বলিয়া রোষে?[৩]

কুহু-ও-কেকায় রবীন্দ্র-বন্দনা ছিল দুইটি। অভ্র-আবীরেও দুইটি আছে। পরবর্তী সঙ্কলন-দুইটিতে আরও ছয় সাতটি পাওয়া যায়॥

[১] সুধা ও ক্ষুধা। [২] তুলনীয় ঋগ্‌বেদ ৫. ২৭. ৩। [৩] সবুজ পরী।

১০

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে শুরু করেন প্রয়োজনের তাগিদে। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। যাঁহারা প্রবল বেগে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা সবাই রবীন্দ্র-অনুগত তরুণ লেখক,—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এবং বিপিনবিহারী গুপ্ত। 'মানসী' পত্রিকা ইঁহাদের আশ্রয় হইল। যতীন্দ্রমোহন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও বিপিনবিহারী লিখিলেন প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন ব্যঙ্গ কবিতা এবং প্রবন্ধ। যতীন্দ্রমোহনের "কাব্যে নীতি" প্রবন্ধ বাহির হইল ভাদ্র সংখ্যা মানসীতে। যতীন্দ্রমোহন সতেজে লিখিলেন,

> পাপ কলি বোধ হয় পূর্ণ হইল ; নতুবা কল্কি-অবতারের সাক্ষাৎ কেন ? সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আজ হাসির গান ত্যাগ করিয়া, থিয়েটারের গ্যালারি মাতাইয়া, অনুকরণে শিশুশিক্ষা পুস্তক রচনার অবসানে, সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ—জীবের আর ভাবনা নাই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবন্ধ 'বিরহ কাব্য' বাহির হইয়াছিল বেশ কিছুকাল পরে, ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায়। প্রবন্ধটি ঝাঁঝালো নয়, অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধকে দ্বিজেন্দ্রলাল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। অনেকে এই উপহাসে বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। তিনি গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইলেন যে মহৎ লেখকের রচনা সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার বেলায় সে অধিকার বেশি করিয়া মানিতে হইবে যেহেতু তিনি অত্যন্ত মহৎ লেখক; "তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গীর ইন্দ্রজাল যে সৌন্দর্য্যের মায়ালোক সৃজন করে, তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন কাজ। আর এরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে—নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির পর্য্যন্ত।" কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা জিজ্ঞাসা-প্রণোদিত নয় বিদ্বেষ-প্রণোদিত, তাই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ লিখিলেন, "কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদটী পড়িয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইতে হইয়াছে—নিরাশ হইয়াছি বলিতে পারিলে সুখী হইতাম"। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র-কাব্যের গভীর দিকের মর্ম্মজ্ঞ সমালোচনা প্রথম পাইলাম। (ইহাতে

রবীন্দ্রনাথের সংশোধন থাকা অসম্ভব নয়।) এই ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য প্রবন্ধটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

"Wordsworth, Browning প্রভৃতি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন"—দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তির জবাবে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ লিখিলেন,

> উজ্জ্বল ছবিই আঁকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, সত্য ছবি আঁকিতেই কবি বাধ্য, তবে সত্য শিব সুন্দর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া সকলরূপ মলিনতার মধ্যে উজ্জ্বল আপনি ফুটিয়া উঠে। সংসারে দুঃখ দৈন্য বেদনার অন্ত নাই, কিন্তু তার মধ্যেও গভীর আনন্দের নির্ঝর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে—Paradise সত্যই Lost হইয়াছে, কিন্তু তাহাই শেষ কথা নহে, Edenএ যে ইতিহাসের আরম্ভ Calvaryতে মহত্তর পরিণামের মধ্যে তাহার শেষ। এ তত্ত্ব রবীন্দ্রবাবু যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন খুব অল্প স্থানেই তাহা দেখিয়াছি।

পূজার সময় বসুমতী পত্রিকায় একটি ছবি বাহির হইল—দ্বিজেন্দ্রলাল "বাজপাখীর মত পক্ষ বিস্তার করিয়া রবীন্দ্র-হংসের উপর ছোঁ মারিতেছেন, আর বলিতেছেন 'সাহিত্যে দুর্নীতি'"। এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ কবিতা লিখিলেন 'মরাল ও পেচক'।[১]

> ""বাস্‌রে হেঁয়ালি" কহিল পেচক সকৌতুকে,
> "ঝালাপালা! বলি, কবিতার পালা গেল কি চুকে?"
> আসল কথাটা বল দেখি মোরে, ঘুচুক ধাঁধা,
> তুষারের মাঝে খাদ্য কি পাও মরাল দাদা?"
>
> কহিছে মরাল "রয়েছে মৃণাল শুভ্র শুচি;"
> "ক্ষুধা নিবারণ তাতে হয়? বোকা বুঝাও বুঝি,
> কবিত্ব ভুলি বল দেখি খুলে, আমার কাছে
> ইন্দীবরেতে কাজ নাই—বলি ইঁদুর আছে?"

মানসীর পরবর্তী সংখ্যায় বাহির হইল সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—'অপহরণ'। প্রবন্ধের আরম্ভ,

> বঙ্গভূমির গৌরবস্থল, বর্ত্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যসম্রাট, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক কাব্য ও কবিতাগুলিকে শঙ্কাস্পৃষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য ইংরাজী ও মার্কিন গানের বিখ্যাত অনুকারক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় দিঙ্‌নাগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সাময়িক সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এক অভিযোগ ছিল,—"বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ"। এ অভিযোগের উপযুক্ত জবাব যতীন্দ্রমোহন দিতে পারেন নাই। এখন সত্যেন্দ্রনাথ

[১] মানসী, কার্তিক ১৩১৬।

দেখাইয়া দিলেন যে অভিযোগ-কর্তা স্বয়ং অপহরণ-দোষে দোষী, এবং সে অপহরণ সত্যসত্যই অপহরণ। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসঙ্গীতে লিখিয়াছিলেন,

অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে।

দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস নাটকে লিখিলেন,

সম্রাট! অনুগ্রহ কর্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন।

প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু উদ্ধৃতির যোগ্য।

> সুদূর ভবিষ্যতে যাঁরা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি কঠোর সমালোচক হইবেন তিনি সত্যের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্র বাবুকে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর অনুকারক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি উদার প্রকৃতির লোক তিনি রায় মহাশয়কে রবীন্দ্রবাবুর শিষ্যের দলে, লাঞ্ছিত হরি ঘোষের দলে, স্থান দিবেন। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান ব্যবহার তাঁহার চক্ষে গুরুনিন্দা রূপে প্রতিভাত হইবে। চিরন্তন মানব-জাতির এজলাসে, হাকিম হইলেও দ্বিজেন্দ্রবাবু সহজে রেহাই পাইবেন না। আমি "অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম"।

তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার রচনাকে কটাক্ষ করিয়া আরও তিনটি ব্যঙ্গ কবিতা বাহির হইল—'কে তুমি?' (পৌষ), 'দশপদীর স্বরূপ' (মাঘ) এবং 'চড়কের চানাচুর। "বইঠি বিকায়"' (চৈত্র)। শেষ কবিতাটির আদি ও অন্ত উদ্ধৃত করি। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতার পরিপক্ক রীতি ইহাতে আবির্ভূত।

অয়ি তরলিকা! অয়ি মধুলিকা!
হে দেবী সুরেশ্বরী!
তোমার প্রসাদে চাট্‌নি এবং
চাটের দোকান করি।...
গোরস বেচিয়া পথে পথে রোদে
যে খুসী সে হ'ক কালো,
আমি জানি যাহা বইঠি বিকায়
তাহারি ব্যবসা ভালো॥

১৯১৩-১৪ সাল হইতে আবার ব্যঙ্গকবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল সত্যেন্দ্রনাথের। এ ঝোঁক আকস্মিক নয়, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। এই সময়ের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে প্রায়ই কবির ছদ্মস্বাক্ষর থাকিত "শ্রীনবকুমার কবিরত্ন"।[১] সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকবিতার সঙ্কলন 'হসন্তিকা'[২]

[১] ইহার আগে কোন কোন প্রবন্ধে "নবকুমার দত্ত" নাম দেখিয়াছি। ইহাও সত্যেন্দ্রনাথের ছদ্মস্বাক্ষর হইতে পারে। [২] আসল মানে 'হাপর', তাহা হইতে ব্যঙ্গার্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

(১৯১৭) কবির জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। নামপত্রে আসল ও ছদ্ম দুই নামই আছে।

হসন্তিকার একটি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[১] এবং অল্প কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের[২] ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের[৩] অনুকরণ আছে। একটি কবিতা—'রাত্রি বর্ণনা'[৪]—ব্যঙ্গকবিতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা যেন পুরানো দিনের কলিকাতা-পল্লীর নিদাঘ-নিশীথের ধ্বনি-ফোটোগ্রাফ।

> ঘড়িতে বারোটা; পথে 'বরোফ! বরোফ!'
> লোপ!
> উড়ি' উড়ি' আরসুলা দেয় তুড়িলাফ
> সাফ!
> পাল্‌কি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
> তুড়ে!
> আঁধারে হাডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
> ছুঁচা!
> পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ
> খোদ!
> বেতালা মাতালগুলা খায় হাল ফিল
> কিল!

১৩২১ সালের চৈত্রমাসে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন মহা-আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই খেদ করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার সাহিত্যে এখন বড়ই দৈন্যাবস্থা, বড় বড় মহাকাব্য ইত্যাদি রচিত হইতেছে না, এবং যাহা লেখা হইতেছে তাহা সবই "চুট্‌কি"—অর্থাৎ চটুল, ক্ষীণকায়, লঘু ও অস্থায়ী।[৫] শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদে

[১] 'হরফ-রিপাব্লিক' (তুলনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রেক্ষাক্ষর বর্ণমালা')। [২] 'কুক্কুটপাদমিশ্রের প্রশস্তি' ইত্যাদি। [৩] 'আদর্শ বিয়ের কবিতা' ইত্যাদি। [৪] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২০।

[৫] "এখন মনে হয় যেন, বেশী দিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্‌ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? ...রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙ্গলা ভাষার জয়জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে?"

সত্যেন্দ্রনাথ মর্মভেদী কবিতা লিখিলেন, 'অ!'।[১] ইহা তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা।

দেখ চুট্‌কি সূত্রে গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,
তাই কন্‌ফারেন্‌সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।
দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
আর দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।
হায় অল্পে সারিতে মরিল বেচারা
লিখে হয ব র ল,
এই জম্বুদ্বীপে কোন ফেলোশিপে
বক্তা না হল।—
(কোরাস) ... ... অ!

ওরে ইতিহাস কেউ লেখেনি চুট্‌কি
কিম্বদন্তী জুড়ি
ঢালি তিনপয়সার তাম্রশাসনে
টিপ্পনী ত্রিশ ঝুড়ি।
আর গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান-পুঁথি
পড়ানো হবে না পুত্রে,
ওতে চুট্‌কি ঢুকেছে, লিখেছে—বিজলী
ধরেছে ঘুড়ির সূত্রে।
আর চায়ের কেটলি ঢাকন ঠেলিয়ে,
নাচন দেখায় তারি।
হল হাজার চুট্‌কি-গল্পের ভারে
ভিজা কম্বল ভারী।...

ছি ছি চুট্‌কি ঘৃণ্য দৈন্যের ধ্বজা
দুটি শুধু তার ভালো,
ওগো পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুট্‌কিতে করে আলো!
ওরে এ দুটি চুট্‌কি রক্ষা করিয়া
রণে আগুয়ান হ,
আর চুট্‌কি-নিধনে চ' রে ভাই জিভে
দিয়ে থরশান।
(কোরাস, হাই তুলিতে তুলিতে) ... ... অ!

এই কবিতার ঢঙে লেখা 'হুঁঃ'। ইহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সরস আন্তরিকতা অত্যন্ত উপভোগ্য। কবিতাটি অহিংসা-সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইবার অনেক আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেখা।

(ওই) বুদ্ধ বকিল মিথ্যা বকুনি,—
বজায় রহিল যুদ্ধ;
(আর) যেহেতু খ্রীষ্ট নেহাৎ শিষ্ট
(তাই) ক্রুদ্ধ জগৎ সুদ্ধ!
(ত্যাখো) শিংশপা-শাখে ঝোলে অহিংসা
রজ্জু বাঁধিয়া গলাতে,
(হুঁহুঁ) মাতাল দুনিয়া চলেছে বেতাল
পঞ্চায়তের সলাতে।

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২।

(ছাখো) চাষা বোনে ধান, যাঁরা ধ্বংসান
তাঁরা হন মহাশয়,—
জমীদার, দাবীদার বা সিধার ;
চাষা সে চাষাই রয়।
(দাদা) জ্যান্ত লোকের ভাত রেঁধে হ'ল
রসুয়ে বামুন হীন ;
(ওসে) প্রেতের জন্য পিণ্ড র'াধিলে
পূজা পেত চিরদিন।
(অহো) মরণের পথে আল্‌পনা দিয়ে
(হ'ল) বামুন পূজ্য, ভাই,
(আর) জনমের কুঁড়ে আঁতুড় নিকায়ে
ছোটো জাত হ'ল ধাই।

(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা ক'রেছে তাদের
নামলেখা নামাবলী !···

বেলাশেষের-গান এবং বিদায়-আরতি এই দুটি সংগ্রহেও কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতা আছে সমসাময়িক ব্যক্তি ও ব্যাপারকে কটাক্ষ করিয়া লেখা। 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ'[১] ও 'নাপ্পি-পীরিতি কথা' কবিতা দুইটিতে ঝাঁঝ অত্যন্ত কড়া, ব্যঙ্গবাণ জ্বালাময়। উত্তরবঙ্গের এক সংস্কৃতজ্ঞ বড় পণ্ডিত ভালো সংস্কৃত শ্লোক লিখিতে পারিতেন। রবীন্দ্র-বিদ্বেষীরা তাঁহাকে ঘটা করিয়া "কবি-সম্রাট" উপাধি দিয়াছিল। ইনি 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই রচনাটিই 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' কবিতার উদ্দিষ্ট।

পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে বছর চল্লিশে,
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়স আর বোধোদয় হয় কিসে ?

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম্‌-এ ক্লাস খোলা হয়। এই বিভাগে তখন যিনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তিনি ক্লাসে বৈষ্ণব-কবিতা পড়াইবার সময় "পূর্বরাগ" কথাটির ব্যাখ্যা করেন বর্তমান হিন্দু-সমাজের মর্যাদা রক্ষা করিয়া। তিনি বলেন, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিলাতি কোর্টশিপ্‌ বা pre-nuptial love নয়, ইহা রাধাকৃষ্ণের গোপন বিবাহের পরেই জন্মিয়াছিল।

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী, চৈত্র ১৩২৬।

অর্থাৎ কিনা হিন্দু-সমাজে বিবাহের পরে বর-বধূর হৃদয়ে প্রেমের যে প্রথম আবির্ভাব তাহাই পূর্বরাগ। তখন বাঙ্গালা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সত্যেন্দ্রনাথকে এই অভিনব ব্যাখ্যার কথা বলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লিখেন 'নাপ্নি-পীরিতি-কথা'।

বাজাইয়া ধামি রজকিনী রামী কহিছে চণ্ডীদাসে,
'চল বড়ু, রসতত্ত্ব শিখিব পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে।'...

১১

বেলাশেষের-গানে ও বিদায়-আরতিতে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পের কোন নূতনতর বিকাশের পরিচয় বা ইঙ্গিত নাই। আত্মচিন্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই ধরনের কবিতার একমাত্র নিদর্শন 'খাঁচার পাখী'। কিন্তু এখানেও রঙের ভিড়ে ছন্দের নাড়ায় মনের কথা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

তোতা সে আজ আতা-গাছের[১]
পাতায় পাতায় ফিরছে কি ?
সবুজ-শিখার দীপান্বিতা
সকল শাখা ঘিরছে কি ?
হঠাৎ কেমন হচ্ছে মনে
ফুল ধরেছে সব গাছে,
সবুজ পাতার সার দিয়েছে
এই খাঁচারি খুব কাছে।

ধ্বনি ও ছবি এক হইয়া ফুটিয়াছে 'দূরের পাল্লা'য়।[২]

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বৌটি।

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।...

১ সত্যেন্দ্রনাথ সুযোগ মত প্রচলিত ছড়ার অংশ কবিতায় বুনিয়া দিতেন। এই ছত্রটি তাহার একটি ভালো উদাহরণ। চলিত ছড়ায় পাই,

আতা গাছে তোতা পাখী ডালিম গাছে মৌ
কথা কওনা কেন বৌ।

২ 'বিদায় আরতি' (প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৩)।

ডাক-পাখী ওর লাগি
ডাক ডেকে' হৃদ্দ,
ওর তরে সোঁত জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

সমসাময়িক পোলিটিক্যাল ও সমাজ-উন্নয়ন আন্দোলন কবির মন বিশেষভাবে টানিয়াছে। এই ধরণের দুইটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—'চরকার আরতি'[১] ও গান্ধিজী[২]। প্রথম কবিতাটিতে নগর-সভ্যতার বীভৎসতা ও কদর্যতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভস্মলোচন সব সভ্যতা রুক্ষ
কল ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত-ভুঁই চিম্‌নির ধোঁয়াতে,
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের ধোয়ানী।

বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি!
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়,
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্‌ণ
ভেগে যায় 'মেট্' সাথে, অনাথের করে ভিড়।

পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘরঘর—
লালসার লোলশিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে মহদাশয়ের মহৎকীর্তির আগমনী।

যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পুরা হয়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী গৌড়-বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

বেশির ভাগ কবিতায় ছন্দের নিপুণতা ও মাধুর্যই মুখ্য। ধীর ও চপল, মৃদঙ্গের ও নূপুরের বিচিত্র বোল ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন,

প্রাণে মনে হিল্লোল বনে বনে হিন্দোল মেঘে মৃদঙের বোল মৃদু-মন্থর;
শ্রাবণেরি ছন্দে কদমেরি গন্ধে আয় তুই চঞ্চল! চির-সুন্দর![৩]

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৭। [২] প্রথমপ্রকাশ ঐ ১৩২৮।
[৩] হিন্দোল-বিলাস (বিদায়-আরতি)।

আজি মন ফেরে মেঘে মেঘে, অভ্র-শিখায়
খুঁজে দূর রাকা, দূর রাস, দূর রাধিকায়
আজ আকাশের রুধি দ্বার রসের রণ!
সারা দুপুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়![1]

গলে সূর্য্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষ্ণা মোছে আঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে বুকে চাপে মরীচিরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে![2]

শহর-অঞ্চলে অপ্রচলিত তদ্ভব শব্দ কবিতায় প্রচলন করার চেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ অনেকদিন হইতেই করিতেছিলেন। শেষের দিকের কোন কোন রচনায় তদ্ভব শব্দের প্রতি ঝোঁক প্রায় মাত্রা ছাড়াইবার জো করিয়াছিল।

ভোর হ'ল রে ফরসা হ'ল ফুট্‌ল উষার ফুলদোলা,
আন্‌কো আলোয় যায় দেখা ওই পদ্মকলির হাইতোলা।
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে অথই নিথর পাথার জলে
আল্‌পনা দেয় আল্‌তো বাতাস ভোরাই সুরে মনভোলা।[3]

১২

সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকটি ছোট বিদেশী নাট্যরচনার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে চারিটি 'রঙ্গমল্লী'তে (১৯১৩) সঙ্কলিত আছে।[4] 'আয়ুষ্মতী' স্টিফেন ফিলিপ্‌সের লেখা ইংরেজী মূল অবলম্বনে কাব্যনাট্য, 'দৃষ্টিহারা' মেটারলিঙ্কের রচনার অনুবাদ, 'সবুজ সমাধি' চীনা নাটকের, আর 'নিদিধ্যাসন' জাপানী প্রহসনের ইংরেজির অনুবাদ। একটি কবিতা-ভূমিকা আছে, তাহাতে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নটরাজের বর্ণনা।

বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে সুরে মুহু 'পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিশ্বলীনা!

[1] মহুর-মাতন (বেলাশেষের গান)।

[2] বৈশাখের গান (বিদায়-আরতি)। কবিতাটির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের এই গান হইতে নেওয়া, "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।"

[3] ভোরাই (বেলাশেষের গান)। [4] কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই এমন রচনা, যেমন— পীয়ার্সের (P. H. Pearse) 'দি কিং: এ ময়্যালিটি'র অনুবাদ 'রাজা' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২২)।

'ধূপের ধোঁয়ায়'[১] মৌলিক কৌতুকনাট্য। সবই নারীভূমিকা। স্থান দশরথের পুত্রবধূদের অন্তঃপুর। কৌতুকনাট্যটির রচনায় পুরানো দিনের রূপ-রঙ-রসের সৃষ্টি করিবার বিশেষ চেষ্টা আছে ॥

১৩

সত্যেন্দ্রনাথের গল্পরচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'জন্মদুঃখী' (১৯১২)। বইটি নরোয়ের লেখক য়োনাস লী-র (Jonas Lie) 'লিভ্‌স্লাভেন্‌' (Livsslaven) উপন্যাসের অনুবাদ। শ্রমজীবীর দুঃখ-কাহিনীর বিষয়। ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

শেষ জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ একখানি মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিয়াছিলেন। দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখাও হইয়াছিল। এইটুকু প্রবাসীতে (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩০) বাহির হইয়াছিল। নন্দবংশের রাজ্যাবসানের কালের কাহিনী। সেকালের ভাব ও রস জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা আছে। ভাষা কথ্য। বইটি সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারিত।

সত্যেন্দ্রনাথের ছোটখাট গল্পরচনা—অনুবাদ ও মৌলিক—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় লভ্য। গদ্যে-পদ্যে লেখা একটি রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই 'ছন্দঃসরস্বতী'[২] প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ফ্যান্টাসির ধরণে নিজের ছন্দোভাবনার ও ছন্দঃপদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন ॥

১৪

রবীন্দ্র-অনুজ সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথেরই বুদ্ধি-বিদ্যার আয়োজন সবচেয়ে বেশি ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল এবং বর্তমান ইতিহাসের তিনি নিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন। ছন্দ এবং ভাষা দুইয়েতেই তাঁহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিতান্তই বিরল। তাঁহার কবিমানসের যে আবেগ তাহা বুদ্ধি-পরিচালিত ইমোশন, কদাপি প্যাশন নয়। ছন্দের প্রবাহে এই ইমোশনও প্রায়ই হারাইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গীতের রেশ সমগ্র কবিতার মধ্যে নির্বাধে এবং অখণ্ডভাবে সঞ্চারিত হইয়া

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৬; পুস্তকাকারে ১৯২৯। [২] প্রকাশ ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫।

ফিরিতে পারে নাই। জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের যে কৌতূহল ছিল তাহাও পূরাপূরি ভাবুকের ও ভোগীর নয়, অনেকটা কৌতূহলীর এবং খানিকটা তপস্বীর। সেই কারণে তাঁহার কবিতা প্রায়ই গভীর নয়, এবং যেটুকু গভীরতা লইয়া শুরু হইরাছিল তাহাও ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে॥

১৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক কবিদেব উপর তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় ঘরোয়া ভাবের প্রবলতা ছিল কিন্তু তাঁহার সমসাময়িকেরা ঘরোয়া ভাবকেই বেশি করিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব থাকিলেও তাহা গৌণ। তবে সত্যেন্দ্রনাথের কুহু-ও-কেকার কয়েকটি কবিতার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। রোমান্টিক ভাবের পল্লীপ্রীতিও এই কবিদের রচনায় মুখ্য স্থান লইয়াছে। ইহার মূল মহাজন রবীন্দ্রনাথ এবং অব্যবহিত মহাজন সত্যেন্দ্রনাথ। বেশির ভাগ কবিতাই মকৃশ ধরণের। তবে সবশুদ্ধ, সরলতা এবং খানিকটা অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা এইসব কবিদের বিশিষ্ট রচনায় উপলব্ধ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব একজন কবি সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-ভাবে ভাবিত এবং রবীন্দ্র-রসে মগ্ন। অবশ্য সমসাময়িক কবিরা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের মত রবীন্দ্র-নিষ্ঠ কেহই ছিলেন না, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও নন। বর্তমান শতাব্দীতে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ বারে বারে জাগিয়াছিল সাহিত্যিকদের মধ্যে। প্রত্যেকবারেই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিবাদই প্রথম, প্রবল এবং অকুণ্ঠ। চিত্রাঙ্গদাকে উপলক্ষ্য করিয়া কাব্যে নীতি লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যখন সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন প্রতিবাদ যে উঠে নাই তাহা নহে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও কার্যকর হইয়াছিল।[১] অনেক কাল পরে যখন সাহিত্যধর্মের সীমানা লইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বিবাদ বাধিয়াছিল তখনও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সবেগে সমর্থন করিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদে লেখা প্রবন্ধটিই[২] বোধকরি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের শেষ রচনা।

১ 'বিরহ-কাব্য' (মানসী, আষাঢ় ১৩১৭)। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২ '"সাহিত্য-ধর্মের সীমানা—বিচার' (বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪)।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এক সমসাময়িকের উক্তি স্মরণীয়। "সংসারে থেকেও যেন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন, পণ্ডিত হয়েও পাণ্ডিত্যের কোন অভিমান প্রকাশ করেন না, ব্যবসায়ী হয়েও ব্যবসায়ের কথার বদলে বলেন খালি রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং, শেলি, কীট্‌স্‌ ও হুইট্‌ম্যানের কথা, প্রবীণ হয়েও যৌবন-তারুণ্যে সদাই উচ্ছ্বসিত।"

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের গৃহে (ঠনঠনে কালীতলার কাছে) সাহিত্যিকদের রীতিমত বৈঠক বসিত এবং এ বৈঠকের সঙ্গে তুলনা করা চলে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠক (সুকিয়া স্ট্রীটে ভারতী আপিসে)।

সত্যেন্দ্রনাথের মতই দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ কবিতা লইয়া প্রথমে সাহিত্য পত্রিকার আসরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বেশি কবিতা লিখেন নাই তবে মাসিকপত্রে লিখিবার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। তাঁহার প্রথমদিকের একটি রচনা 'প্রদোষ'[১] উদ্ধৃত করিলাম।

প্রদোষে যখন সখি! বিষাদের ভরে
উদাস অন্তর ক্লান্ত পড়িবে নোয়ায়ে,
এইখানে এসে বস' একা এই ঘরে,
ঢেলে দিয়ো তনুখানি সায়াহ্নের বায়ে।
অই যে কোমল সুধাসরস সঞ্চার
করুণ সান্ত্বনা সম শান্ত সমীরণ,
মনে করো আসে যেন নিশ্বাস কাহার
প্রেমের বেদনাতপ্ত পরশ সেচন।
ওই সন্ধ্যাতারা সখি! আকাশের পরে
মৃদুল কিরণ-কম্পে ঈষৎ চঞ্চল,
ভাল করে চেয়ে দেখো যদি ক্ষণ তরে
মনে হয় ও কাহারো আঁখি-ছল-ছল;
গৃহকর্ম্ম অবসরে যদি কোন দিন
মধুর মোহেতে চিত্ত হয় উদাসীন।

মানসীতেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কবিতা দুইচারিটি বাহির হইয়াছিল।[২]

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ একখানিমাত্র কবিতার বই বাহির করিয়াছিলেন, নাম 'একতারা' (১৩২৪?)। বইটি "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে" উৎসর্গিত। ইহাতে এক শ নয়টি কবিতা আছে। ৩০ জুন ১৯১৫ হইতে ২৩ মে ১৯১৬—

[১] সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৮। [২] যেমন 'প্রেমের রাজ্যবিস্তার' (অগ্রহায়ণ ১৩১৭)।

এই সময়ের মধ্যে কবিতাগুলি লেখা। কেবল শেষ কবিতাটির রচনাকাল ১৪ বৈশাখ ১৩২৪।

নামপৃষ্ঠার পূর্বপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ হইতে এই সার্থক উদ্ধৃতিটুকু আছে,

"একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা।"

সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যে একটি সুর একটানা বহিয়া গিয়াছে। সে সুর মুগ্ধ, তৃপ্ত, ভাবৈকরস প্রেমের। এ প্রেম পত্নীর সান্নিধ্য ও স্মৃতি ঘিরিয়া গুঞ্জরিত, কিন্তু ঘরোয়া পটভূমিকা ও প্রাক্-ভূমিকা বর্জিত। এই প্রেমই কবির রচনার একমাত্র প্রেরণা।

এই যে আমার কাব্য লেখা এই যে গো গান গাওয়া;
নিপুণ করে যতন ভরে মনের মণি মাণিক ধরে
ভাষার সোনা-সুতায় শুধু হারটি গেঁথে যাওয়া?

নয়তো তাহা নয়গো!
নানান সুরে গানে গানে প্রিয়া আমার কানে কানে
গোপন প্রাণের কথাটি তার,
বারে বারেই কয় গো!......

আপন মনে গান গেয়ে যাই কোন্‌খানে হয় কি যে!
প্রিয়ার পরম পরশখানি ছাওয়া যেন সকল বাণী
গভীর প্রাণের বেদন-রসে সুরগুলি সব ভিজে।[১]

একটি প্রেমেই সকল প্রেমের পর্যবসান।

ধরণীর সব ভালোবাসা রূপ ধরেছে একটিখানে,
তোমার দেহে মনে প্রাণে;
সকল রস আর সকল পরশ সকল গতির বিপুল হরষ
মিলে বরণ গন্ধ গানে।[২]

এই জীবনের প্রেমের ডোর কবিহৃদয়কে পূর্বাপর জন্মের প্রেমের মালায় গাঁথিয়া চলিয়াছে।

সকল কথাই কথায় বলা যায় কি প্রিয়ে?
সকল ব্যথাই নয়নজলে দেয় জানিয়ে?
সকল সুখ কি অধরপুটে হাসির আভায় উজল ফুটে?
সকল প্রেম কি কেবল একটি জীবন নিয়ে?[৩]

[১] আমার গান। [২] ধরণীর প্রেম। [৩] চরম প্রকাশ।

সব পরশের পরশমণি নিবিড় পরশ তব,
সেদিন আমি অঙ্গ ভরেই লবো ;
সেই পরশের অসীম সুখে সব বুঝি মোর যাবে চুকে
একটি কথাও রইবে না যা কানে কানেই কবো।[১]

বহিঃসংসারের সঙ্গে বিশ্বভাবনার সঙ্গে কবিমানসের সংযোগ হৃদয় দিয়া বুদ্ধি দিয়া একেবারেই নয়। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের অত্যন্ত তফাৎ।

হায়! কুমারী স্ফটিকরচা, হায়! কুমারী তুষাররুচি,
শুভ্র শারদ-জ্যোৎস্না শুচি,
মোদের প্রাণ যে তৃষায় দহে কতই স্বপন গোপন রহে,
মুখে জাগাই হাসির লেখা, আড়ালেতে নয়ন মুছি।[২]

শানাইয়ের তানের মত টানা সুর, তাই কবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্যের আবশ্যকতা কবি অনুভব করেন নাই। কবিতার ভাষার জন্যও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ মাথা ঘামান নাই। সে তিনি পাইয়াছিলেন হাতের কাছেই রবীন্দ্রনাথের রচনায়। স্বভাবতই একতারার কবিতাগুলিতে ক্ষণিকার ছায়া বেশি করিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যেখানে ক্ষণিকার অনুকৃতি খুব স্পষ্ট সেখানেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কবিতা অনুজ্জ্বল হয় নাই। যেমন,

যৌবন-ঢেউ নিত্য দোদুল প্রাণে,
শান্তিশতক পালান মানে মানে,
অশান্তি যে হাজার রূপে হাসে ;
মোহের জোয়ার খেল্‌ছে কোটাল বানে
মুদ্গর যান ভেসেই অকূল পানে,
অবোধ হর্ষ প্রবোধচন্দ্রে গ্রাসে।[৩]

প্রেমভাবুকতার প্রকাশ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কবিতায় নূতন রস অর্পণ করিয়াছে। সহজ গার্হস্থ্য প্রেমসম্বন্ধকে আত্মমগ্ন কবি বাস্তবতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছেন।

স্বামীর সেবায় রমণীর যেই পরম পুণ্য,
জানি আমি বেশ তোমার চিত্ত সে-লোভশূন্য।
পুণ্যের দানে স্বর্গের জমি বন্দোবস্ত
তারো তরে তোরে দেখিনি তো কভু বিশেষ ব্যস্ত।

নিঃশ্বাস বহে, রক্ত চলিছে, হৃদয় স্পন্দে,
তোমার সেবাটি চলিছে সহজ স্বভাব ছন্দে।

[১] বিশ্ব-পরশ। [২] বীণাপাণি। [৩] বিপর্যয়।

দক্ষিণ হাওয়ার মরমের মাঝে যে সেবা বহে
স্নিগ্ধ জ্যোছনা-পরশের রসে সে সেবা রহে,

দেহ মন প্রাণ সবখানি মোর নিত্য চুমি
আমার পরম সেবা যে জাগিছ আমার তুমি।[১]

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা রচনা করেন নাই, দীর্ঘকাল বাঁচেন নাই, এবং তাঁহার একখানির বেশি কবিতার বইও নাই। এইসব কারণে তাঁহার কবিখ্যাতির প্রচার হয় নাই। বর্তমান সময়ে তো তিনি অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। কিন্তু তাঁহার রচনায় স্থায়িত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে, অতএব সে কাব্যের অনাদর সুচির হইবে না। একটি কবিতা—'ভরা প্রাণে'—উদ্ধৃত করিলাম।

ভেবেছিলাম তোমার কথা বলবো নাকো জনে জনে,
রইবে ঢাকা চিরদিন তা মনে মনে।
মন যে এমন উঠবে ভরে' জান্‌বো তখন কেমন করে'?
ছাপিয়ে উঠে পড়বে সে যে ক্ষণে ক্ষণে?

যেদিন মধু সঞ্চারিল মরম-ফুলে সঙ্গোপনে,
ভেবেছিলাম জানবে না কেউ বিশ্বজনে।
তখন কেবা জানতো আগে মধুর সনে গন্ধ জাগে,—
এমন করে ছড়ায় পাগল সমীরণে?

ভেবেছিলাম সাঁঝের ঘোরে যমুনাতে জল ভরিয়ে
ফিরবো ঘরে একা বিজন পথ ধরিয়ে;
সোনার কুম্ভে কাঁকণ লেগে মধুর ধ্বনি উঠল জেগে,
ভরা কলস চলার বেগে ছলছলিয়ে।

ভেবেছিলাম জীবন-ভরা মোদের চুমা গোপন ঘরে,
জান্‌বে না তা আর তো কেহ ঘরে পরে;
আঁধারের ওই বুকের মাঝে ধ্বনি তাহার এমন বাজে,
উঠল জ্বলে তারার হাসি আকাশ ভরে'।

একতারার পরে যে কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল তাহা এখনও গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই॥

[১] সেবা।

১৬

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) প্রথম কবিতার বই ক্ষুদ্রকায় 'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১) স্বদেশী আন্দোলনের দেশপ্রীতি-পর্বের সৃষ্টি। অপরিপক্ক রচনা হইলেও ইহাতে লেখকের শক্তির খানিকটা পরিচয় ছিল, এবং সাধারণ পাঠকের সমাদর পাইয়াছিল। ১৩১২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। রচনার একটু পরিচয় দিই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি সহজেই শোনা যায়।

কিরণে শিশিরে কুসুমে ধান্যে তরুণি,
অয়ি মা ভরণি, অমৃতস্তনি ধরণি,
ত্রিভুবন-মনোহারিণি,
অয়ি সুরধুনী-ধারিণি,
শোভন-শান্ত-উজ্জ্বল-শ্যাম-ভূষণা,
গগন-প্রান্তে লুণ্ঠিত নীল-বসনা,—
নমো নমো মম জননি।

তাহার পর প্রকাশিত হয় 'প্রসাদী' (১৩১১), 'ঝরাফুল' (১৩১৮), 'শান্তিজল' (১৩২০), 'ধানদুর্বা' (১৩২৮) ও 'রবীন্দ্র-আরতি' (১৩৪৪)। 'শতনরী' (১৩৩৭) চয়নিকা বই। করুণানিধানের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতা (যেমন 'সুদূর স্মৃতি', 'দুষ্টু', 'বাসনা') মানসীতে বাহির হইয়াছিল (১৩১৬-১৭)।

করুণানিধানের কবিপ্রকৃতির গঠন কতকটা দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত। কবিতার মধ্যে ভক্তিরস অন্তর্বাহী, এবং কবিহৃদয় গৃহবাসী। তবে দেবেন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতিকে ঘরোয়া মানুষের দৃষ্টিতে দেখিতেন, করুণানিধান তেমন নয়। ইনি প্রকৃতিকে প্রায় মানবসংসারের বাহিরেই রাখিয়াছেন। আর করুণানিধানের ভক্তিরস দেবেন্দ্রনাথের মত অতটা স্পষ্ট না হইলেও কিছু বৈষ্ণবতা-ঘেঁষা। করুণানিধানের কবিতা সংখ্যায় খুব বেশি নয়, এবং অনেক বিষয় লইয়া তিনি নাড়াচাড়া করেন নাই। তাঁহার কবিতা আবেগময়, এবং নিজের মত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। রচনারীতি অনায়াস-সরল এবং চিত্রকুশল। যেমন,

পিচ্‌কারিতে ঝরুল রঙের মেলা,
গানের ঢেউয়ে বিহান-হোরি-খেলা;
সেইত রাজা আমার চির-যৌবনের,
অন্তরঙ্গ-মন্ত্র-গুরু মোর
পরিয়ে দিল মুক্তাফলের মুক্ত-করা ডোর।
কণ্ঠ তাহার বীণার মত শুনি,
করলে যাদু, কি গুণ জানে গুণী।[১]

[১] মায়া-বাসর (প্রথমপ্রকাশ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬)।

না জানি কোথায় অতল-পরশে
অরুণ-প্রবাল-হর্ম্ম্যে,
বারুণী রূপসী বেণী-রচনায়,
শঙ্খ ধবল কঙ্কতিকায়
ভাঙ্গে অর্ব্বুদ জলবুদ্বুদ,
বিলাস-মুকুর-নর্ম্মে।[১]

১৬

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) কবিতা-অনুশীলন দীর্ঘদিনের। ১৩০৬ সাল হইতে ইঁহার কবিতা সাহিত্যে ও অন্য মাসিকপত্রে বাহির হইতে থাকে। তবে (১৩১৬ হইতে) মানসীতেই ইঁহার বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'লেখা' (১৯০৩)। তাহার পর 'রেখা' (১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৩), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'বন্ধুর দান' (১৯১৮), 'জাগরণী' (১৯২২), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯৩৬) ইত্যাদি। 'পথের সাথী' উপন্যাস।

গোড়া থেকেই যতীন্দ্রমোহন ছন্দে ও ভাষায় রবীন্দ্র-পন্থী। তাঁহার প্রথমদিকের রচনার নিদর্শন,

অয়ি মম হৃদয়কুঞ্জ অভিসারিকা
আজি রজনী-তিমির অবগুণ্ঠিতা
ত্রাসে নিখিল পৌরবধূকুণ্ঠিতা
এস ত্রস্ত বিশদবাস-লুণ্ঠিতা
মম তৃষিত হৃদয়মনোহারিকা।[২]

যতীন্দ্রমোহনের কবিতার প্রধান গুণ চিত্রলিপিকুশলতা। ছন্দে ও শব্দে তাঁহার অধিকার নির্বাধ। বিষয়েও বিচিত্রতা আছে। সমসাময়িক কবিদের মত তাঁহারও রচনায় পল্লীপ্রীতির প্রকাশ এবং ভাগ্যহত, নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশিত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় আবেগ খুব স্পষ্ট নয়, যেটুকু আছে তাহাতে রচনায় বেগের সঞ্চার করিয়াছে। জীবন বা জগৎ সম্বন্ধে কোন বক্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নাই। ইঁহার কবিতার সৌন্দর্য প্রসন্ন সরলতায়।

রবীন্দ্রনাথের পলাতকার কবিতাগুলি বাহির হইলে যাঁহারা এই ধরণের

[১] শ্রীক্ষেত্রে (প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯)।

[২] গান (প্রথমপ্রকাশ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৭)।

কবিতার পথে ধাবিত হইয়াছিলেন যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদিগের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার এই ধরণের কবিতার সংগ্রহ বন্ধুর-দান।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতার কিছু পরিচয় দিই।

বৃদ্ধা পৌষ—শীত-জর্জ্জর, শিরে কুহেলির জটা,
মিট্‌মিট্ করি' মেলিয়া আকাশে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি কটা,
প্রভাতে প্রদোষে লতা-পাতা-ঘাসে শিশিরের জাল বোনে—
কভু উদাসীন, রোদে পিঠ দিয়া বসি' রয় আন্‌মনে।

বিড়্‌বিড়্ বকি' লাঠি ঠক্‌ঠকি' কভু ঘন নাড়ে মাথা,
খস্‌খস্ করি' অমনি খসিয়া পড়ে সে গাছের পাতা;
কভু ক্রোধে সারা যেন জ্ঞানহারা, নাসিকায় শ্বাস পড়ে—
বিশ্বজগৎ উত্তরবায়ে থরথর করি' নড়ে।[১]

আমি রূপের দিশা পাইনা খুঁজে'—
কোথায় যে তার বাসা,
এক মুখে সে এক-এক সময়
বলে এক-এক ভাষা!
কালো কেশের ঝর্ণা পাশে
কভু বা সে লুকিয়ে হাসে
আঁখির কোণে কভু দেখি
ঝলক সর্ব্বনাশা!
সারা অঙ্গ ভরি' যখন-তখন
গোপন যাওয়া আসা;
ঠিক-ঠিকানা পাইনা ত তাই
কোথায় যে তার বাসা।[২]

হায় কবি হায়! এমনি করিয়া মিথ্যার ঠুলি পরি'
ভরা দুপুরেতে ঘনায়ে তুলিছ তমিস্রা শর্ব্বরী!
দিনও যেমন রাত্রিও তাই, সমান আঁধার আলো,
দুই আছে বলে' সুখে ও দুঃখে জগতে বেসেছি ভালো,
হাল্কা বলিয়া ফুৎকারে তব উড়াতে যেয়ো না সুখে,
আছে বলে' জীবে জীবনতৃষ্ণা জাগে তাই বুকে বুকে।
সুখ আছে বলে' সার্থক দুখ, সুখ আছে বলে' আছি,
মরণপন্থী—সেও বলে ভাই মরিতে পারিলে 'বাঁচি'!
মোটের উপরে সুখেরই মাত্রা বেশী না রহিত যদি,
কোথা হ'তে এই কাব্যের স্রোত কল্লোলে নিরবধি?[৩]

[১] মঞ্জুর (বন্ধুর-দান)। [২] উদাসী (নীহারিকা)।
[৩] দুঃখবিবাদী ("কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদী কবিতার ব্যঙ্গোত্তর", নীহারিকা)।

১৭

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২) করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন হইতে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। কুমুদরঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নহেন, তিনি পল্লীনিষ্ঠ। এদিক দিয়া তাঁহার প্রীতি ও নিষ্ঠা প্রগাঢ়। কুমুদরঞ্জনও দীর্ঘদিন হইতে কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কবিতার আকৃতি সাধারণত ছোট, সংখ্যায়ও সেগুলি অত্যন্ত বেশি নয়, কিন্তু তাঁহার কবিতাসাধনায় কখনো বিরতি হয় নাই।

কুমুদরঞ্জন পুরাপূরি ভক্ত এবং বৈষ্ণব। বাহিরের বস্তু ও ঘটনা তাঁহার কবি-চেতনায় যে আঘাত হানে তাহা প্রীতি ও ভক্তিরসের নম্রতায় বিগলিত; সৌন্দর্যের অনুভূতি আবেগের আন্দোলন জাগায় না। কুমুদরঞ্জনের কাব্যশিল্প অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর, কলাকৌশলের প্রচেষ্টাবিহীন। "আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন"—রবীন্দ্রনাথের এই কথা আক্ষরিক অর্থে কুমুদরঞ্জনের কবিতার পক্ষে সত্য। দেশের মাটির উপর কবির গভীর মায়া কবিতার বিষয়ে ও ভাবে এবং কাব্যের নামে অভিব্যক্ত। পুরাণকাহিনীর ইঙ্গিত প্রায় প্রত্যেক কবিতায়ই আছে। কুমুদরঞ্জন আজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষক-জীবনের শুষ্কতা তাঁহার কবিতাকে স্পর্শ করে নাই।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার বই—'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'শতদল' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বীথি' (১৯১৫), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'নূপুর' (১৯২০), 'রজনীগন্ধা' (১৯২১), 'অজয়' (১৯২৭), 'তূণীর' (১৯২৮), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮) ইত্যাদি। নাটক—'দ্বারাবতী' (১৯২০)।

গোড়ার দিকের রচনার নিদর্শন,

বৈশাখী প্রাতে চম্পক হাসে
উজলিয়া দশদিশি,
বকুলবালিকা খেলে কত খেলা
ধূলি-পাতা সনে মিশি।
আব্ছায়ে বসি যূথীজাতিগুলি
কত উপকথা বলে,
সুন্দরী উষা পরাইয়া দেয়
নীহারমালিকা গলে।[১]

যতীন্দ্রনাথের কবিতাটি 'মরুশিখা'র (১৩৩৪) অন্তর্গত। নীহারিকা যতীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত, মরুশিখা যতীন্দ্রমোহনকে।

[১] চিত্রকরের খেদ (প্রথমপ্রকাশ সমালোচনী, ১৩০৯ নবম সংখ্যা)।

কুমুদরঞ্জনের পরিপুষ্ট কাব্য-রীতির নিদর্শন,

> সলিল থেকে উঠলো যেন
> মুখটী ধুয়ে বরুণ-রাণী,
> গীত থেকে আজ তুললে মাথা
> কোন্ রাগিণীর মূর্তিখানি !
> বর্ষারাণীর মিষ্ট হাসি
> জমাট হয়ে জমলো আসি,
> তুলোট পুঁথির মলাট ভাঙি
> শকুন্তলা বেরিয়ে এলো ।[১]

১৮

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯) যতীন্দ্রমোহনের সমানধর্মা এবং তাঁহার মতই নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সাহিত্য-গোষ্ঠীর সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং কালিদাসবাবুর কবিতায় অগ্র-জাত কবিভ্রাতার প্রভাব খানিকটা পড়িয়াছিল। প্রথম হইতেই ইঁহার রচনায় ছন্দের সুভগতা ও ভাষার প্রসন্নতা পরিস্ফুট। অর্থ ও ভাবের জটিলতা নাই। পল্লীপ্রীতি প্রগাঢ়, তবে তাহার মধ্যে রোমান্টিক রঙ জোরালো। অতীত ও বর্তমান জীবনের রোমান্টিক রসকল্পনা কালিদাসবাবুর বিশিষ্ট রচনার প্রধান গুণ।

কালিদাসবাবুর রচনা অজস্র না হইলেও পর্যাপ্ত। কবিতার বই—'কুন্দ' (১৯০৮), 'কিসলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১৯১৪), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫),[২] 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬), 'ক্ষুদকুঁড়া' (১৯২২), 'রসকদম্ব' (১৯২৩), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৪), 'হৈমন্তী' (১৯৩৪), 'বৈকালী' (১৯৪০) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে কালিদাসবাবু তাঁহার রচনায় অল্পস্বল্প কলম চালাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সবসময় কবিতার উন্নতি হইয়াছে এমন বলা চলে না 'কুড়ানী' কবিতা হইতে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথমপ্রকাশের পাঠ,[৩]

> নালার জলেতে জালিটী পাতিয়া বসে থাকি আমি ঠায়,
> চুনোপুঁটী দুটা আঁচলে বাঁধিয়া, ফিরি কাদামাখা গায়।...

[১] ভুঁই-চাঁপা (প্রথমপ্রকাশ ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৬)। [২] কুন্দের কতকগুলি ও কিসলয়ের প্রায় সকলগুলি লইয়া 'বল্লরী' কুঞ্জবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল।

[৩] ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮।

পঞ্চম সংস্করণ পর্ণপুটের পাঠ,

নালীর 'পাউষে' জালিটি পাতিয়ে ব'সে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুঁটী দুটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।...

বোধকরি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবেই "নালার জলেতে" "নালীর পাউষে" হইয়াছে, এবং শিক্ষক কবি সাধুভাষার মর্যাদা রাখিতে গিয়া "বাঁধিয়া"কে "গিঁঠিয়ে" করিয়াছেন। এ পরিবর্তনে ডায়ালেক্ট্ কতটা রক্ষা হইয়াছে জানি না তবে দুর্বোধ্যতার জন্য কাব্যের হানি হইয়াছে।

সরল সহৃদয়তা কালিদাসবাবুর শ্রেষ্ঠ কবিতার গুণ। যেমন,

একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে
পাথর-বাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুরপুটে,
অম্ল খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
ভাবে ব'সে হায় লাগে নাকি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে!
কোন গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস-বশে দেবতা বাঁচাবে যেন,
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?[১]

১৯

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৮৯০) হাসির এবং সীরিয়াস দুই ধরণেরই কবিতা লিখিতেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মগাথা' (১৯১৪), 'রামধনু' (১৯২৬) ও 'হাসির হল্লা'। 'মর্ম্মগাথা' রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত। উপহার-কবিতাটি চতুর্দশপদী। শেষ স্তবকটি এই,

স্বদেশ-আত্মা গৌরবে তব সম্মান লভে চৌদিকে
কত না ছন্দে সুর-ঝঙ্কারে কীর্ত্তি তোমার ঝঙ্কৃত!
প্রাচ্য প্রতীচ দিয়েছে অর্ঘ বাঙালীর কবি-তৈর্থিকে,
দীন ভক্তের হৃদয়ে তোমার অরূপ স্বরূপ অঙ্কিত!
দিতে উপহার 'মর্ম্মগাথার' কোথা উপচার, বন্দনা!
তবু সম্ভ্রমে সঁপিনু তোমায়, নাহি থাক্ তাতে মূর্চ্ছনা।

মর্ম্মগাথার কবিতাগুলি ১৩১৭ সালের কার্তিক হইতে ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মধ্যে

[১] পল্লীর ঘাটে (পর্ণপুট)।

রচিত। কয়েকটি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার প্যারডি। মর্ম্মগাথার কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, কেবল একটি ছাড়া। সেটির নাম 'দেশের দাবী' (রচনাকাল ২৭ পৌষ ১৩২০)। সমসাময়িক তরুণ বাঙ্গালীর উৎসাহ-উদ্দীপনার অভ্রান্ত আবেগ আছে কবিতাটিতে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'দেশ' কারে বলে জানে না দেশের গরীব নিঃস্ব চাষারা ;
'দান' কারে বলে এখনো বোঝে না মাংসল ধনী দাতারা।
কবিরা বাজাতে চাহে না দামামা, বাজায় বেণু ও বীণাটি ;
গাম্ধীর কথা শোনে না শ্রোতারা পাছে লাগে দাঁত-কপাটী।
পৃথিবীর শত বিভিন্ন জাতি ছুটিয়া চলেছে গরবে,
ভারত যেন রে গোযানে চড়িয়া যেতেছে জীবন-আহবে।
চীনের টুটেছে আফিমের নেশা, জাপান জেগেছে পুলকে ;
ইউরোপ হাঁকে "চল্ ছুটে চল্, নহিলে মরণ পলকে।"
আমেরিকা ডাকে "আয় ছুটে আয়" বাজায়ে নবীন বাজনা,
জাগরণী গীতি গাহে বিজ্ঞান, একি রে নূতন সাধনা !
মোরা পড়ে' আছি তাজা নরনারী অন্ধকূপের মাঝারে ;
ব্যবসা করিছে সচল জাতিরা বিশ্বের বড় বাজারে।
তোরা প্রেমের পুলকে আয়,
যুগের সঙ্গে যুবক ব্যতীত কে আর যুঝিতে চায় ?

যতীন্দ্রপ্রসাদের শেষের দিকের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকরণ খুব স্পষ্ট। যেমন,

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
আজ কেন তুই অমন কোরে তুল্‌লি এ প্রাণ চুলবুলি !
ডাগর চোখের রগড় দেখে, বন্যা বুকে উঠল ডেকে,
সুখের ব্যথায় কাঁপছে শরীর, চেয়ে আছি চোখ্ তুলি'—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি ![১]

২০

বিংশ শতাব্দী যখন শুরু হয় তখন ভারতী এবং সাহিত্য—এই দুইখানি মাসিকপত্রই প্রধান। দুইটিতেই প্রবীণ ও নবীন কবিদের লেখা স্থান পাইত, তবে প্রবীণের স্থান ভারতীর আসরে বেশি, সাহিত্যের আসরে কম। সাহিত্যের আসরে প্রবীণ কবি বলিতে দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়াল। তরুণ কবিতা-লেখকদের

[১] 'বুল্‌বুলি' (ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৬)।

রচনা সাহিত্যের "কবিতাকুঞ্জ"এ স্থান পাইত। পরবর্তীকালে কবিতা লিখিয়া যাঁহারা অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই প্রথমে সাহিত্যের দরবারী ছিলেন,—সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, শ্রীযুক্ত সরলাবালা দাসী, রমণীমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ সোম ইত্যাদি।

কেহ কেহ কবিতা ও গল্প দুইই লিখিতেন, পরে কবিতা ছাড়িয়া গল্পলেখায় মন দেন। ইঁহাদের মধ্যে পড়েন সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬)[১] ও তাঁহার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত[২], শ্রীমতী সরলাবালা দাসী (জন্ম ১৮৭৫)[৩], শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (জন্ম ১৮৭৬)[৪], প্রকাশচন্দ্র দত্ত, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি।

গিরিজাকুমার বসুর (১৮৮২-১৯৩৫) কবিতা ভারতী ও সাহিত্য ইত্যাদিতে াহির হইত। ইনি দীর্ঘদিন ধরিয়া, জীবনের শেষ অবধি কবিতা লিখিয়াছিলেন। স সবই প্রেমের কবিতা। স্বীয় রচনাসংকলনে ইঁহার অত্যন্ত নিঃস্পৃহতা ছিল। সইজন্য নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় 'ধূলি' (১৯১০) ছাড়া আর কোন বই ইঁহার নাই। গরিজাকুমার ১৩১৩ সালে 'রেণু' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

বেনোয়ারীলাল গোস্বামীর (১৮৬০-১৯৩৮) কবিতা প্রথমে নব্যভারতে, পরে াহিত্যে বেশি প্রকাশিত হইত। গোড়ার দিকে ইনি গম্ভীর কবিতাই লখিতেন। পরে প্রধানত সরস কবিতা। তাহার পরিচয় কাব্যনামেই প্রকট— খিচুড়ী' ও 'পোলাও' (১৯২৩)। অপর কাব্যগ্রন্থ 'বেণুবন' (১৯২৯) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশের (জন্ম ১৮৭৮) কবিতা অনেক পত্রিকায় স্থান

[১] কাব্যগ্রন্থ 'অশোকা' (১৯০১) ও 'শতদল'; গল্পগ্রন্থ 'কাহিনী' (১৯০৫) ও 'ফুলদানী' ১৯১৫); উপন্যাস 'প্রেমের সমাধি' (১৯২২)।

[২] ইনি সিভিলিয়ান ছিলেন এবং সাহিত্য-সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাহিত্যে ইঁহার কবিতা ও ল্প কিছু বাহির হইয়াছিল। নাট্যগ্রন্থ 'মনীষা' (১৯১৯) ইঁহার একমাত্র বই। ইংরেজীতে ইনি ্শুর রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী লিখিয়াছিলেন।

[৩] কাব্যগ্রন্থ 'প্রবাহ' (১৯০৪) ও 'অর্ঘ্য' (১৯১৫), গল্পের বই 'চিত্রপট' (১৯১৭), ইত্যাদি।

[৪] ইনি ছিলেন, 'দাসী' ও 'আর্যাবর্ত্ত'এর সম্পাদক, সাহিত্য-সম্পাদকের বন্ধু ও সাহিত্যগোষ্ঠীর যাদ্ধা-লেখক এবং প্রায় পঁচিশখানি উপন্যাস-গল্পগ্রন্থের প্রণেতা। যেমন, 'অধঃপতন' (১৮৯৯), প্রেমের জয়' (১৯০২), 'বিপত্নীক' (১৯০২), 'নাগপাশ' (১৯০৮), 'প্রেম-মরীচিকা' (১৯০৯), অদৃষ্টচক্র' (১৯১৩), 'নাতবৌ' ইত্যাদি।

পাইত। ইঁহার কবিতার বই,—'গানের খাতা' (১৯১৪), 'মন্দির' (১৯২৫) 'সুসোমা' (১৯২০), 'রেবা' (১৯২৮) ইত্যাদি।

মানসী-ও-মর্মবাণীর গোষ্ঠীপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮ ১৯২৫) সঙ্গীতে ও সাহিত্যে বিশারদ ছিলেন। ইঁহার পত্রিকায় ইঁহার গদ্যপদ্য রচন প্রায় নিয়মিতভাবে বাহির হইত। কাব্যগ্রন্থ একটিমাত্র—'সন্ধ্যাতারা' (১৯১৬) গদ্যরচনা—'নূরজাহান' (১৯১৭) ও 'শ্রুতিস্মৃতি' (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)।

মানসীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯০ মানসী-ও-মর্মবাণীর বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। গদ্যেপদ্যে ইনি প্রচুর লিখিয়াছেন কবিতার বই—'মন্দিরা' (১৯১৪), 'খঞ্জনী' (১৯১৪), 'সপ্তস্বরা' (১৯১৪) 'পত্রচিত্র' (১৯২২), 'চিত্র ও চিত্ত' (১৯৩১), 'হবিত্রী' (১৯৩৭), 'রূপ ধূপ' (১৯৩৮), 'সুরধুনী' (১৯৪১) ইত্যাদি; গল্পের বই—'গল্পমাল্য' (১৯১৭) 'শাপমুক্তি' (১৯২৫), 'অবশেষে' (১৯২৮), 'পঙ্কজিনী' (১৯২৮) ইত্যাদি উপন্যাস—'সুনীতি' (১৯১১), 'সুরেশের শিক্ষা' (১৯১২), 'দিবাস্বপ্ন' (১৯২৫ 'মায়ামৃগ' (১৯২৭), 'জয়ন্তী' (১৯২২) ইত্যাদি; নাট্যগ্রন্থ—'মীরাবাই (১৯১১), 'সতী' (১৯২৯), 'চ্যারিটি শো' (১৯৩৪) ইত্যাদি। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৯১৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকাহিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শুনি লেখা, মূল্যবান্ রচনা।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫) কুচবিহার হইতে নবপর্যায় 'পরিচারিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩২৩-৩১)। ইঁহার কবিতার বই দুইটি— 'ধূপ' (১৯১৮) ও 'গোধূলি' (২৯২৮)। গোধূলি নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

ঠাকুর-বাড়ীর লেখকদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীমতী হেমলত দেবী (জন্ম ১৮৭৪) এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)। হেমলতা দেবী কাব্যগ্রন্থ—'জ্যোতি' (১৯১১) ও 'অকল্পিতা'; নাট্যগ্রন্থ 'শ্রীনিবাসের ভিটা (১৯৩৫), গল্পের বই 'দুনিয়ার দেনা' (১৯১০) ও 'দেহলী' (১৯৩৯) দিনেন্দ্রনাথও গদ্য পদ্য দুইই লিখিয়াছিলেন তবে পরিমাণে খুবই অল্প। মৃত্যুর প ইঁহার কিছু কিছু রচনা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

কুমুদনাথ লাহিড়ী 'বিল্বদল' (১৯১৩) প্রভৃতির রচয়িতা, সুধাকৃষ্ণ বাগচ 'জ্যোৎস্না'র। দেবকণ্ঠ বাগচীর গান ও কবিতার বই—'দেববীণা' (১৯১১ ও 'খেয়াল' (১৯১৩)।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কণা' (১৯১১) ও 'উৎসব' (১৯১২) কবিতার বই। মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর কবিতার বই 'মানসকুঞ্জ' (১৯১২) ও 'কবিতারাধনা' (১৯১৭), গল্প-উপন্যাসের বই 'হালদার-বাড়ী', 'নবীনের সংসার' (দ্বি-স ১৯২৮), 'দেশের বড়দা' (১৯১৭), 'শুভেন্দুর কলঙ্ক', 'জল-প্লাবন', 'মিলনতীর্থ', 'সোনার বাধন', ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা মূল ফারসী হইতে সাদীর কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] এগুলি প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) বাহির হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) কিছু সরস কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'ঝলক' (১৯২৩) ও 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) নামে প্রকাশিত। ইনি গল্পগ্রন্থ, নাট্যগ্রন্থ, সরস প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখিয়াছিলেন॥

[১] শেখ হবিবর রহমান পরে অনুবাদ করিয়াছিলেন 'বুস্তাঁ' (১৯৩২) ও 'গুলিস্তাঁ' (১৯৩৩)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীর আসর

১

প্রথম প্রকাশের দিন হইতেই ভারতী পত্রিকা নূতন ও তরুণ গদ্যলেখকদের প্রতি আনুকূল্য করিয়া আসিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দের বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী লেখক ভারতীর আসরে ভর করিয়াই সৃষ্টিসার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। ভারতীর আসরের উপান্ত্য পালার মূল অধিকারী ইনিই ছিলেন। বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়াছিল তাহার চৈত্ত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যেমন অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে লেখ্যকর্ম হইতে চিত্রকর্মে পৌছিয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথও অনেকটা তেমনি ভাবেই চিত্রকর্ম হইতে লেখ্যকর্মে পৌছান। চিত্র ও লেখ্য দ্বিবিধ কর্মেই অবনীন্দ্রনাথের রূপদক্ষতার নিজস্ব, অসাধারণ পরিচয় পরিস্ফুট। রূপচিত্র এবং রূপকথা দুই-ই অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে শুরু করিয়াছিলেন, এবং রূপচিত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার আগেই রূপ-কথায় সিদ্ধি অসংশয়িত হইয়াছিল।

মেয়েলি ছড়া ও ব্রতকথার সংগ্রহে ও সৌন্দর্যবিশ্লেষণে আদিকর্মিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবনীন্দ্রনাথ অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূপশিল্পী মন এই পথে নব নব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ ও প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছিল। পুরানো রূপকথা-কাহিনীকে নূতন রঙে রঞ্জিত করিয়া অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দরবারে প্রথম দেখা দিলেন। 'ক্ষীরের পুতুল' ও 'শকুন্তলা' বাহির হইল (১৮৯৫); একালের ও সেকালের রূপকথা দুইটির নবজন্ম হইল। মেয়েলি আলপনা চিত্রের সন্ধানে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতকথার অন্দরমহলে হানা দিলেন এবং তাহার ফলে পাইলাম 'বাংলার ব্রত' (১৯০৯)। মোগল-রাজপুত চিত্রকলার অনুশীলনসূত্রে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের আদি সিদ্ধাচার্য পৌছিলেন রাজপুত-কাহিনীতে। অল্পবয়সীদের উপলক্ষ্য করিয়া লেখা তাঁহার 'রাজকাহিনী'র (১৯০৯)[১] কাহিনীগুলিতে নূতনতর মাধুর্যের সঞ্চার হইয়াছে।

[১] প্রথমপ্রকাশ ভারতীতে (১৩১১ হইতে)।

অবনীন্দ্রনাথের লেখায় চলিত ভাষার সহজ ভঙ্গির সরল প্রকাশ। তবে গোড়ার দিকে তাঁহার সীরিয়াস রচনায়, বিশেষ করিয়া শিল্পতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধে, অনেক সময় সাধুভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ধরনের রচনার মধ্যে প্রথম হইতেছে 'দেবী প্রতিমা'[১]। প্রবন্ধটির ভাষায় যেন বাণভট্টের মুরজনির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত। যেমন,

> যে রাত্রে আমার গৃহদ্বারে, মুকুলিত রসালের সুরভিত পল্লবশয়নে, মধুমত্ত বধূসহায় পরভৃৎ, তাহার মধুকষায় পঞ্চমস্বর সুপ্তজগতে বারম্বার কুহরিত করিল;—যে রাত্রে, তোমার নববিরহে অতিবিকল আমার নিদ্রাহীন নেত্রদ্বয় নববসন্তের মলয়চুম্বনে সুখালসে নিমীলিত হইল, সেই রাত্রে হে রঞ্জনা, হে তরুণী তম্বঙ্গী, আমার শিশিরকাতরা ভীরু বিহঙ্গী, তুমি দেশান্তরে, নীলাম্বুচুম্বিত সিন্ধুতীরে, তোমার সেই উত্তরে রোপিত তমালশ্রেণী, দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পকুঞ্জের মধ্যস্থলে, অগুরুবাসিত আতপগৃহে, শিশিরভয়ে নিবিড়বিলম্বিত স্থূল যবনিকার পটান্তরে বাতায়নশ্রেণী অবিচ্ছেদে রুদ্ধ করিয়া এবং অবিরলবিস্তৃত লোম-কোমল আস্তরণে গৃহতলের তুহিনতা হরণ করিয়া দিবারাত্রি কখন সঙ্গীতচর্চায় কখন কাব্যালাপে কখন বা মৃগচর্মনির্মিত তপ্ত শয্যায় অলসলুণ্ঠিত দেহে কনকপাত্রে অনলোজ্জ্বল মদিরা পানে সমস্ত শিশিরকাল বঞ্চনা করিয়া আমাদের দেবদারুচ্ছায় নিবিড় উত্তর জনপদে তোমার জলরাশিবেষ্টিত কুঞ্জভবনে আরবার ফিরিয়া আসিবে।

সে বছর ভারতীর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার লেখনীস্পর্শ রচনাটিতে থাকা অসম্ভব নয়। তবে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রের পক্ষে এ রচনা সুসঙ্গত।

অবনীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব রচনারীতি তাহার মূল কথ্যভাষার নিতান্ত সরল মেয়েলি ঢঙে, কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য আসিয়াছে লেখকের শিল্পী-মানসের সংবেদনশীল সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব হইতে। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় বিষয় ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া এমন অখণ্ড রূপ পাইয়াছে যে বিশ্লেষণ করিয়া রচনার অবয়ব দুটিকে পৃথক্ করিয়া দেখানো যায় না। অবনীন্দ্রনাথের লেখাকে সত্যসত্যই বলিতে পারি "তুলির লিখন"॥

২

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা স্বয়ংগৃহীত। বাল্যে নর্মাল ইস্কুলে কিছুদিন পড়িয়া অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে উনিশ বছর বয়স অবধি পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাহার পাঠ সাঙ্গ হয়। সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বলি।

[১] ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫।

…কলেজের গায়ে অমন যে গোলদীঘির সবুজ ঘাস, ফুলগাছ-দেওয়া বাগান, সেটার দিকের প্রবেশ-পথের জানালাগুলো, গরাদ-আঁটা ফাটকের তালা কাউকে খুলে দিতে দেখিনি, কাজেই কাঁচা বয়সেই কলম-সরস্বতীর একটা চমৎকার বন্দনা লিখে বিদ্যামন্দিরের এন্‌ট্রান্‌স থেকেই সরে পড়তে আমি একটুকুও লজ্জা বোধ করিনি। বরং উৎসাহই দেখিয়েছিলেম। বন্দনাটা সব মনে নেই; কিন্তু মনে আছে হেড-মাষ্টারের কাছে সেজন্যে খুব তারিফ পেয়েছিলেম।

"এসো মা হৃদয়ে বসো,
হৃদির আঁধার নাশো।
দয়া কর আমারে মা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী!!"

এটা আমার উনিশ বছরের original composition; …উনিশ বছরে নিজকে ক্ষুদ্র প্রাণী বোলে জ্ঞান করছি জেনে তোমরা মনে-মনে নিশ্চয় হাসছ। কিন্তু ভেবে দেখো ক্ষুদ্রপ্রাণী না হ'লে বিদ্যার জাঁতিকলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়া আমার পক্ষে কতটা শক্ত হতো![১]

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া অবনীন্দ্রনাথ যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চায় রত হইলেন। তাঁহার কথায়

কলমের চারা বাগানের Glass House ছেড়েই আমার সঙ্গীতের তালগাছের দিকে নজর পড়ল। আমি তারি ছায়ায় যতটা তালগাছের দেওয়া সম্ভব, সেইখানে বোসে তাল-সরস্বতীর ঢোলের পিঠে আর এক-একবার তাঁর বীণার তারেও বাঁ-হাত বোলাতে সুরু করলেম। উনত্রিশ পর্যন্ত এইভাবে বাঁ-হাতে তানসেনের তাল-সরস্বতীর সেবা চলেছিল। ফল কিন্তু পাইনি।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল চিত্রাঙ্কনের দিকে।[২] সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনেরও অনুশীলন হইতে লাগিল। তখনকার রীতি অনুযায়ী তিনি আর্ট শিখিতে লাগিলেন ইংরেজ শিল্পী-শিক্ষকের কাছে। এই সময়ে আঁকা ছবিগুলিতে বিলাতি ঢঙের অনুসরণ দেখি। তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বছর (১৮৯৮) তখন দৈবক্রমে তাঁহার হাতে আসে তাঁহাদেরই পৈতৃক সংগ্রহের একখানি গ্রন্থ যাহাতে মোগল বাদশাহদের আমলে আঁকা অনেক ছবি ছিল। এই ছবিগুলি দেখিয়াই তিনি পাশ্চাত্য রীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় চিত্রাঙ্কনরীতি অবলম্বন

[১] হাইলাণ্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির ভাষণ (ভারতী ফাল্গুন ১৩২৬, পৃ ৮১১)

[২] শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার লিখিয়াছেন, "শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্মা কোন সময়ে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। সেই সময়ে বালক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প-অবলম্বনে রচিত রেখাঙ্কন চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'বালকের সাহস ত কম নয়?—এখন হইতেই এরূপ গুরুতর বিষয় আঁকিবার চেষ্টা!" (ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ১৫১)।

করিয়া আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। অবনীন্দ্রনাথের নূতন শিল্পসৃষ্টি গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাভেল্‌এর (E. B. Havell) নজরে পড়ে। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট কলেজে ভারতীয় শিল্পের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার এবং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, বেঙ্কটাপ্পা প্রমুখ তাঁহার আদি শিষ্যবর্গের সাধনায় ভারতীয় চিত্রকলার মূল্য অচিরে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিল।

শিল্পানুরাগ, ফারসী-প্রিয়তা, ও আধুনিকতার উপর রোমান্‌সের ছোঁয়া—ভারতী-আসরের লেখকদের এই তিনটি মূলসূত্র অবনীন্দ্রনাথেরই দান॥

৩

মোগল-রাজপুত চিত্রের অনুধাবনপথে অবনীন্দ্রনাথ পৌছিলেন রাজপুত-কাহিনীতে। রূপকথার স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে কথকতার মনোহারিতা জড়িত হইয়া কাহিনীগুলি[১] নূতন রসের স্বাদ বহন করিয়া আনিল। অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মত এগুলিও শিশুপাঠের ভঙ্গিতে লেখা, এবং এগুলির রস-গ্রহণও পাঠকের বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়।

রাজপুত-কাহিনী হইতে অবনীন্দ্রনাথ অচিরে পৌছিলেন ইতিহাসের ঝালর-দেওয়া রোমান্‌স-রূপকথার মায়ামণ্ডপে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ একবার পুরী হইতে কোনারকে গিয়াছিলেন। বছর তিন-চারি পরে সেই নৈশ নিরুদ্দেশ-যাত্রার স্মৃতি-সূত্র অবলম্বনে[২] মেয়েলি আলাপ ছেলেমি প্রলাপ ছড়ার বাক্‌ছন্দ ও রূপকথার রঙ মিশাইয়া অদ্ভুত-কৌতুকরসের, স্বপ্ন-জাগরণের, সম্ভব-অসম্ভবের, অতীত-বর্তমানের বহু-আয়তন ও বিচিত্রবর্ণ মায়াপট বুনিলেন—'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৩২২)।[৩] এই অসামান্য অসাধারণতার জন্যই বোধ করি বইটি উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। তাই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সঙ্গত মনে করিতেছি।

কাহিনীর নায়ক—অর্থাৎ লেখক—মাসিপিসি দুজনেরই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। আগে বনগাঁ-বাসিনী মাসির বাড়ি গিয়া সেখানে যথেচ্ছ মোয়া খাইয়া পেট ধামা করিয়া তাহার পর পাল্‌কিতে শুইয়া চলিয়াছেন পিসির দেশে যেখানে তিনি কখনো

[১] দুই খণ্ড রাজকাহিনীতে সঙ্কলিত। বুদ্ধের সময়কার কাহিনী। নালকও এই পর্যায়ের রচনা।

[২] লেখকের আঁকা ছবিগুলি রচনার মূল্য বাড়াইয়াছে।

[৩] 'গমনাগমন' (পথে-বিপথে) দ্রষ্টব্য।

যান নাই—"তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে"। যাইবার সময় "মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে ; হাতে একগাছা

ভূতপতরীর মাঠে পাল্‌কি হইতে শোনা কুহু ও-কেকার গান (অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত)

ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয় আলোয় যেতে।" রাত দুপুরে ভূতপত্‌রীর মাঠ দিয়া পাল্‌কি চলিয়াছে। মাঠের মধ্যে শেওড়া গাছের ঝোপ ও ঘোড়ার গোর পার হইলেই তেপান্তর মাঠ শুরু; "তারপরে আর হাটও নেই বাটও নেই;—কেবল মাঠ ধু ধু করছে।" শেওড়া-তলায় ঘোড়া ভূতের উপদ্রবে নায়ক নাস্তানাবুদ হইলেন। বীর-বাতাসের চোটে পাল্‌কি আপনি উড়িয়া চলিল, বেহারাদের সন্ধান রহিল না। পাল্‌কি আটকাইল গিয়া বুড়ো মনসা গাছের তলায়। বুড়ো মনসা গাছ, "মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপরে মাছ ধরছিল। মনসা বুড়োর ছিপে মাছতো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখীর পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শীতে আটকা পড়ছিল।" মনসা বুড়ো প্রথমে মনে করিয়াছিল তাহার বঁড়শীতে বুঝি বড় মাছ গাঁথা পড়িয়াছে। তাহার উল্লাস থামিল ভূতপত্‌রীর লাঠির খোঁচা খাইয়া। পাল্‌কিটা সোজা করিয়া জিনিসপত্র গোছাইয়া নায়ক অপেক্ষা করিতেছেন বেহারাদের জন্য, সেই অবসরে মনসা বুড়োর সঙ্গে কথাবার্তাও চলিতেছে। মনসা বুড়ো নিজের ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল।

> আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানা রকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কতকালের কথা, সে নদী শুকিয়ে, জল সরে, চড়া পড়ে গেছে কিন্তু এখনও ঝোঁক কাটেনি, মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে?

কথা কহিতে কহিতে বেহারারা আসিয়া পড়িল। পাল্‌কি চলিল। হঠাৎ নায়কের সন্দেহ হইল ইহারা মানুষ নয় ভূত। অমনি ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে হইতেই বেহারারা পাল্‌কি ফেলিয়া পলাইল। নায়ক অগত্যা পাল্‌কির ভিতরে চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন পাল্‌কিশুদ্ধ চাঁদের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলেন এক-হাঁটু জল নদীর ধারে পৌঁছিয়াছেন। কাছেই ছিল জনমানবশূন্য গাঁ। সেখানে একটা ঘরের দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া নায়ক শুইয়া পড়িলেন। বেহারারা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইল। তাহার পর আবার যাত্রা—"বেশ আরামে পাল্‌কিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে"। "চার ভূতে চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিট্‌খিট্‌, টিক্‌টিক্‌, করে গান গাইতে গাইতে চলেছে,—ঠিক যেন কতদূর থেকে চিল ডাক্‌ছে, আর

কোলা-ব্যাং কট্‌কট্‌ করছে।" ভোর তিনটার সময় পাল্‌কি পৌছিল খেজুরতলায়। "এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডীতলা, সেখানে রামসীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে যাবার জো নেই। ভূতপত্‌রী লাঠিরও জোর সেখানে খাট্‌বে না।" রামচণ্ডীতলা একেলা হাঁটিয়া গিয়া অনেক কষ্টের পর মন্দিরে রামসীতা দর্শন করিয়া একটা কাঁটাবন পার হইয়া সমুদ্রে গিয়া পৌছিলেন নায়ক। দেখা গেল সেখানে ছয়টা বেহারা সেই পাল্‌কি লইয়া বসিয়া আছে,—"দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে"। ইহারা নায়কের পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে ও হারুন্দে। চারিজন পাল্‌কি বহিয়া চলিল, পাল্‌কির দুইধারে দরজা ধরিয়া চলিল হারুন্দে ও কিচ্‌কিন্দে নিজেদের কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে।

> হারুন্দের মাথায় কালোচুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকাচুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচ্‌কিন্দে কালো মীস,—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির উপরে মনসাগাছ—খাড়া খাড়া, খোঁচা খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লট্‌পট্‌ করছে। কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো—খানিক আলো, খানিক অন্ধকার, একদিকে ধপ্‌ধপ্‌ করছে শুকনো বালি আর একদিকে টল্‌মল্‌ করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলেছি, না, সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির উপর দিয়েই চলেছি।
>
> আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে বালি, আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো,—কাজলের মতো কালো,—বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে—জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে, আমি চলেছি পাল্‌কিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেনসিল্‌ দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেট কেটে বসে গেছে,—ধুলেও ওঠে না, মুছলেও যায় না,—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

হারুন্দে আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী হারুন-অল্‌-রশীদ, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দার শা বাদশা—যাঁহার কাহিনী আরব্য-উপন্যাসে পড়া আছে, যাঁহাকে আবুহোসেনের থিয়েটারে দেখা আছে, যিনি কখনো সদাগর সাজিয়া বেড়ান কখনো ফকীর সাজিয়া, কখনো বা কাফ্রি ভৃত্য সাজিয়া। এখানে তিনি দেখা দিলেন পাল্‌কি-বেহারার সাজে। হারুন্দের মুখে নায়ক যাহা শুনিলেন তাহা আরব্য-উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা, সুতরাং আরব্য-উপন্যাসে তাহা নাই। এবারেও তাঁহার এড্‌ভেঞ্চার সিন্দবাদের এক জাহাজডুবির উপসংহাররূপে শুরু হইয়াছিল।

সিন্দবাদ এক-সিন্ধুক হীরা-জহরত লইয়া জাহাজে করিয়া আসিতেছিল বঙ্গোপ-সাগরের পশ্চিম তীর ঘেঁষিয়া। কোনারকের কাছাকাছি আসিলে মন্দিরচূড়ায় যে চুম্বক পাথর ছিল তাহার আকর্ষণে জাহাজের লোহার পেরেক সব খসিয়া গেল জাহাজও ডুবিয়া গেল। লোহার সিন্দুক গিয়া ঠেকিল মন্দির-চূড়ায়। সিন্ধবাদ কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিল।

লোহার সিন্ধুকের খোঁজে মসুরকে সঙ্গে লইয়া হারুন-অল্-রশীদ চলিলেন হিন্দুস্থানে ম্যাজিক সতরঞ্চিতে বসিয়া নানাদেশ দেখিতে দেখিতে। দিল্লীতে তাঁহার একটু লড়াইয়ের মত হইল। লাহোরে ঔরঙ্গজেবের পাগ্‌ড়ির হীরা ছিটকাইয়া পড়িয়া নিদ্রিত রণজিত সিংহের একটা চোখ নষ্ট করিয়া দিল।

এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ওদিকে রণজিত সিং একগাল হাস্‌তে হাস্‌তে কোহিনুর হীরেটার দিকে একচোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি তাজবিবির কবরটার চারিদিকে বুড়ো সাজাহানটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুরশিক্‌রির দিকে সতরঞ্চ চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের উপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারি খুসি! "এসো ভাই বোগদাদি!"—বলে আমাকে পাশে বসালো! তার সঙ্গে এক-পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি তাকে বলি আগরওয়ালা।

আকবরের অনুরোধমত হারুন-অল-রশীদ এলাহাবাদে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করিলেন। নূরজাহানকে ঠেকাইয়া দিয়া জাহাঙ্গীর গা ঢাকা দিলেন। নূরজাহানকে হারুন সাবধান করিয়া দিলেন জাহাঙ্গীরকে সামলাইয়া চালাইতে।

এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা। সেখান থেকে পুরী এবং সিন্ধুকের অন্বেষণ। দেখা গেল সিন্ধবাদও সিন্ধুকের খোঁজে সেখানে হাজির। সিন্ধুক যেখানে পোতা আছে সে নামটা আর কিছুতে মনে পড়ে না।

এমন সময় কিচ্‌কিন্দে হারুন্দের মুখ বন্ধ করিয়া দিল, শোনো কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনো কালে হারুন-আল্-রশীদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কল্‌কাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য-উপন্যাস আর ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খেয়াল চাপ্‌লেই সেই পড়াগুলো আওড়ায়। কখনো একটুকরো ইতিহাস, কখনো উপন্যাস, দু'ছত্তর বা কবিতা, দুটো বা সত্যি কথা, দশটা বা মিছে কথা।

হারুন্দেকে টেক্কা দিয়া কিচ্‌কিন্দে শুরু করলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারি যুগের গল্প, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কাহিনী। তাহার সঙ্গে উড়িয়া কবিতা আবৃত্তি ও গান এবং বাঁশি বাজানো। কিচ্‌কিন্দের বাঁশি শুনিতে শুনিতে নায়ক ঘুমাইয়া

পড়িয়াছেন। পাল্‌কি সমুদ্রের জলে পড়িতে ঘুম ভাঙিল। সাত সমুদ্দুর পারে পিসির বাড়ি। জাহাজ-নৌকায় যাওয়া যায় না। "জলের উপর দিয়ে, পিসির বাড়ি যাবার রাস্তা নেই, যেতে হবে জলের নীচে দিয়ে,—ডুব-সাঁতার মেরে, সাতঘাটের জল খেতে খেতে।" জলের তলার দেশের মধ্য দিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে নায়ক পৌছিলেন পিসির দেশে। সেখানের সবকিছু মাসির দেশের ঠিক উল্টা। কিচ্‌কিন্দে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, "জলের উপরে তোমার মাসির বাড়িতে যা করতে জলের নীচে পিসির বাড়িতে এসে ঠিক তার উল্টোটা না করলে মুস্কিলে পড়বে"; "ডাঙার উপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুক্‌নো ভাত আর জলের নীচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলায়ের ডাল পাত্‌লা—যেন জল, আর এখানকার কলায়ের ডাল যেন মুক্তোর মত ঝুরঝুরে।"

পিসির দেশের অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্রতর তাহার বর্ণনাও তেমনি সমুজ্জ্বল ও কৌতুকাবহ, যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার চিত্রমালা। যেমন, সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাঙ মারিয়াছে, রামসিং দোবে কনেষ্টবল আসিয়া তাহার হাতে দড়ি দিল। ফলে রামসিঙের এই হইল,

> ব্যাঙের দিষ্টিতে তার মুখ পুড়ে গেলে,—মুখে আর তার কিছু রোচে না—
> নিম লাগে মিষ্টি!
> সন্দেশ লাগে তেতো!
> মুড়কী লাগে ঝাল!
>
> সে কেবল ঘুস খেয়ে খেয়ে, ধমক খেয়ে খেয়ে ছিষ্টি ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে খেয়ে, বেড়াতে লাগলো।

মাসির বাড়ির শেষ দৃশ্যে গুরুমহাশয় ও তাঁহার জোড়া বেতের আবির্ভাব। গুরু লিখিতে আদেশ করিলেন, "অবু তবু গিরিসুতা" ইত্যাদি,

> আমি জানি সব উল্‌টো লিখতে হবে, না হলে বেত, কাজেই আমি মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকো ঘর কেটে লিখছি—প্যাঁচা পেঁচি দুই ভূতা! কিন্তু যেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়! এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলায় হাজির। সেখান থেকে দেখচি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর-ঝুর করছে, তারি তলায় মা-আমার দুগ্‌গো পিদিম্ জ্বালছেন। ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠেঙ্গার গুঁতি-হাতে, সঙ্গে হারুণে কিচ্‌কিন্দে আর সেই মনসা-বুড়ো আর আংলা কাংলা বাংলা যত ভূত-পেরেত! যেমন গুরুকে দেখা আর—মা!—বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অমনি দেখি আমাদের বাড়িতে হাজির।

৪

ভূতপত্‌রীর দেশের পরেই লেখা হইল সচিত্র 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৩২৩)। এ বইটিও ছেলেদের জন্যে লেখা, এবং ইহার উপভোগ্যতা বয়স্কদের কাছেও কিছুমাত্র কম নয়। কর্তা (খাতাঞ্চি), গিন্নি, এক মেয়ে (সোনা), দুই জমজ ছেলে (আণ্ডুটি-পাণ্ডুটি) ভৃত্য, (সোনাতন), তাহার বিড়াল-বৌ, কুকুর (বোহিম) ও এক পরী শিশু (পুতু) এবং বাল্যস্মৃতি লইয়া এই শিশুমানসিক উপন্যাসটি রচিত।

খাতাঞ্চি প্রতিদিনের ঘরসংসারের অনুদারতার, কৃপণতার, কঠিনতার, গতানুগতিকতার প্রতিমূর্তি। তাঁহার কাছে কড়ির বাড়া কিছু নাই। কড়িতে সব আনন্দের সব প্রয়োজনের দাবি মিটে। তাঁহার খাতা খেরো-বাঁধান জাব্‌দা, তাহাতে হিসাব লিখিতেছেন, "গোলাবাড়ির কোন্ কোণে কি জমা হল, কোন্ ঘরে কি খরচ হল।" খাতাঞ্চি মহাশয়ের প্রথম সন্তান সোনা জন্মিলে ভৃত্য সোনাতন হাসিমুখে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,

> "কর্তার মেয়ে হল, এবার বখসিস্ চাই।" খাতাঞ্চি তাকে ধম্‌কে বল্লেন,—"বাজে বকচিস্ ফের!" তারপর সোনাতনের হাতে একটি আধলা পয়সা দিয়ে খরচের ঘরে খাতায় লিখলেন—"প্রথম কন্যার জন্মোপলক্ষে বখসিস্ বাবত বাজে খরচ আধ পয়সা!" অমনি মনটা ছাঁৎ কোরে উঠলো। একটু ভেবে খাতাঞ্চি খরচের পাতায় জের টানলেন—"সোনাতনের হাওলাত বাদ তাহার গত বৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা।" কিন্তু এতেও বাজে খরচ বন্ধ হওয়া দায়, এবার খাতাঞ্চি মশায় বেশ বুঝলেন।

পুতু জগৎ-সংসারের নিকড়িয়া রসের, শিশুচিত্তের স্বপ্নজাগরণের ভাবনাকল্পনার প্রতীক। তাহার খাতা রাঙা ফিঁতায় বাঁধা সবুজ পাতা। সে খাতা সব ছেলেরই আছে, কেউ জানে কেউ জানে না।

> সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি-কোরে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেল্লে মুস্কিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজের চাবি নেই; একটা কোরে কীল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজপাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি! সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায়, এমন কি রাতের স্বপ্নের ছবিও, এই ছোট্ট খাতায় রোজ-রোজ নতুন-নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে।...যতদিন না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোনো ছেলেমেয়ে এই লুকোনো খাতার সন্ধান পায় না।
>
> অনেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তবু এই সবুজখাতা-লুকোনো দেরাজের সন্ধানই পেলে না; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই ওই খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার মা আমাকে আমার সবুজখাতাখানি

দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি সে খাতার গুণ? আর একটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদল করেছিলুম আর কি! ভাগ্যি মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি আমায় কোলে বসিয়ে যখন সেই খাতা থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আমি অবাক হয়ে গেলুম। কি রং দিয়েই সে সব ছবি লেখা! বাজারে সে রং পাবার জো নেই।

পুতুর সঙ্গে সোনার ও আঙুটি-পাঙুটির ভাব জমিবার পরে একদিন সোনার মায়ের সঙ্গে তাহার পরোক্ষ পরিচয় হইল। সেদিন

বাইরে দুপুর-রোদ ঝাঁঝাঁ করছে—এমন গরম যে কেউ আর বাইরে নেই। "কালবোশেখি আগুন ঝরে, কালবোশেখি রোদে পোড়ে, গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই!" কুকুরটা পর্যান্ত দাওয়ার উপর ছায়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। গাছের পাতাটি নড়ছে না। "ঘুমতা ঘুমায় ঘাটের পাতরা, ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা!" সেই সময় অন্ধকার-করা ঘরটিতে ছেলেমেয়ে-তিনটিকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার মা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। ঠাণ্ডা ঘরখানি, জানলার নীচেই আতাগাছের আগডালের দুটি-চারটি সবুজ পাতায় রোদ লেগেছে। দূরে মাঠের মাঝে একটুখানি জল ঝিক্‌ঝিক্ করছে। কোন্‌খানে একটা ঘুঘু সুর কোরে বল্‌তে লাগল—"পুতুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্—দুপুর ঘুম্‌ঘুম্‌ঘুম্।" সোনার মা তাই শুনতে-শুনতে কখন আস্তে-আস্তে হাতের সেলাই কোলে রেখে জানলার ধারটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন—আর একটি ছোট মেয়ের মতো, অমনি আস্তে-আস্তে সোনার মায়ের মনের মধ্যেকার সবুজখাতায় একটি ছবি পড়ল :—

আতাগাছের বাসায় ঘুঘু পুতুকে ঘুম-পাড়িয়ে নদীতে চান্ করতে গেল। পুতু এতক্ষণ মট্‌কা-মেরে চোখ বুজে ছিল। সে অমনি আস্তে-আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশী বাজাতে লাগল। মানুষ হয়ে পুতু ঘুঘুর বাসায় ঘুমোচ্ছে,—সে পাখীর মতো আতার ডালে উড়ে বসল—এ সব সোনার মায়ের কাছে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হলো না, মনে হলো পুতু যেন কতদিনের চেনা! তিনি দেখলেন, সোনা আর আঙ্‌টি পাঙ্‌টি জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ডাকলে—"আয় পুতু—উ—উ—!" অমনি 'পুতু' হিজুলিপাতার জামা বাতাসে মেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এলো, সঙ্গে তার জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো! আলোটি ঘরের মধ্যে এসে ঝুম্‌ঝুম্ কোরে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোণটিতে গিয়ে বসলো।

সোনার মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পুতু পলাইল, ফেলিয়া গেল তাহার সবুজ খাতা॥

৫

'আলোর ফুলকি'[১] কাব্য-গল্প। পাত্র-পাত্রী মোরগ-মুরগি, চড়ুই, টিয়া, পেঁচা ইত্যাদি বহু পাখী ও কুকুর ইত্যাদি দুই একটি জন্তু। আসলে পঞ্চতন্ত্রের মত এরা মানবের ভূমিকাই লইয়াছে পশুপক্ষীর সাজে। নায়ক কুঁকড়ো ও নায়িকা বনটিয়া

১ প্রথম প্রকাশ ভারতী বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পুস্তকাকারে ১৯৪৭।

সোনালিয়া যথাক্রমে সৌন্দর্য-দ্রষ্টার (এবং সৌন্দর্য-আবিষ্কর্তার) ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলা যাইতে পারে। অন্য কথায় কবি-চিত্রকরের ও তাঁহার চিরদিনের ভালোবাসার। বইটি আগাগোড়া যেন একটি নিটোল কাব্য—রঙে, রসে, ভাবে, ভাষায়। দুইটি নিদর্শন উদ্ধৃত করি।

হুতুম পেঁচার আঁধারের স্তুতি, যেন অথর্ববেদের মন্ত্র—

নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুতি রাত।
কেষ্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত।
বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত।
নিখুঁত রাত।
কালোর পরে একটি নিখুঁত তারার টিপ।
ভয়ঙ্করী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোব, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন।

নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে।
নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্টতারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত, সারা রাত।
নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত॥

স্বপনপাখীর সুর উঠিয়াছে নিশীথে বনের মধ্যে। সে সুর আকাশ ছাপাইয়া তারায় তারায় ঝঙ্কার তুলিল।

বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়াল সে সুর শুনে। গাছের তলায় আলোছায়া বিছানো, তারি উপর হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে, কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে, বনের পোকামাকড় পশুপাখি সবার মনের কথা এক ক'রে নিয়ে স্বপনপাখি বনের শিয়রে গাইছে, জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ ক'রে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্যন্ত সবই গান হয়ে এক তানে বাজছে যেন এই স্বপনপাখির মিষ্টি গলায়।

কুঁকড়ো অবাক হয়ে ব'লে উঠলেন, "এ যে জগৎজোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপনপাখি কার কানে তুমি কী কথা ব'লে যাচ্ছ কে তা জানে।"

অমনি কাঠবেরালি বললে, "আমি শুনছি 'ছুটি হল, খেলা করো'।"
খরগোস বললে, "আমি শুনছি 'শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে চলো'।"
বনবেরাল বললে, "শুনছি 'চাঁদের আলো এল'।"
মাটি বললে, "বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন।"
জোনাক বললে, "তারা আর তারা।"
কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা কী শুনছ আকাশের তারা।"
তারা সব উত্তর করল, "আমরা নয়নতারার নয়নতারা।"

[1] মূলে টানা গদ্যের মত ছাপা।

পাখীর সাজের ভিতর থেকে মানুষের পরিচিত রূপটুকু মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, চিনে-মুরগির চা-পার্টি প্রসঙ্গে,

> চিনিদিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির যত্ন ক'রে, আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাক্‌ট হয়ে এসেছেন।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশে লেখক ব্যাঙের সাজ পরাইয়া কাহাদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে।

> ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে, "কর্তা, ঘরে আছেন? কর্তা।" সোনালি "ও মাগো ব্যাং।" বলে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকল। ছ' ছ'টা কোলা ব্যাং এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্যাং এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বললে, "বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে…ওর নাম কী, অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে," আর একজন থপ্‌ করে বললে, "জলের মত সহজ গানের," অমনি তৃতীয় ব্যাং থপ থপ করে বললে, "যত সব ছোটো গানের," অমনি অন্যে বললে, "মজার গানের।"
>
> পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ থপ ছপ ছপ করে এগিয়ে এসে বললে, "সব বড়ো বড়ো গানের …সব পবিত্র গানের।"

৬

'বুড়ো আংলা'[১] হাঁস-সারস ইত্যাদির মানসযাত্রী সহচর একটি বুড়ো-আঙুলের আকার-প্রাপ্ত (Tom Thumb) বালকের উত্তর-প্রয়াণের রূপকথা। সুইডেনের লেখিকা সেল্‌মা লাগের্‌লফের একটি বই থেকে অবনীন্দ্রনাথ রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভূগোল এবং নাম অবলম্বন করিয়া কাহিনী আগাইয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান প্রসঙ্গের নাম হইতেই তাহা বোঝা যাইবে—"আমতলি", "চলন বিল", "টুং-সোন্নাটা-ঘুম", "যোগী-গোফা", "আসামী বুরুঞ্জি"॥

৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছুকাল অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের অনুরোধে সকালে বিকালে ষ্টীমারে বেড়াইতেন—বড়বাজার ঘাট হইতে বরাহনগর কুঠিঘাট বা বালিঘাট এবং সেখান থেকে বড়বাজার ঘাটে প্রত্যাবর্তন। ষ্টীমারে তাঁহাদের একটি বিচিত্র দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ ষ্টীমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পশ্চাৎপট করিয়া অবনীন্দ্রনাথ

[১] প্রথম প্রকাশ 'মৌচাক' পত্রিকায়, পুস্তাকাকারে ১৩৪১।

ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি অভিনব গল্প ও চিত্র লিখিয়াছিলেন। এই গল্প-চিত্রগুলি 'পথে-বিপথে' (১৯১৯, দ্বি-স ১৯৪৭) বইটির নদীনীরে অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ভাষায় বর্ণনায় এবং কাহিনীতে এই গল্প-চিত্রগুলি নূতন স্বাদ আনিয়া দিয়াছে। কয়েকটি যেন কবিশিল্পী-মানসের স্বপ্নাভিসার। অপরগুলিতে প্রতিদিনের বিবর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অভিনব দীপ্তির ও সজীবতার সঞ্চার হইয়াছে। নদীনীরের গল্পগুলিতে লেখক নিজেকে দ্বিধাভিন্ন করিয়াছেন—বক্তা এবং অবিন। অবিন বক্তারই বহির্নিক্ষিপ্ত মনোময় দ্বিতীয় স্বরূপ।

অতীন্দ্রিয় অতিলৌকিক, চলিত কথায় ভৌতিক, কাহিনীর চমৎকার নিদর্শন 'মোহিনী'। গল্পটির তুলনা চলে এম্. আর্. জেম্‌সের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গেই। 'গুরুজী'তে আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে আরব্য-উপন্যাসের ধারা বেমালুম মিলিয়া গিয়াছে। 'মাতু' গল্পে বাস্তব ও কল্পনা, চিত্র ও চরিত্র এক হইয়া গিয়া একটি গীতি-কবিতার নিটোল মাধুর্য পাইয়াছে।

গল্পগুলির ভাষায় লেখকের শিল্পদক্ষতার পরিচয় ও দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কোন কোন কথিকা ইতিমধ্যেই রচিত হইয়াছিল। সেগুলির এবং ঘরে-বাইরের প্রভাবও কিঞ্চিৎ আছে। সে প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের রচনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, নিজস্ব পরিণতির দিকে আগাইয়া দিয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে যেন চিত্র প্রদর্শনী বসিয়া গিয়াছে—এমনি অবনীন্দ্রনাথের উপমা উৎপ্রেক্ষা-কবিকল্পনার বিপুল রূপসম্ভার। কিছু উদাহরণ দিই।

> 'মাতু'-জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদেব জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম মীর-সাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীর বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠচে।[১]
>
> নদীর মাঝে ময়লা কুয়াশা গত শীতের ছেড়া-কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে।[২]
>
> ওপারে মুচিখোলার নবাবী নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে পা-ছড়িয়ে চড়ুই-ভাতির পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছি,—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-এক-বার যেমন ধূলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।[৩]

অবনীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি গল্প ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শাদাসিধা ছোট ও বড় গল্পও আছে।[৪] 'কোটরা'র মত কোন কোন

[১] 'মাতু'। [২] 'অরোরা'। [৩] 'পর্-ঈ-তাউস্'।

[৪] যেমন, 'কোট্‌রা' (আশ্বিন ১৩২৬) ও 'আলো-আঁধারে' (কার্তিক ১৩২৬)।

গল্পের বস্তু "বাস্তব ও আধুনিক", অর্থাৎ শ্রমজীবীর জীবনঘটিত। পিতামাতা পরিত্যক্ত শিশু নোটোর পালনভার লইবার সময় মাচারু থানার দারোগাকে এই যে আত্মপরিচয় দিয়াছিল তাহা হইতে গল্পটির রস খানিকটা পাওয়া যাইবে।

"হুজুর আমি নৌকোর মালিক, মাল্লা, কর্ত্তা। একদাঁড়ি কিস্তি, কাঠ চালান দিই। নৌকোর নাম—কোট্রা। এখান থেকে আসামের জঙ্গল পর্য্যন্ত দুপারের লোক কোট্রা আর মাচারু মাঝিকে চেনে।

"নাম মাচারু, মশয়! আমার বিয়ে হয়েছে; সে খুব চালাক মেয়েমানুষ, আমিই বরং তার কাছে বোকা বনে যাই। আর হুজুর যদি তাকে দেখতেন তবে বুঝতেন সে পাক্কা মেয়েমানুষ বটে।"

একেই আরক পেয়েছে, তার উপর দাঁও মাফিক সওদা শেষ করে আর এই ছেলেটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে বে-পরোয়া।

মেয়েমানুষটির যে কেমন পাক্কা তাহার পরিচয় পাই গল্পে তাহার প্রথম দর্শনেই। মাচারু যখন নোটোকে লইয়া নৌকায় আসিল তখন জুম্‌নী পেঁয়াজ-ফুলুরী ভাজিতেছিল।

আগুনের তাত আর ফুলুরীর গন্ধ পেয়ে নোটো বলে উঠলো—"বেশ গরম।" জুম্‌নী ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে নোটোকে দেখিয়ে মাচাৰুকে শুধোলে—"এ কে?" মাচারু খানিক ঢোক্ গিলে বল্লে—"তোমার জন্যে একটা নতুন সামিগ্রি এনেছি।" বলেই মাচারু একমুখ কাষ্ঠহাসি হাসলে, কিন্তু তার মন বলতে লাগলো নৌকোতে পা না দিলেই ভালো ছিল। ওদিকে জুম্‌নী হাতা-হাতে কটমট করে চেয়ে আছে।

৮

শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি ছোটখাট প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কখন এবং কেন যে তিনি শিল্প-প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে প্রাপ্তব্য।[১] কতকগুলি প্রবন্ধ 'ভারতশিল্প' নামে পুস্তিকাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে (১৯২২-২৭) যে প্রবন্ধগুলি অবনীন্দ্রনাথ রচনা ও পাঠ করিয়াছিলেন সেগুলি দীর্ঘকাল পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' নামে সঙ্কলিত হইয়াছে (১৯৪১)।[২] শিল্পচিন্তাঘটিত রচনার মধ্যে 'বাংলার ব্রত' (১৩২৬) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি আলোচনার জন্য যে 'বিচিত্রা' সভা করিয়াছিলেন তাহার তরফে অবনীন্দ্রনাথ দুই তিন বছর ধরিয়া মেয়েলি আলপনা-নকৃশা সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপ

[১] 'কি ও কেন', ভারতী ১৩১৫ পৃ ৩২৯-৩৩৫। [২] 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫) কয়েকটি প্রবন্ধের সংশোধিত সংস্করণ।

শতাধিক আলপনা-নক্‌শার ছবি লইয়া বাংলার-ব্রত বাহির হয়। নক্‌শাগুলির ভূমিকা হিসাবে তিনি শিল্পসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা এবং মেয়েলি লোকসাহিত্য-ব্রতকথা লইয়া বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়াছেন,

> শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বশে যাই করি তাইতো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা-জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা কি নৃত্যকলা দুয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধু আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্যে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজে সাজছি ঘর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুটিনাটি কাজে, এটা-ওটা জিনিষে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনায় তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রীড়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা।[১]

শেষজীবনে অবনীন্দ্রনাথ তিনখানি আত্মকাহিনী-ঘটিত বই রচনা করিয়াছেন। পারিবারিক স্মৃতিকথা লইয়া 'ঘরোয়া' (১৩৪৮) ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৫১) শ্রীমতী রাণী চন্দের সহযোগিতায় লেখা। বই দুইখানি অত্যন্ত উপাদেয়। 'আপন কথা' (১৩৫৩) শৈশবস্মৃতি অবলম্বনে বিরচিত। রচনার মনোহারিত্বে, কল্পনার কারিগরিতে এবং চিত্রের সুষমায় বইখানি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলে-বেলার পরেই স্থান পায়॥

৯

অবনীন্দ্রনাথের একজন প্রধান ছাত্র, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ভারতীতে শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার রচনারীতি সহজ সরল ও স্পষ্ট। অজণ্টা, বাগ ও রামগড়ের গুহাচিত্রগুলি ইনি এবং ইঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি আঁকিয়া লইয়াছিলেন কডরিংটন প্রণীত গ্রন্থের জন্য। তাহার ফলে ইঁহার 'অজন্তা' (১৯১৩) ও 'বাগগুহা ও রামগড়' (১৯২১) লেখা হয়। অসিতকুমার ছেলেদের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট বই লিখিয়াছেন—গল্প, নাটক, কবিতা।

১ পৃ ৫৬।

১০

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্বর্ষ জয়ন্তীর বছর হইতে ভারতীর পরিচালনায় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, চারুচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ লেখক ও শিল্পীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে, এবং তিনচারি বছরের মধ্যেই পত্রিকাটির ভার সম্পূর্ণভাবে ইঁহাদের হাতে আসে। "ভারতীর বৈঠক"এর এইভাবে শুরু হয়।[১] এই বৈঠকের নায়ক হইলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীর বৈঠক কখনো সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতে বা দলে পরিণত হয় নাই। এই বৈঠকে যাঁহারা সমবেত হইতেন তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্র-অনুরাগী। সুতরাং রবীন্দ্র-স্বীকৃতি ভারতীর বৈঠকের মূল সংঘসূত্র বা Article of Association বলিয়া ধরিতে পারি। অপর সংঘসূত্রগুলি খুব সুব্যক্ত না হইলেও সহজে বোঝা যায়। সেগুলি হইতেছে,—(১) সাহিত্যদৃষ্টিতে গতানুগতিকতার ঠুলি পরিত্যাগ, (২) রচনারীতিকে সরস ও সরল করা ও কথ্যভাষার কাছাকাছি আনা, (৩) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় স্থাপন করা, (৪) সমসাময়িক সমাজের গ্লানির—বিশেষ করিয়া পতিত নারীর প্রতি অবিচারের প্রতি গল্প-উপন্যাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, (৫) শিল্প-অনুরাগ এবং জীবনকর্মে শিল্পানুরাগের অভিব্যক্তি, এবং (৬) মোগল চিত্রকলার অনুশীলনের আনুষঙ্গিকরূপে ফারসী শব্দের প্রতি ঝোঁক।

ভারতীর বৈঠকে কাব্যের আসর জাঁকাইয়া তুলিয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আর গল্পের আসর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথও গদ্যরচনায় মণিলালের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাহার সাক্ষী তাঁহার অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস ডঙ্কানিশান॥

১১

ভারতীর আসরকে সাহিত্যিক আড্‌ডায় জাঁকাইয়া তুলিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)। ইনি অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সেই সূত্রে লেখক রূপে ইঁহার ভারতীতে আবির্ভাব (১৩১৫)। ভারতীর শেষের দিকে আট নয় বছর (১৩২২-২৯) মণিলাল প্রধান সম্পাদক এবং পরিচালক ছিলেন। প্রথমে ২০ নম্বর

[১] শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত 'মণিলালের আসর' (মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) দ্রষ্টব্য।

কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে এবং পরে ২২ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীটে ইঁহারই কান্তিক প্রেসে ভারতী ছাপা হইত এবং শেষের বাড়িরই তেতলায় ভারতীর আড্ডা বসিত। এই আসরে জমায়েৎ হইতেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী প্রভৃতি তদানীন্তন "নব্য" শিল্পী ও বিদগ্ধজন এবং সাহিত্যিকেরা। তখন আরও কয়েকটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল কলিকাতায়। (রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভাকে বাদ দিতে হইবে এই তালিকা হইতে, কেননা সেখানে সংঘবদ্ধ সাহিত্য ও শিল্পচিন্তার স্থান ছিল না।) তাহার মধ্যে যেটি বেশি পুরাতন সেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি শাসিত রবীন্দ্র-বিবাদী 'সাহিত্য' গোষ্ঠী তখন ভগ্নপ্রায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল (১৩২৭)। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র-নাথ রায় ছিলেন 'মানসী' গোষ্ঠীর নেতা। এখানে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্র-অনুরাগীর একাধিপত্য ছিল। জগদিন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। মানসী গোষ্ঠী তাই কখনো রবীন্দ্র-বিবাদী হয় নাই। তবে মানসীর সাহিত্যচিন্তা পুরাতন ধারাই অনুসরণ করিয়াছিল, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নূতনতর সাহিত্য-সৃষ্টিতে সর্বদা মানসী গোষ্ঠী খুব উৎসাহ বোধ করে নাই। প্রমথ চৌধুরী সবুজ-পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সঙ্কীর্ণ আসর জমাইলেন তাহাতে অল্প দুই-চারিটি তরুণ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ ঠাঁই পায় নাই। সবুজ-পত্রের বিরোধী রূপে অবতীর্ণ হইল চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিনচন্দ্র পাল সেবিত 'নারায়ণ'। নারায়ণ গোষ্ঠী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের তথৈব নূতন সাহিত্যের বিরোধিতা করিতে থাকে। তবে বেশি দিন নহে। নারায়ণের লেখকেরা তেমন জমাইতে পারিলেন না। দলও শীঘ্র ভাঙিয়া গেল। সে পরের কথা।

ভারতী গোষ্ঠীর অনুপ্রাণনা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভা হইতে। সাহিত্যে, শিল্পে, নাট্যাভিনয়ে এবং মানব-সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে ভারতী গোষ্ঠীর জাগ্রত কৌতূহল এই সূত্রেই লব্ধ। বিচিত্রা ও ভারতীর মধ্যে গুপ্ত অথচ প্রধান যোগাযোগকর্তা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অপ্রধান সংযোগ পাত্র ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার।

ইউরোপীয় (কন্টিনেন্টাল) উপন্যাস-কাহিনী—অবশ্য ইংরেজির অনুবাদ হইতে

—বাঙ্গালায় প্রকাশ করা ভারতী গোষ্ঠীর একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই কাজের ভার লইয়াছিলেন ভারতীর চারিজন প্রধান লেখক। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদ করিলেন 'ভাগ্যচক্র' ওলন্দাজ (ডচ্) হইতে, সৌরীন্দ্রমোহন লিখিলেন 'মাতৃ-ঋণ' ফরাসী হইতে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিলেন 'জন্ম-দুঃখী' নরউইজীয় হইতে, আর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিলেন 'আগুনের ফুলকি' জার্মান ভাষা হইতে।

গদ্যরচনায় মণিলালের স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল। এই নিপুণতায় তাঁহার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথের রচনারীতি এবং ভাবুকতা দুইই ইঁহার লেখায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে অভিজ্ঞতা কম এবং রোমান্টিক কল্পনার রঙ কিছু চড়া। ভারতী গোষ্ঠীর রচনাভঙ্গির আদর্শ মণিলালের লেখায় পাই। সুপরিচিত শব্দ, কথ্যভাষাশ্রিত সহজ বাক্যরীতি এবং পরিচ্ছন্নতা—মোটামুটি ইহাই ভারতী গোষ্ঠীর রচনারীতির প্রধান লক্ষণ। মণিলাল এই রীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সাহিত্যকর্মে হাত দিবার আগে মণিলাল মিডিয়াম, প্ল্যানচেট ইত্যাদি প্রেততাত্ত্বিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এবিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা লইয়াই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ভুতুড়ে কাণ্ড' (১৯০৮)। সাহিত্যের আসরে নামিয়া তিনি হাত দিলেন অনুবাদে—বেশির ভাগ গদ্য, অল্প কিছু পদ্য। ছেলেদের জন্য ইংরেজি হইতে যে কয়টি জাপানি গল্পের অনুবাদ করিলেন তাহা বাহির হইল 'জাপানি ফানুস' (১৯০৯) ও 'কল্পকথা' (১৯০৯) নামে। 'আলপনা'র (১৯১০) কয়েকটি গল্পের মূলও বিদেশী। মণিলালের অপর গল্পের বই হইতেছে 'ঝাঁপি' (১৯১২), 'মহুয়া', 'পাপ্‌ড়ি' ও 'জলছবি' (১৯১৯)। 'মনে মনে' (১৯১৯) বড় গল্প। ওলন্দাজ লেখক লুই কুপার্স্‌এর একটি উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ করেন মণিলাল 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১) নামে।[১]

মণিলাল শৌখীন লোক ছিলেন। সঙ্গীত ও নাট্যকলায় তাঁহার কৌতূহল গোড়া থেকেই ছিল। শেষে একটি অত্যন্ত লিরিক ধরণের নাটিকাও লিখিয়াছিলেন, 'মুক্তার মুক্তি' (১৩২৯)।[২] পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন বাঙ্গালা পাব্‌লিক্ স্টেজ ও অভিনয়ের

১ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৭।

২ কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে অভিনীত, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (১৯২৪) তখন মণিলাল নৃত্যচ্ছন্দের পরিকল্পনায় তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

মণিলালের গল্পের রস যতটা বাস্তব তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি রোমান্টিক। সেই কারণে গল্পগুলিতে কাব্যধর্ম অনেকটা পরিস্ফুট। 'তুরুপ', 'টাকার থলি', 'বিন্দু', 'তুই সন্ধ্যা' ইত্যাদি গল্পে মণিলালের দক্ষতার প্রকাশ। 'মুক্তি'[১] সবচেয়ে "বাস্তব" গল্প। বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরণের "বাস্তব" গল্প যাহা মণিলালের 'মুক্তি'তে শুরু হইল বলা যায় তাহা বাইশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গচ্ছলে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন ভারতীতেই এক প্রবন্ধে।[২]

> বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চূর্ণ খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি অধিক ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধও পঠিতব্য।[৩]

> কিছুদিন হইতে প্রত্যহ আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?
>
> হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পার কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটিফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রু-জল এখনো লাগিয়া আছে?

১২

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৪) দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীর পরিচালনায় সংস্পষ্ট ছিলেন। ভারতীর শেষ কয় বছর ইনি প্রথমে স্বর্ণকুমারীর সহকারিরূপে (১৩১৫-২২) পরে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ে সহযোগিরূপে (১৩২১-৩০) ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে বছরে ইনি বি-এ পাশ করেন সেই বছরে

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী, আশ্বিন ১৩২১। [২] 'নিস্ফল চেষ্টা' ভারতী আশ্বিন ১২৯৯।

[৩] 'সফলতার দৃষ্টান্ত'।

(১৯১৩) ইঁহার লেখা গল্প কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। সৌরীন্দ্রমোহনের আরও অনেক গল্প কুন্তলীন পুরস্কারের সম্মান লাভ করিয়াছিল। গল্পলেখক হিসাবে সৌরীন্দ্রমোহনকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য বলিতে পারা যায়। তবে গল্পের বিষয়ে তেমন বৈচিত্র্য নাই। ইঁহার অধিকাংশ গল্পের বিষয় হইতেছে অবিবাহিতের প্রেমপ্রত্যাশা কিংবা নববিবাহিতের লাজুক প্রেমপিপাসা। করুণ রস জমাইবার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। (এটা অবশ্য তখনকার দিনের কোন কোন গল্পলেখকের বিশেষ কায়দা ছিল।) সৌরীন্দ্রমোহনের কয়েকটি গল্প বাঙ্গালা ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনারীতি শাদাসিধা ও সরস, ফেনাইবার প্রবল চেষ্টা নাই, বুদ্ধিবিত্তা-প্রকাশের আগ্রহও নাই। কোন কোন গল্পের প্লট্ বিদেশী মূল হইতে নেওয়া। সৌরীন্দ্রমোহনের ছোটগল্পের বই এইগুলি,—'শেফালি' (১৯০৯, দ্বি-স ১৯১৩), 'নির্ঝর' (১৯১১), 'পুষ্পক' (১৯১৩), 'মৃণাল' (১৯২২), 'তরুণী', 'যৌবরাজ্য', 'পিয়াসী' ইত্যাদি। 'পরদেশী' (১৯১০) বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

গল্প লিখিতে আরম্ভ করিবার অল্প কিছুকাল পরেই সৌরীন্দ্রমোহন ব্যঙ্গ ও কৌতুক নাট্য রচনায় মন দিয়াছিলেন। এগুলির কাহিনী স্বরচিত নয়, বিদেশী নাট্য অথবা দেশী গল্প অবলম্বনে লেখা। নাট্যরচনাগুলিতে যেসব গান আছে সেগুলি স্বরচিত। সংলাপও উজ্জ্বল। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এগুলির অভিনয় ব্যর্থ হয় নাই। 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৯০৮) মোলিয়েরের নাটক অবলম্বনের লেখা; 'দরিয়া'র (১৯১২) মহাজন গোল্ডস্‌মিথ; 'গ্রহের ফের' (১৯১১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান্ জামাতা' গল্প অবলম্বনে লেখা; 'মৃত্যু-মোচন' ও 'রূপসী' যথাক্রমে টলস্টয় ও মেটারলিঙ্কের নাটক-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। অন্যান্য প্রহসন— 'দশচক্র' (১৯১০), 'রুমেলা' (১৯১৪), 'হাতের পাঁচ' (১৯১৫), 'শেষবেশ' (১৯১৮) ও 'পঞ্চশর' (১৯২০), 'লাখ টাকা' (১৯২৬) ও 'হারানো রতন' (১৯২৯)। 'স্বয়ংবরা' (১৯৩১) নাটক সাবিত্রী-কাহিনী লইয়া লেখা।

সৌরীন্দ্রমোহন বহু বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই অনুবাদ, আক্ষরিক অথবা ভাবাশ্রিত। যেমন, 'বন্দী' (১৯১১; হিউগো), 'মাতৃঋণ'[১] (দোদে), 'নবাব' (ঐ), 'অবন্ধনা' ও 'নতুন আলো' (গর্কি),

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮।

'অসাধারণ' (তুর্গেনিভ), 'জনৈকা' (মোপাসাঁ) ইত্যাদি। কতকগুলি অনুবাদ-গল্প কিশোরপাঠ্য। ইঁহার মৌলিক উপন্যাসের মধ্যেও ক্বচিৎ বিদেশী ছায়া অলক্ষ্য নয়। মৌলিক উপন্যাসের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'কাজরী'[১], 'আঁখি'[২], 'বাবলা'[৩] ইত্যাদি। সৌরীন্দ্রমোহনের উপন্যাসের ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন এবং ভাবাতিশয্যবর্জিত। কোন কোনটি কথ্যভাষায় লেখা।

ভারতীর প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের রচনার আলোচনা করা হইল। ভাগলপুরের প্রসঙ্গে এই আলোচনা স্মর্তব্য ॥

১৩

প্রবাসী পত্রিকার আরম্ভ হইতেই (১৩১০) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) সম্পাদনা কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ভারতী গোষ্ঠীর সহিত চারুচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং ভারতীতে তাঁহার রচনা বাহির হইত।[৪] অল্প কিছুদিন প্রবন্ধ (সংকলন) ও কবিতা লেখার পর চারুচন্দ্র ছোটগল্প লিখিতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষীণ বস্তুর উপর করুণ ভাবাবেগের রঙ ফলাইয়া চারুচন্দ্রের প্রথম ছোটগল্প ও চিত্রগুলি রচিত। সৌরীন্দ্রমোহন যেমন স্পষ্টত প্রভাতকুমারকে অনুসরণ করিয়াছিলেন চারুচন্দ্র তেমনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মণিলালের রচনারীতির প্রভাব চারুচন্দ্রের রচনায় বেশি করিয়া পড়িয়াছে। তাহার ফল ভালো হয় নাই। ভাষার চটকে ও ভাবালসতার টানে কয়েকটি ভালো গল্পের প্লট উতরাইতে পারে নাই। আসলে চারুচন্দ্রের রচনাকৌশলের পরিচয় 'চটির পাটি'র মত গল্পচিত্রগুলিতেই বিশেষভাবে প্রকটিত।

চারুচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা কম নয়। সেগুলি সংকলিত আছে প্রধানত এই বইয়ে,—'বরণডালা' (১৯১০), 'পুষ্পপাত্র' (ঐ), 'সওগাত' (১৯১১), 'ধূপছায়া' (১৯১২), 'চাঁদমালা' (১৯১৫), 'মণিমঞ্জীর' (১৯১৭), 'কনকচুর' (১৯১৮), 'পঞ্চদশী' (১৯২৭), 'বনজ্যোৎস্না' (১৯৩৮), 'শমীশাখা' (ঐ), 'দেউলিয়ার

[১] ঐ ১৩২৬। [২] ঐ ১৩২৮-২৯। [৩] ঐ ১৩৩০-৩১।

[৪] ১৩০৩ সালের ভারতীতে তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ১৩১৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় মার্ক টোয়েনের একটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ("রূপার কাটির জয়")। ঐ সালের চৈত্রসংখ্যা মানসীতে 'হতাশ' গল্প বাহির হইয়াছিল।

জমাখরচ' (১৯৩৯)। 'বজ্রাহত বনস্পতি'তে (১৯৩৫) পুষ্পপাত্র, সওগাত ও চাঁদমালার গল্পগুলি সংকলিত। ধূপছায়ার গল্পগুলির সঙ্গে একটি নূতন গল্প যোগ করিয়া 'যাত্রাসহচরী' (১৯৩৭) সংকলিত।

প্রথম উপন্যাস—আসলে বড় গল্প—'আগুনের ফুলকি' (১৩২১)[১] জার্মান লেখক হাউফের গল্পের রূপান্তর। 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী' (১৩৩০), 'চোরকাঁটা' (১৩২৬), 'সর্বনাশের নেশা' (১৯২৩), 'জোড়বিজোড়' (১৯২৪), 'নোঙর ছেঁড়া নৌকা' (১৯২৪), 'অদর্শনা' (১৯২৫) 'সদানন্দের বৈরাগ্য' (১৯৩৫), 'বায়ু বহে পূববৈয়াঁ' (১৯৩৫), 'ব্যবধান' (১৯৩৬),—এই কয়টি উপন্যাসের বস্তুও বিদেশী।

চারুচন্দ্রের প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'স্রোতের ফুল'এর (১৩২২ , দ্বি-স ১৩২৬, তৃ-স ১৩৪৫)[২] কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া বলিয়া মনে করি। এই কাহিনী-সূত্র লইয়াই রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে 'চতুরঙ্গ' (প্রথম প্রকাশ সবুজ-পত্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১) রচনা করিয়াছিলেন। স্রোতের-ফুলের বিপিন চতুরঙ্গের শ্রীবিলাস ও শচীশ একাধারে, নবকিশোরের প্রতিবিম্বও খানিকটা শচীশের উপর পড়িয়াছে। চারুচন্দ্রের স্মৃতিরত্ন, হরিবিহারী, কালীতারা, প্রেমানন্দ ও মালতী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের জ্যাঠামশায়, হরিমোহন, হরিমতী, লীলানন্দ ও দামিনী। চারুচন্দ্রের ভূমিকাগুলির পরিকল্পনা স্বভাবসঙ্গত নয়, হয় রঙচড়া নয় রঙচটা। প্রেমানন্দের চরিত্র একেবারে ব্যর্থ। বিপিন দুর্বল ও ছিঁচকাদুনে-গোছের। যৌন আবেদনের উপর ঝোঁক বেশি পড়িয়াছে। এদিক দিয়া বইটিকে আধুনিকত্বের দিকে অগ্রসর বলা যায়। উপসংহার অসমঞ্জস ও গতানুগতিক। চোখের-বালির ছায়াপাত ইহাতে দুর্লক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় মৌলিক উপন্যাস 'পরগাছা' (১৯১৭, দ্বি-স ১৯২০)[৩] চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং ভারতী গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সহজ সরল বাহুল্যবর্জিত বাস্তব কাহিনীটি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। ভূমিকা-রচনায় ও আখ্যান-উদ্ভাবনায় কল্পনা খাটাইবার প্রয়োজন হয় নাই। তাই এই বইটিতে চারুচন্দ্রের সাধারণ রচনা-দৌর্বল্য তেমন প্রকটিত নয়।

যে-কোন কারণে হউক লেখক আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে পরগাছার কাহিনী সাধারণ পাঠকে সত্যঘটনা-নির্ভর বলিয়া মনে করিতে পারে। তাই প্রবাসীতে

[১] প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২০। [২] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩২১-২২।
[৩] প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২৩।

বইটির যখন শেষ দুই কিস্তি (ফাল্গুন-চৈত্র) বাহির হয় তখন এই মন্তব্যটি গোড়ায় দেওয়া হইয়াছিল,

> পরগাছা উপন্যাস ; উপন্যাস কল্পনার ফল ; কাল্পনিক ব্যাপার হইলেও উপন্যাসে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে ; তাহা মিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তিবিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন ; মিলের সঙ্গে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্টি।

পরগাছার পরে বাহির হইল 'দুই তার' (১৯১৮)।[১] কাহিনী-সূত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন,

> এই বইএর প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার আভাষ পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মুখে মুখে আমায় বলিয়াছিলেন ; সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যের ঘটনাগুলি গাঁথিয়াছি।

গল্পটি ভালো। ঘরে-বাহিরের অনুরূপ পলিটিক্যাল পরিবেশ। নায়ক-নায়িকা কতকটা মানভঞ্জনের শশিভূষণ-গিরিবালার ছাঁচে ঢালা। নায়কের উপর চতুরঙ্গের শচীশের প্রভাব আছে। প্রতিনায়ক হংসেশ্বর ভালোমন্দে মিশানো সাধারণ মানুষ, কিন্তু চরিত্রটির অঙ্কনে ভালোমন্দের মশলা ঠিক মিশ খায় নাই। চারুচন্দ্রের রচনা-রীতির বিশেষ দোষ অতিভাষণ এই বইটিতে খুব স্পষ্ট নয়।

'হেরফের'এর (১৯১৮, দ্বি-স ১৯২০) প্লটও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। লেখকের মন্তব্য,

> এই গল্পের প্লটের মুল ধারাটি পরমপূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহের দান।

'পঙ্কতিলক' (১৯১৯) চারুচন্দ্রের যাহাকে বলে কুখ্যাত উপন্যাস। কাহিনীর পরিকল্পনায় যৌন আবেদনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়া লেখক যে অভিনব দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লেখক-যশ খানিকটা আহত হইয়াছিল। প্লটে সাহসের পরিচয় আছে, কিন্তু কাহিনী সুসংবদ্ধ নয় এবং ঘটনায় প্রাসঙ্গিকতার এবং চরিত্র-অঙ্কনে সম্ভাব্যতার অভাব আছে। নায়িকা আভাকে বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে বলিয়া মনে করা দুরূহ। অধিকাংশ চরিত্র হয় অবাস্তব নয় ক্যারিকেচার।

'দোটানা'র (১৯২০) কাহিনীও কতকটা পঙ্কতিলকের মত। কিন্তু এখানেও

১ প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২৪।

ঘটনা-পরিকল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণে বিজাতীয়ত্বের ছাপ আছে। রচনারীতিতে কাব্যের ঢঙ প্রকট। দোটানার কাহিনীও কি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া ?

চারুচন্দ্রের অপর উপন্যাস—'আলোকলতা' (১৯২০), 'বিয়ের ফুল' (১৯২০), 'মুক্তিস্নান' (১৯২১), 'পারণ' (১৯২৩), 'নষ্টচন্দ্র' (১৯২৪), 'রূপের ফাঁদ' (১৯২৫), 'মন না মতি' (১৯২৬), 'হাইফেন' (১৯২৬), 'যা নয় তাই' (১৯২৭), 'ধোঁকার টাটি' (১৯২৯), 'পথভোলা পথিক' (১৯৩৩), 'সুরবাঁধা' (১৯৩৭) ও 'অগ্নিহোত্রী' (১৯৩৮)।

চারুচন্দ্র একটি নাটিকাও লিখিয়াছিলেন—'জয়শ্রী' (১৯২৬)।

বন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত চারুচন্দ্রও জ্ঞানান্বেষণে, বিশেষ করিয়া ভাষাঘটিত ও ইতিহাসবিষয়ক অনুসন্ধানে, গোড়া থেকে কৌতূহলী ছিলেন। এ বিষয়ে ইঁহার সংকলন-প্রচেষ্টার পরিচয় প্রধানত ভারতী ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধে এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বোধিনীতে (১৯২৫, ১৯২৮) আর রবীন্দ্র-কবিতার ভাষ্য দুইখণ্ড 'রবিরশ্মি'তে (১৯৩৮) মিলিবে।

ছেলেদের জন্য চারুচন্দ্র যে কয়খানি বই লিখিয়াছিলেন অথবা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, 'কাদম্বরী' (১৯০৯), 'পারস্য উপন্যাস' (১৯১০), 'বিষ্ণুপুরাণ' (১৯১০) এবং 'রবিন্‌সন ক্রুসো' (১৯১০)॥

১৪

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় (জন্ম ১৮৮৮) ভারতীয় পরিচালনায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ডান হাতের মত ছিলেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার প্রবন্ধ এবং কবিতাও লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি সাধারণত তথ্যপূর্ণ সংকলনের মত। কবিতার বই একটিমাত্র—'যৌবনের গান' (১৯২৪)। ইহাতে আটষট্টিটি কবিতা সংকলিত আছে। হেমেন্দ্রকুমারের কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কয়েকটি কবিতায় নিজস্বতায় পরিচয় আছে। হেমেন্দ্রকুমারের 'কাপালিকের উদ্বোধন'এ মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' পূর্বাভাসিত। কবিতাটির প্রথম স্তবক এই,

> কালাপাহাড় !···ঘুমিয়ে নাকি ?···পাশ ফেরো ভাই
> চোখ খোলো,
> স্যাঁৎ-চাপা ঐ আংরাটাতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো !

পথ-বিপথে তাল-বেতালে ঝড়-ঝাপটের শাঁখ বাজাও,
লক্ষযুগের অন্ধকারে রক্ত-শিখার দীপ সাজাও !
মন-বুড়োদের পাঁজরা ছিঁড়ে খেলতে থাকো ডাং-গুলি
বেরিয়ে পড় ধ্বংস-নদে বান-ক্ষ্যাপানো তান তুলি !
বেরিয়ে পড় বেপরোয়া !
পথের তুমি—নও ঘরোয়া !
চণ্ড মরুর উষ্ণ তৃষায় শান্তি-স্বপন আজ ভোলো,
মৃত্যু-সখা, চোখ খোলো ।

যৌবনের-গানের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'পূর্ণিমার সাধ'। প্রথম স্তবকটি এই,

তমাল বনে চাঁদ উঠেচে, ধানের ক্ষেতে আলো,
কে পরেচে গলায় মালা, কে বেসেচে ভালো।
মনের কথা মূর্ত্তি ধ'রে
বেরিয়েচে আজ বিশ্ব ভ'রে,
চাঁদের আলোর শিখাতে আজ মনের পিদিম জ্বালো।

হেমেন্দ্রকুমার ওমর খয়্যামের কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন ইংরেজী হইতে।

গদ্যে হেমেন্দ্রকুমার মণিলালের অনুসারী। এবং সেইহেতু ভাবালুতার আতিশয্য স্থানে স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট। হেমেন্দ্রকুমার প্রধানত গল্পই লিখিয়াছেন। ইঁহার উপন্যাস প্রায়ই বড়গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

ইঁহার গল্পের বই হইতেছে,—'পসরা' (১৩২২), 'মধুপর্ক' (১৩২৪), 'সিঁদুর চুপড়ী' (১৩২৮), 'মালা-চন্দন' (১৩২৯), 'পদ্মকাঁটা' (১৩৩৯), 'বেনোজল' (১৩৩১), 'শূন্যতার প্রেম' (১৩৩৯) ইত্যাদি। বড় গল্প বা উপন্যাস,—'জলের আল্‌পনা' (১৩২৬)[১], 'কাল-বৈশাখী' (১৩২৭ ?), 'পায়ের ধূলো' (১৩২৮), 'ঝড়ের যাত্রী' (১৩৩০), 'পদ্মকাঁটা' ইত্যাদি। 'রসকলি' (১৩২৯) সরস উপন্যাস ; 'সুচরিতা' (১৩২৮) এবং 'ভোরের পূরবী' (১৩২৮) অনুবাদাত্মক। হেমেন্দ্রকুমার 'আলেয়ার-আলো' (১৩২৫), চারুচন্দ্রের 'আলোকলতা' (১৩২৭) আর নিরুপমা দেবীর 'বন্ধু' (১৩২৮) প্রায় একই বিষয় লইয়া লেখা। কাল-বৈশাখীর প্লটে রোমাঞ্চক উপন্যাসের বীজ আছে। নায়ক বিনোদ বিলাতি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের পাষণ্ডের মত। পায়ের-ধূলোর কাহিনী বাস্তব ঘটনামূলক। সমাজ-পরিত্যক্ত নারীর সদ্‌গতির প্রচেষ্টা গল্পটিকে প্রচারলক্ষ্য করিয়াছে। ঝড়ের-যাত্রীতে এ প্রচেষ্টা প্রকটতর।

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩২৬।

মণিলালের মত হেমেন্দ্রকুমারেরও নাট্যশিল্পে অনুরাগ ছিল। মণিলালের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নাচঘর' বাহির হইয়াছিল (১৯২৫) তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত 'সীতা' নাটকের কয়েকটি জনমনোহর গান ইঁহারই রচনা। হেমেন্দ্রকুমার যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন (১৯৩১)। এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে তিনি একটি প্রহসন লিখিয়াছিলেন—'প্রেমের প্রেমারা' (১৯২০)। ইহা মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

অধুনা ছেলেদের রোমাঞ্চক গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসাবেই হেমেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা। যতদূর জানি, পাঁচকড়ি দের শিষ্যরূপেই হেমেন্দ্রবাবুর হাতেখড়ি বাঙ্গালা সাহিত্যে। হেমেন্দ্রবাবুর একটি রোমাঞ্চক গল্প ১৯০৯ সালে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল সংকলিত 'উপন্যাস-সংগ্রহ'এ বাহির হইয়াছিল। কয়েকটি ভালো ভূতের গল্পও ইনি লিখিয়াছেন।

হেমেন্দ্রবাবু বহু মাসিক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং প্রায় সব পত্রিকাতেই তাঁহার গল্প, কবিতা অথবা সংকলন প্রবন্ধ বাহির হইত। সংকলন প্রবন্ধগুলি সাধারণত "প্রসাদ রায়" এই ছদ্মনামে বাহির হইত।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রসঙ্গে আর দুইজন লেখকের নাম আসিয়া পড়ে,—হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫) এবং শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (জন্ম ১৮৯০)। হেমেন্দ্রলাল গদ্য-পদ্য দুই-ই লিখিতেন। 'ফুলের ব্যথা' (১৩২৯) কবিতার বই। প্রমথ চৌধুরী বইটির কবিতাগুলি বাছাই করিয়া দিয়াছিলেন। 'মণিদীপা'য় (১৯৩২) কতকগুলি অন্য ভারতীয় ভাষায় লেখা কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। 'মায়ামৃগ' (১৩৩২) গল্পের বই। 'ঝড়ের দোলা' (১৩৩২), 'মণিদীপা' (১৯৩২) ও 'মায়া-কাজল' (১৩৩৭) উপন্যাস বা বড় গল্প। প্রথম বইটিতে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের প্রভাব আছে। সংস্কার-প্রচেষ্টার চিহ্নও সুস্পষ্ট।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচনাগুলি সাধারণত ছোট অথবা বড় গল্প। কাহিনী প্রায়ই অভিজ্ঞতাশ্রিত, বাস্তব অথবা বাস্তবকল্প। রচনারীতি বিশেষভাবে কথ্যভাষাশ্রিত এবং ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক। রচনাবলী—'বাজীকর' (১৯২২), 'ঝড়ের পাখী' (১৩৩০), 'দুই-রাত্রি' (১৩৩৪), 'অরুণা', 'অচলপথের যাত্রী' (১৩৩০), 'চাষার মেয়ে' (১৩৩১) ইত্যাদি। দুই-রাত্রির রচনায় শরৎচন্দ্রের

'আঁধারে-আলো' গল্পের ছায়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বে ইহার জীবনস্মৃতিমূলক 'মহাস্থবিরজাতক' তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে (১৯৪৪)। ইহাতে লেখকের জীবন ও রস-দৃষ্টির পরিচয় আছে। কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের উপাদানও ইহাতে আছে।

প্রেমাঙ্কুর বাবু নাচঘরের প্রথম বছরে সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ॥

১৫

মেয়েলি ছেলে-ভুলানো গল্পকে তাহার নিজস্ব রস বজায় রাখিয়া অর্থাৎ মুখের ভাষায় কাব্যের রস ঢালিয়া দিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)। (ইহার বহুকাল পূর্বে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন লালবিহারী দে। কিন্তু তিনি গল্পগুলিকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।) রূপকথা-ব্রতকথা সংগ্রহ কাজে প্রথম উদ্যোগ দেখা দিয়াছিল সাধনায়, তাহার পর ভারতীতে। ১৩০২ সালের ভারতীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি ব্রতকথা-কাহিনী লিখিয়াছিলেন। পরেও অনেকে লিখিয়াছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের লেখাও প্রথমে ভারতীতেই বাহির হইয়াছিল (১৩১৫)। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা লইয়া ইহার 'ঠাকুমার ঝুলি' এই বছরেই বাহির হয় (১৯০৭)। তাহার পর 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯১০), 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩) ইত্যাদি। বইগুলিতে লেখকের আঁকা অনেক ছবি আছে। 'চারু ও হারু' (১৯১২) ছেলেদের উপন্যাস। দক্ষিণারঞ্জন কবিতাও লিখিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের গদ্যে ভারতী গোষ্ঠীর ছাপ আছে।

ভারতবর্ষের হাফটোন-ব্লক শিল্পের প্রবর্তক, চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'টুনটুনির বই' (১৯১০) ছেলেভুলানো গল্পের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। গল্পগুলি যেন মুখ হইতে টাটকা টাটকা সঙ্কলিত। লাইন-চিত্রগুলি গল্পের আকর্ষণীয়তা বাড়াইয়া দিয়াছে। উপেন্দ্রকিশোরের সন্তানেরাও ছোটদের রচনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। শ্রীমতী সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' (১৯১৩) এবং 'আরো গল্প' দুইটিতে যেন টুনটুনির-বইয়ের অনুবৃত্তি।

উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭-১৯২৩) ভারতীর বৈঠকের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৩২৮ সালে ইনি ছেলেদের জন্য

'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা বার করেন। চিত্রশিল্পে, ফোটোগ্রাফিতে এবং ছোটদের জন্য গদ্য-পদ্য রচনায় ইহার অত্যন্ত নিপুণতা ছিল। ইহার 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩), ইত্যাদির ছড়া উপভোগ্য। "নার্সারি রাইম"-জাতীয় হইলেও এগুলির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু রসও আছে। যেমন,

রামগরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না না, না না।"
সবাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।...
হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগলো বাধা
বুঝছে না কি তারা?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।[১]

১৬

পুরাতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) আনাগোনা ছিল ভারতীর বৈঠকে। ইতিহাসের খুঁট আখরিয়া হইয়াও রাখালদাস সাহিত্য-স্রষ্টার কল্পনাশক্তি হইতে বঞ্চিত হন নাই। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় রাজপুত ইতিহাসের যে মনোরম চিত্রধারা দেখা গেল তাহারই যেন প্রতিলোম অনুবৃত্তি চলিল রাখালদাসের রোমান্টিক-ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও বড় গল্পে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বন্যাধারা নামিয়াছিল তাহার সহিত রাখালদাসের রচনার প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গেও নাই। বরং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রচনার সঙ্গে আছে, যদিও অক্ষয়কুমার গল্প-উপন্যাস লিখেন নাই। রাখালদাস নিজে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ও প্রাচীন ইতিহাসে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্বে ও প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার একটু বিশেষ বোধ (যাহাকে ইংরেজীতে বলে flair) ছিল। মোহেন্‌জো-দড়ো ও হড়প্পার আবিষ্কার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গুপ্ত ও পাল রাজাদের সময়ের ইতিহাসের অনেক জট ছাড়ানো সম্ভব হইয়াছিল

১ 'রামগরুড়ের ছানা', আবোল-তাবোলে সংকলিত।

রাখালদাসের গবেষণায়। অন্বীক্ষায় এবং কল্পনায় রাখালদাস আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাসকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই উপলব্ধির উষ্ণতা তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও চিত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার রচনার স্থায়ী মূল্য। অন্যথা এগুলিতে বঙ্কিমী পদ্ধতির অনুশীলন মাত্র। রাখালদাসের উপন্যাস এবং রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' (১৯১৭)[১] বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসে দিক্‌পরিবর্তন-প্রচেষ্টা সূচিত করে।

'পক্ষান্তর' (১৯২৪), 'ব্যতিক্রম' (১৯২৪) ও 'অনুক্রম' (১৯৩১) এই তিনটি সাধারণ উপন্যাস ছাড়া রাখালদাস দুইখানি ঐতিহাসিক চিত্র ও সাত-খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক চিত্র দুইটিই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এবং একটি ('হেমকণা'[২]) অসমাপ্ত। 'পাষাণের কথা'য়[৩] শক-কুষাণ যুগে উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আছে। উপন্যাস সাতটির মধ্যে তিনটি শেষ-গুপ্ত আমলের। 'শশাঙ্ক' (১৯১৪)[৪] গুপ্তযুগের শেষ অবস্থার ছবি। 'করুণা'য় (১৯১৭) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত চিত্রিত। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এবং অন্যতম শেষ রচনা 'ধ্রুবা'য়[৫] গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদয়ের দিনের কাহিনী। পাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গৌরবের দিনের আলেখ্য পাই 'ধর্মপাল' (১৯১৫)[৬] উপন্যাসে। শাহজাহানের আমলে বাঙ্গালায় পোর্তুগীস অত্যাচারকালের ছবি আঁকা হইয়াছে 'ময়ূখ'এ (১৯১৬)। (ধর্মপাল ও ময়ূখ রাখালদাসের সবচেয়ে ছোট উপন্যাস।) বাদশা ফরুখশিয়রের আমলে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা চিত্রণ উদ্দেশ্যে 'অসীম' (১৯২৪)[৭] লেখা। এটি রাখালদাসের বৃহত্তম উপন্যাস এবং ইহাতে ইতিহাসের মালমশলা সবচেয়ে কম ব্যবহৃত। 'লুৎফুল্লা' (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)[৮] রাখালদাসের শেষ উপন্যাস। ইহাতে নাদির শাহের দিল্লী অধিকারের সময়কার ছবি আঁকা হইয়াছে। রচনাকালের সমসাময়িক পোলিটিক্যাল চিন্তাধারার ছাপ পাই নাদির শাহের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবন্ধের প্রচেষ্টায়।

[১] প্রথম প্রকাশ নারায়ণে। [২] প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) প্রকাশিত।
[৩] আর্য্যাবর্ত্তে (১৩১৮) প্রকাশিত। [৪] প্রথম প্রকাশ মানসীতে (১৩১৮-১৯)।
[৫] প্রকাশ প্রবাসী, কার্তিক হইতে চৈত্র ১৩৩৮। [৬] প্রথম প্রকাশ প্রবাসী ১৩২২।
[৭] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ। [৮] প্রকাশ মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬।

উপন্যাস ছাড়া বাঙ্গালায় রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে দুইখণ্ড 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৩২১, ১৩২৪)। বইটির মূল্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদেশী ঐতিহাসিকের মতে এই বইখানি পড়িবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বাঙ্গালা শেখা আবশ্যক।

রাখালদাসের পত্নী কাঞ্চনমালা দেবীও (১৮৯১-১৯৩১) সুলেখিকা ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। সেগুলির অধিকাংশ মানসী ও সাহিত্য পত্রিকায় বাহির হইয়া পরে পুস্তকাকারে সংকলিত হইয়াছিল—'গুচ্ছ' (১৯১৪), 'স্তবক' (১৯১৫), 'রসির ডায়ারী' (১৯১৮) ও 'শনির দশা' (১৯১৯)॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভাগলপুরের দল

১

বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিকই বলিতে হইবে। ১৩১৯-২০ সালে যমুনা ও সাহিত্য পত্রিকায় আট নয়টি গল্প বাহির হওয়ায় সাধারণ পাঠক হঠাৎ এক নূতন ও মনোহর গল্প-লেখকের সন্ধান পাইয়া বিস্মিত ও সচকিত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ সালের শেষ হইতে তাঁহার অনবচ্ছিন্নভাবে গল্প এবং উপন্যাস প্রধানত ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া সাধারণ পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চ কোটিতে তুলিয়া ধরিল। ১৯১২ সালের পূর্বে শরৎচন্দ্রের দুইটি মাত্র গল্প ছাপা হইয়াছিল। গল্প দুইটি চারি পাঁচ বছর ব্যবধানে বাহির হইয়াছিল এবং লেখক প্রায় অজ্ঞাতনামা ছিলেন, তাই সেগুলির রচয়িতার সম্বন্ধে কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। প্রথম গল্প 'মন্দির' বেনামিতে[১] ১৩০৯ সালের কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯০৩)। দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩১৪ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে।[২] তাহার পর একেবারে ১৩১৯ সালে যমুনার কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় 'বোঝা', সাহিত্যের মাঘ সংখ্যায় 'বাল্যস্মৃতি', ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'কাশীনাথ', ১৩২০ সালে যমুনায় 'চন্দ্রনাথ' (বৈশাখ হইতে আশ্বিন), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ), 'আলো ও ছায়া' (আষাঢ় ও ভাদ্র), 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ), 'চরিত্রহীন' (আংশিক ভাবে, কার্তিক হইতে চৈত্র) ও 'পরিণীতা' (ফাল্গুন), ভারতবর্ষে 'বিরাজ বৌ' (পৌষ ও মাঘ) ও সাহিত্যে 'অনুপমার প্রেম' (চৈত্র); ১৩২১ সালে সাহিত্যে 'হরিচরণ' (আষাঢ়) ও ভারতবর্ষে 'পণ্ডিত মশাই' (বৈশাখ ও শ্রাবণ)। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের নাম ও যশ বাড়িয়া গিয়াছে॥

২

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই গল্প, আকারে না হোক প্রকারে। কিন্তু যেগুলি আকারে ছোট সেগুলির অধিকাংশে মধ্যেই ছোটগল্পের সম্পূর্ণ লক্ষণ লভ্য নয়।

[১] শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে।

[২] প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম ছাপা হয় নাই।

প্লট সঙ্কীর্ণ ও সংহত নয়, ভাবালুতায় রস ফিঁকা হইয়াছে, এবং প্রত্যাশিত আনন্দময় পরিণতির খাতিরে উপসংহার ক্লাইমাক্স-বর্জিত। তবে লেখকের আন্তরিকতা অসন্দিগ্ধ এবং ভাষার অনায়াস-মনোহারিতা প্রবল। এ আন্তরিকতা ও মনোহারিতা তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও অল্পবিস্তর আছে।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শরৎচন্দ্রের গল্পে সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে। এবং এ প্রভাব বাড়িয়াছে ১৩২০ সাল হইতে। ভাষার অনুকরণ মাঝে মাঝে তো আছেই, প্লটের অনুকরণও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান', 'অনধিকার প্রবেশ' প্রভৃতি গল্পের নারী-ভূমিকার ছায়া শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পেই স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' গল্পের[১] কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মামা ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের ছাঁচে ঢালা। স্ত্রীর-পত্র গল্পটি 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) রচনায় যে প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর (১৯১৬) আদর্শ যোগাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা'। শরৎচন্দ্রের 'স্বামী'[২] ঘরে-বাইরে অনুসরণে পরিকল্পিত।

১৯১৩ সালের আগেকার গল্প-রচনায় মাঝে মাঝে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জলধর সেনের প্রভাব অনুভূত হয়। 'অনুপমার প্রেম' গল্পের আরম্ভ প্রভাতকুমারের ধরণে এবং উপসংহার রবীন্দ্রনাথের। 'চন্দ্রনাথ'এর কাহিনী পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' ও প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী' গল্পের এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' নাটকের[৩] অভ্রান্ত প্রভাব আছে। কোন কোন ভূমিকায় জলধরের 'বিশুদাদা'র এবং রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র কথা মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াই শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে লেখা শুরু করিয়াছিলেন। সে প্রভাব কার্যকর ছিল ১৩০৮ সাল অবধি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী শরৎচন্দ্রকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল তাহা তিনি একদা একটি ভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন, "উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়।" শুধু উপন্যাস নয় বঙ্কিমের অন্য রচনাও তাঁহাকে কম প্রভাবিত করে নাই। গল্প

১ প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩২১। ২ প্রথম প্রকাশ নারায়ণ, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২৪।
৩ সরযূ, দয়াল, বিশ্বেশ্বর—এই নামগুলি চন্দ্রনাথে আছে, পরপারেও আছে।

ছাড়া শরৎচন্দ্রের যে দুইটি আদিম গদ্য রচনা ছাপা হইয়াছিল—'ক্ষুদ্রের গৌরব'[১] ও 'গুরুশিষ্য-সংবাদ'[২]—তাহা কমলাকান্তের-দপ্তরেরই জের। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পরিত্যক্ত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'র[৩] উপোদ্‌ঘাত অংশটুকুও কমলাকান্তের-দপ্তর স্মরণ করায়।

১৯০১ সালের পর হইতে অর্থাৎ চোখের-বালি প্রকাশের এবং গল্পগুচ্ছ প্রচারের পর হইতে—যখন হইতে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাবলী পাঠের সুযোগ পান তখন হইতে—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িতে থাকে। তবে বঙ্কিমের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমের অনুসরণ শুধু সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস-গল্পেই আবদ্ধ। ইতিহাসের দিকে প্রসারিত হয় নাই। বঙ্কিম যে দৃষ্টিতে বাঙ্গালী সমাজকে দেখিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহার জীবন বঙ্কিমের মত সহজ ও সরল ছিল না। তবে জীবনে ভালো-মন্দর মৌলিক আদর্শ দুইজনেরই মোটামুটি একরকম ছিল। পার্থক্য এইখানে—বঙ্কিমের সামাজিক নীতিবোধ ছিল শাস্ত্র-শাসিত ও পাঠ্যপুস্তক-নির্ধারিত, শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ হৃদয়-অনুভূত, শাস্ত্র-শাসিতের মত অতখানি কৃত্রিম ও কঠিন নয়। কিন্তু পাঠকের মুখ চাহিয়া হোক অথবা অন্য কারণে হোক শরৎচন্দ্র সমসাময়িক সমাজ-বন্ধনের বেড়া ভাঙিবার সাহস করেন নাই, বোধকরি ইচ্ছাও করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল তাহা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৪]

> একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ, আমি বোঝা-পড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই! যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে সে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয় ত বাঁকিয়া বসে; কাজ-কর্ম্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়, উৎসব-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; সে সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

এখানে স্পষ্ট বোঝা গেল শরৎচন্দ্রের সমাজ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের শিথিলায়মান,

[১] রচনাকাল শ্রাবণ ১৩০৮, প্রকাশ যমুনা মাঘ ১৩২০। [২] রচনাকাল ১৩০৮ (?), প্রকাশ যমুনা ফাল্গুন ১৩২০। [৩] প্রকাশ ভারতবর্ষ মাঘ ১৩২২। [৪] 'সমাজধর্মের মূল্য', ভারতবর্ষ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। "শ্রীমতী অনিলা দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত।

দলগত পল্লীসমাজ—যে সমাজের একটা চিত্র তাঁহার 'পল্লীসমাজ'এ (১৩২২) পাই,—এবং তাঁহার অভিমত সমাজধর্ম হইতেছে খেয়ালি ভাবাবেগের পথ।

সমাজ-সংস্কারের দিকে শরৎচন্দ্রের কোন ঝোঁক তো ছিলই না অধিকন্তু বিদ্বেষই ছিল বলা যায়। সংস্কার-সমর্থক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁহার কখনো প্রসন্নতা ছিল না। সমাজ-সংস্কারবিমুখতা ও ব্রাহ্মসমাজ-বিদ্বেষ পরস্পরানুষঙ্গী ছিল, তবে কোনটি থেকে কোনটি আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। প্রবন্ধটিতে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নয়, স্পষ্টভাষিত এবং সঙ্গতিপূর্ণও নয়। তিনি বলিয়াছেন, ভুল-চুক অন্যায় অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও সমাজকে মানিয়া চলিতে হইবে।

> যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না।...সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্য্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।

এই সাহসহীন ধারণা শরৎচন্দ্রের শিল্পকে জনপ্রিয় করিয়াছে নিশ্চয়ই তবে সে শিল্পকে উৎকর্ষ হইতে সে দূরে রাখিয়াছে। কল্পিত সমাজ-গণ্ডীর নীরন্ধ্র প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা প্রত্যাশিত শিল্পপরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র তাঁহার সমাজবোধের মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সাহিত্যসৃষ্টিতেও ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু তখন আর সময় ছিল না, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি তখন নির্বাণোন্মুখ।

কয়েকখানি গল্প-উপন্যাসে নারী-নির্যাতনের কাহিনীই মুখ্যত স্থান পাইয়াছে।[২] এমন অবস্থায় আগেকার লেখকেরা সমাজব্যবস্থার অকরুণতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অবাধ্যতা করেন নাই। শরৎচন্দ্রও তাহা করেন নাই। তিনি গল্পের মধ্য দিয়া ষাট সত্তর বছর আগেকার শ্লথবন্ধন পল্লীসমাজের মূঢ় হৃদয়হীনতা ও অন্ধ স্বার্থপরতা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রবল নারীত্বের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মহৎ ধারণা ছিল, এমন কি মোহ ছিল বলা যায়। বোধ করি প্রথম জীবনে তিনি একাধিক তেজস্বিনী ও স্নেহশীলা মহিলার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তবে সে পরিচয়

[১] শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)। [২] যেমন 'চন্দ্রনাথ', 'বিরাজ বৌ' ও 'পল্লীসমাজ'।

প্রধানত রোমান্স-কল্পনার ও ভাবালুতার একরঙা মূর্তিতেই তাঁহার রচনায় প্রকটিত।

সতীত্বের ধারণায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অধিকাংশ পূর্বগামী লেখকদের পার্থক্য বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে আর কোন বড় গল্পলেখকের চারিত্র্যনীতিবোধ সাধারণত গতানুগতিকের অতিরিক্ত ছিল না। সমাজের চোখে যাহারা পতিত ও ঘৃণ্য তাহাদের মহত্বের পরিমাপ যে মনুষ্যত্বের উচ্চতর মানদণ্ড ছাড়াইয়া যাইতে পারে সেদিকে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—"মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি"। শরৎচন্দ্রও কয়েকটি উপন্যাসে এই কথাটিই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে একনিষ্ঠ প্রেম তথাকথিত সতীত্বনিষ্ঠারও উপরে। এ-বিষয়ে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস তিনি 'নারীর মূল্য' বইটিতে[১] এবং একাধিক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বারবার বলিয়াছেন। "সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"[২] "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।"[৩] বর্মী নারীর প্রশংসায় বলিয়াছেন, "কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলে নি।"[৪]

যে-সব নারী ক্ষণিক ভুলের বশে অথবা পেটের দায়ে কিংবা অবস্থার গতিকে পরপুরুষকে দেহ সমর্পণ করিতে বাধ্য হয় তাহাদের প্রতি সমাজের নির্মম অবহেলা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। মনে হয় প্রথম জীবনে তিনি এইরূপ একাধিক হতভাগিনীর পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এতটা দরদ, এমন কি অতিরিক্ত সহানুভূতি, জাগিতে পারে না। এক সময়ে শরৎচন্দ্র "এই বাঙ্গলা দেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর" ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন, "তাহাতে বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক হাভতগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল।" তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, "এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র

১ "শ্রীমতী অনিলা দেবী" এই ছদ্মনামে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ যমুনা ১৩২০।

২ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ৯২। ৩ ঐ পৃ ১৬। ৪ ঐ পৃ ১৮।

বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অসহ্য দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন।"[১]

তথ্যসংগ্রহের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র যে দুঃসাহস দেখাইয়াছেন কাহিনীর পরিণতিতে তাহা না দেখাইয়া ভালোই করিয়াছেন কেন না সাহিত্যরসসৃষ্টি আর সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা একধরণের কাজ নয়। শরৎচন্দ্র ঠিকই লিখিয়াছিলেন, "সমাজসংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, আমার বইয়ের মধ্যে মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নই।"[২] কিন্তু শেষের দিকের লেখায় শরৎচন্দ্র শিল্পী-মনের নিরাসক্তি সব সময় রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সমাজ-সমস্যায় বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিষ্ট অর্থাৎ যথাযথপন্থী লেখক বলা চলে না। ইঁহার জীবনদৃষ্টি সর্বদা অরঞ্জিত ছিল না, গভীরও ছিল না। সে-দৃষ্টি সহজেই হৃদয়াবেগের বাষ্পে ঘোলাইয়া গিয়াছে। ইঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি সেই অল্পপরিমাণেই বাস্তব যে-পরিমাণে তাহারা জীবনের দীনতা, কুশ্রীতা ও কদর্যতাকে রূপাপিত করে। অর্থাৎ এই দীনতা ইত্যাদি শুধুই ভাবাবেগের ভারসাম্যের জন্য। প্রধান পাত্রপাত্রীর রোমান্টিক ভাবাদর্শের সঙ্গে এই অপ্রিয় ও কুশ্রী বাস্তবতার টানা-পোড়েনেই শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আকর্ষণীয়তা নির্ভর করিয়াছে। সর্বোপরি লেখকের সহানুভূতি এবং হীন-নিপীড়িতদিগের জন্য অকৃত্রিম অনুকম্পা কাহিনীকে অনায়াস-উপভোগ্য করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'[৩] কবিতাটি পঠনীয়।

> তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
> 'বাসি ফুলের মালা'।
> তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
> পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
> পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
> দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে—
> জিতিয়ে দিলে তাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য কোথায়। ইহার উত্তর সহজ। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মানবজীবনের সেই অখণ্ড রূপটি ধরা

১ 'নারীর মূল্য', যমুনা আষাঢ় ১৩২০। ২ স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৪৮।
৩ 'পুনশ্চ'এ সংকলিত।

পড়িয়াছে যাহা বিশ্বজীবনের ধারার সঙ্গে অনবছিন্নভাবে যুক্ত এবং যাহা জীবন-স্রোতের মধ্যদিয়া অনির্বচনীয় চরিতার্থতার অভিমুখে চলিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পে দীনতম ভূমিকাও লেখকের সমর্থন অথবা অনুকম্পা ব্যতিরেকেই আপন নিজত্বে মহিমান্বিত। শরৎচন্দ্রের কল্পনায় মানবজীবন খণ্ডরূপে প্রতিফলিত এবং তাহার আরম্ভ ও শেষ এইখানেই। তাই ভূমিকায় মাহাত্ম্য আরোপণ করিতে শরৎচন্দ্রকে বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে অথবা হৃদয়াবেগের দোহাই দিতে হইয়াছে, এবং এইকারণেই তাঁহার রচনায় জীবনের বাহিরের ইঙ্গিতপ্রায় নাই, অথবা থাকিলেও তাহা নিতান্ত মামুলি। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের লেখায় গুরু গম্ভীর তত্ত্বকথা মোটেই জমে নাই॥

৩

শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্প-বলার সহজ, সরল, একটু বক্রতায়িত ভঙ্গিরই প্রকাশ। ষ্টিভেন্‌সনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা না করিয়াও বলিতে পারি ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের "তুসিতালা"। শরৎচন্দ্রের গল্পে প্লট-রচনা মুখ্য নয়, বর্ণনাটাই মুখ্য। নিজের গল্পরচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র একদা বলিয়াছিলেন,

> প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সেসব আপনি আসিয়া পড়ে।[১]

অভিজ্ঞতার সূত্র যেখানে নাই সেখানে কল্পনানির্ভর গল্প ভালো জমে নাই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কাহিনীও অনেক সময় আবেগের উচ্ছ্বাসে এলাইয়া গিয়াছে। অথচ এই কৈশোরোচিত আবেগ ও ভাবালুতাই শরৎচন্দ্রের রচনার জনপ্রিয়তার একটা প্রধান হেতু। 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পরিণীতা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে রোমান্টিক কৈশোর কল্পনারই প্রাধান্য, এবং এই ধরণের লেখাগুলিই সাধারণ পাঠকসমাজে লেখক শরৎচন্দ্রের আসনখানি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে পূর্বরাগের ও নববিবাহিতের অনুরাগের বর্ণনায় অবাস্তবের ঘোর রঙ লাগিয়াছে। তবে সাধারণ ভারতীয় পাঠকের চিরদিনের মনের কথাটি

[১] ত্রিপঞ্চাশ জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণ (সেপ্টেম্বর ১৯২৮), 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' পৃ ২০৭।

তিনি জানিতেন, সে কথা—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"। ভাবাতুরও মধুররসালু বলিয়াই তাঁহার দুঃখান্তিক কাহিনী ট্রাজিক না হইয়া শুধু প্যাথেটিক হইয়াছে। এমন কি 'অরক্ষণীয়া'র অমন নিষ্করুণ কাহিনীও মাটি হইয়া গিয়াছে।

সেন্টিমেণ্টাল আবেদন ও রোমাণ্টিক পরিমণ্ডলটুকু যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে বোধ করি সেই উদ্দেশ্যেই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ কিংবা অতিশয়িত হইয়াছে, এবং ইহার ফলে ভূমিকাগুলির সম্ভাব্যতার হানি হইয়াছে। তবে যেখানে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় হইতে উপাদান গৃহীত সেখানে কাহিনীর উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। শরৎচন্দ্র সংসার ও সমাজকে দেখিয়াছেন ভালোমন্দ লাগার অনুভূতি দিয়া, কৌতূহলী চোখ দিয়া নয়। এইখানেই প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্লটে এবং চরিত্রকল্পনায় সে সংখ্যার অনুপাতে বৈচিত্র্য পাই না। প্রধান ভূমিকাগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলিতে পারি,—(১) আত্মভোলা উদাসীন অথবা বুদ্ধিবিবেচনাহীন মূঢ়, (২) শঠ, কপট অথবা মূর্খ, এবং (৩) অনিয়মিত-হৃদয়াবেগ-উচ্ছ্বসিত স্নেহশীল ব্যক্তি যাহার মেজাজে ও ব্যবহারে যথাক্রমে অসঙ্গত অভিমানের সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান ও আর্দ্র স্নেহের সঙ্গে কোমল-অভ্যর্থনা পরপর ছায়া ও রৌদ্র ফেলিয়াছে। মানবের জীবনে প্রচণ্ডতায় প্রকৃতির শক্তির অনেক উপরে যায় অনাদি অদৃষ্টচক্রের গতি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে অদৃষ্টচক্রের গতি উপেক্ষিত। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র-গুলি নিজেদেরই বিশিষ্ট হৃদয়াবেগান্দোলিত ও মনোবৃত্তি-চালিত পুতুলের মত ক্বচিৎ পারিপার্শ্বিকের চাপে ক্লিষ্ট, কিন্তু কদাপি অমোঘ অদৃষ্টচক্রাক্রান্তে পিষ্ট নয়।

শরৎচন্দ্রের গল্পের পাত্রপাত্রীর পরস্পর-সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় হইতেছে স্নেহ-শীলতার তির্যক্‌গতি। অর্থাৎ ভালোবাসার বন্ধন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবলম্বন না লইয়া অসাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আশ্রয় লইয়াছে। তাই শরৎচন্দ্রের গল্পে বৈমাত্র ভাই, জ্ঞাতি ভাই-ভগিনী, খুড়ী-মাসী, দেবরপুত্র-ভগিনীপুত্র এমন কি আরো দূরতর আত্মীয়তা-সম্পর্কের মধ্যেই নিবিড়তম স্নেহবন্ধন চিত্রিত। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমত একটু পরকীয় হইলে রস জমে ভালো। দ্বিতীয়ত শৈশবে ও বাল্যে বোধ করি শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টে বাপমায়ের ভালোবাসার অপেক্ষা দূরসম্পর্কীয়ের স্নেহ অযাচিতভাবে এবং বেশি করিয়া জুটিয়াছিল ॥

৪

পূর্বগামীদের রচনার প্রভাব ও প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গল্প-উপন্যাসগুলিকে চারি পর্যায়ে[১] ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পড়ে বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত রচনাগুলি। যেমন, 'দেবদাস' (১৯১৭)[২], 'পরিণীতা' (১৯১৪)[৩], 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'দত্তা' (১৯১৮), 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) এবং 'পথের দাবী' (১৯২৬)। এই গল্পগুলিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের রস যেন ইতিহাস-বর্জিত এবং কালোপযোগী পাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে। দেবদাসের আদর্শ 'রজনী', প্রধান যোগসূত্র—বাল্যপ্রণয় ও বৃদ্ধ স্বামীর আনুগত্য। পরিণীতা 'রাধারাণী'র কথা মনে পড়ায়; যোগসূত্র ধনিযুবকের প্রেমপ্রশ্রয়। বিরাজ-বৌয়ে 'মৃণালিনী'র ও 'বিষবৃক্ষ'এর অতি ক্ষীণ ছায়া অনুভূত হয়। পল্লীসমাজ তুলনা করা চলে 'চন্দ্রশেখর'এর সঙ্গে বাল্য-প্রণয়ের প্রকৃতি ও গভীরতার দিক দিয়া। চন্দ্রনাথের সঙ্গে 'ইন্দিরা'র সাদৃশ্য অভ্রান্ত, পাচিকাবেশে মিলন ইত্যাদি অনেক যোগসূত্র।[৩] ধনি-কন্যার জন্য দুই নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দত্তার সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনা নির্দেশ করে। 'দেবী চৌধুরাণী'র আধুনিক ভাবরূপান্তর দেনা-পাওনা, যোগসূত্র নায়িকার মঠাধ্যক্ষতা ও স্বামিপরিত্যাগ। 'আনন্দ মঠ'এর সঙ্গে পথের-দাবীর মিল ভাবের দিক দিয়া দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্র-ভাবিত রচনাগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। এগুলি হইতেছে,—'মন্দির', 'বড়দিদি' প্রভৃতি গল্প, 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'গৃহদাহ' (১৯২০) এবং 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। চরিত্রহীন 'চোখের বালি'র অনুকরণ, অরক্ষণীয়ায় 'স্ত্রীর পত্র'এর ইঙ্গিত, গৃহদাহে 'গোরা'র আভাস, এবং বিপ্রদাসে 'যোগাযোগ'এর ক্ষীণ ছায়াপাত।

তৃতীয় পর্যায়ের রচনা আত্মকথাশ্রিত। যেমন, চারি পর্ব 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩)। চরিত্রহীনও অংশত এই পর্যায়ে পড়িতে পারে, তবে সেখানে আত্মগোপন প্রায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ পর্যায়ের রচনা 'শেষ প্রশ্ন'কে (১৯৩১) নাম দিতে পারি "দিক্‌ভ্রান্ত"।

[১] এই পর্যায়বিভাগ নিখুঁতভাবে কালানুক্রমিক নয়। [২] রচনাকাল ১৩০৮ (?); প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-২৪। [৩] চন্দ্রনাথে রবীন্দ্রনাথের ও প্রভাতকুমারের রচনারও প্রভাব আছে। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি।

বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন রচনাটিতে ভাবুকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে কিন্তু কাহিনী কিছুমাত্র জমে নাই। চরিত্রগুলিও আকস্মিক ও অবুঝ॥

৫

প্রথম দিকের বড় গল্পগুলির কাহিনীর মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য আছে। 'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পথনির্দেশ', 'আলো ও ছায়া', 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', এই সব গল্প-উপন্যাসে—দু-তরফা না হোক একতরফা—সৌভ্রাত্র্য ও আত্মীয়তা অথবা বংশমর্যাদা মিলনের পক্ষে দুস্তর বাধা হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত'[১] বা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'ও এই ধরণের কাহিনী। তবে এখানে মিলন দীর্ঘকাল বাধাগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয় নাই।

'মন্দির' ও 'বিরাজ বৌ' গল্প দুইটির কাহিনীর পত্তন হইয়াছে শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি সরস্বতী-তীরবর্তী দেবানন্দপুর অঞ্চলে। বিষয় যোগাইয়াছে তাঁহার বাল্যস্মৃতি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কৈশোর-রচনা (?) 'শুভদা'য় (১৯৩৮) বিরাজবৌএর কাহিনীর অসংস্কৃত আদি রূপটি পাই।

নায়ক-নায়িকার কঠিন পীড়া কিংবা মৃত্যু দ্বারা কাহিনীর সঙ্কটমোচন অথবা জটিল ঘটনার গ্রন্থিচ্ছেদ শরৎচন্দ্রের প্লট-পরিকল্পনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট। মন্দির, বড়দিদি, বিরাজ বৌ, দেবদাস ইত্যাদিতে প্লটের জট ছাড়ানো হইয়াছে নায়ক অথবা নায়িকার মৃত্যুতে। এইখানেও বঙ্কিমের প্রভাব জাগ্রত।

'দেবদাস'[২] শরৎচন্দ্রের প্রথমতম উপন্যাস যদিও না হয় অন্যতম প্রথম উপন্যাস নিশ্চয়ই। কাহিনীতে বঙ্কিমের অনুসরণ সুব্যক্ত। পার্বতী-দেবদাসের বাল্যসৌহার্দ্যলীলায় শৈবালিনী-প্রতাপের প্রণয়লীলার অনুসরণ আছে, পার্বতী-ভুবনবাবুর দাম্পত্য-ব্যবহারে লবঙ্গ-রামসদয়ের দাম্পত্যলীলার অনুকরণও দুর্লক্ষ্য নয়। দেবদাস-পার্বতীর করুণ কাহিনীর মধ্যে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চমক্ আছে। কিন্তু রঙ অত্যন্ত চড়িয়া যাওয়ায় দেবদাসের শোচনীয় পরিণতি পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও শিল্পের হানি করিয়াছে। দেবদাসের গোড়াকার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা শেষের দিকে সেন্টিমেণ্টালিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে॥

[১] প্রথম প্রকাশ: প্রথম পর্ব ভারতবর্ষ (১৩২২-১৩২৩), দ্বিতীয় পর্ব ঐ (১৩২৪-১৩২৫), তৃতীয় পর্ব (অংশত) ঐ (১৩২৭-১৩২৮), চতুর্থ পর্ব বিচিত্রা (১৩৩৮-১৩৩৯)।

[২] রচনাসমাপ্তিকাল সেপ্টেম্বর ১৯০০। প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৪।

৬

'চরিত্রহীন'[১] (১৩২৪) শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট উপন্যাস। একদা লেখকের খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকটাই এই রচনাটির উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখনো সাধারণ পাঠকসমাজে চরিত্রহীনের মূল্য লইয়া মতভেদ চুকিয়া যায় নাই। তাহার কারণ বইটিতে লেখকের সাহিত্যকৃতির দোষ ও গুণ সমানভাবে বর্তমান। চরিত্রহীনের রচনাকাল জানা নাই। কিন্তু ইহা যে ১৩০৮ সালে আগে লেখা হয় নাই তাহা বুঝিতেছি চোখের-বালির ছায়া হইতে। ১৩০৮ সালের খুব বেশি দিন পরেও নয়, কেন না তখনো বঙ্কিমের প্রভাব কমিয়া যায় নাই। চোখের-বালি শরৎচন্দ্রকে কতটা অভিভূত করিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

> ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।...কোন কিছু যে এমন করে' বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু সাহিত্যের নয় নিজেরও যেন, একটা পরিচয় পেলাম।[২]

কিন্তু এই চোখের-বালিকেই যেন টেক্কা দিয়া চরিত্রহীন লেখা হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে বর্মা হইতে দুইটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,

> চোখের বালি তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই: পরে কি করিব কি জানি![৩]
>
> অথচ রবিবাবুর "চোখের বালি" ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই।[৪]

চোখের-বালি সম্বন্ধেই যখন এই ধারণা তখন অপর খ্যাতিমান্ লেখকের উপন্যাসের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব ভালো হইবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে আর একটি পত্রসাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-শিল্পেরও অপরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

> সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষ তাকে যেন অবজ্ঞার চোখে না দেখে সে উপায় ক'রেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ওরকম না হলে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু

[১] প্রথম প্রকাশ (অংশত) যমুনা ১৩২০-১৩২১; তাহার পরে নূতন করিয়া ভারতবর্ষে।

[২] স্বদেশ ও সাহিত্য পৃ ১৫৪।

[৩] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় সঙ্কলিত, পৃ ২৯। [৪] ঐ পৃ ৭১।

পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাকবে।...ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি, অরণ্যবাস—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগারথাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি"। ঐ পুকুত, আর মন্দির আর ঐসব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না—অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়ি নি। অথচ আমার এই ব্যবসা।[১]

হারাণ-কিরণময়ীর দাম্পত্য-সম্পর্কে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর ব্যবহারের আমেজ আছে; এবং কিরণময়ীর ব্যবহার মাঝে মাঝে রোহিণীর মত, আর পরিণাম শৈবলিনীর অনুরূপ। বঙ্কিম-প্রভাব শুধু এইটুকুতেই পর্যবসিত। রবীন্দ্রপ্রভাব-কিন্তু গুরুতর। বিনোদিনীর আদর্শ যেন উন্নত করিতে কিরণময়ী পরিকল্পনা। উপেন্দ্রও অনেকটা মহেন্দ্রের মত, তবে বিবর্ণ ও নীরক্ত। কিরণময়ীর স্পষ্টতই বিনোদিনীর মত কথাবার্তা বলে। দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ীর পলায়ন সহজেই বিনোদিনী-মহেন্দ্রের পলায়ন-কাহিনী মনে করায়। সুরবালা আশার ছাঁচে গড়া, তবে আশার মত সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব সে পায় নাই। উপেন্দ্রের ভূমিকায় দৈবাৎ বিহারীর ক্ষীণ আভাস। দিবাকর নষ্টনীড়ের অমলকে স্মরণ করায়।

চরিত্রহীনের প্লট খুব গোছালো নয়। কেননা সে প্লটে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ খায় নাই। কোন কোন ঘটনা স্পষ্টতই বাস্তবমূল এবং তাহা লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রসূত। দিবাকর যদি শরৎচন্দ্রের বাস্তবজীবনের প্রতিবিম্ব হয় তবে সতীশ তাঁহার ভাবজীবনের প্রতিফলন।

প্লটে দুইটি পৃথক্ কাহিনী সমান্তরালভাবে অনুস্যূত হইয়াছে। কিন্তু সে দুইটির যোগসূত্র সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন নয়। প্রথম কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রী দুরদৃষ্টবশে পতিত, দ্বিতীয় কাহিনীর নায়িকা কিরণময়ী স্বকৃতভঙ্গ।

নায়ক বলিতে যদি কেহ থাকে তো সতীশ। এক হিসাবে সতীশই প্রধান ঘটনাচক্রের নিয়ন্তা। সতীশেরই স্নেহভিক্ষায় কিরণময়ীর কঠিন হৃদয় গলিতে শুরু করে, তাহার কথাতেই কিরণময়ীর সম্পর্কে উপেন্দ্র সজাগ হয়। শরৎচন্দ্রের রোমান্সের নায়ক যেমনটি হইয়া থাকে সতীশও তেমনি—ধনবান্ ও সংসারবন্ধন-হীন, উদারহৃদয় এবং মধ্যে মধ্যে অযথা উচ্ছৃঙ্খল,—আসলে ভালোলোক। সে প্রবলবিশ্বাসী, তাহার বিশ্বাসভূমি ধোঁয়াটে "উপীন দা"। সতীশ রোমান্টিক

[১] ঐ পৃ ৫৭। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ও অবিনাশচন্দ্র দাসের 'অরণ্যবাস' প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, প্রভাতকুমারের 'রত্নদীপ' মানসীতে। বাগ্‌দত্তা ইত্যাদি অনুরূপা দেবীর লেখা।

মেজাজের লোক, তবুও সাবিত্রীর সম্পর্কে তাহার নিরর্থ মান-অভিমানের খামখেয়াল ও চলচিত্ততা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

দিবাকর-ভূমিকায় লেখক প্রধানত নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু শেষের দিকে—বিশেষ করিয়া আরাকানের ব্যাপারে—তাহার পরিণতি সঙ্গত বোধ হয় না।

উপেন্দ্রের ভূমিকা অস্ফুট, কতকটা রহস্যাবৃত। দেবপ্রতিমার মাহাত্ম্যের মত তাঁহার মহত্বও যেন জনশ্রুতিনির্ভর। কাহিনীর শেষের দিকে উপেন্দ্র মানুষের মত হইয়াছে বটে কিন্তু অতিরিক্ত অশ্রুপ্রবণতা চরিত্রটিকে খেলো করিয়াছে। সাবিত্রীকে দেখিবামাত্র সতীশের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন "উপীন্ দার" তুরীয় জ্ঞানশীলতার ও অনির্বচনীয় হৃদয়বত্তার কাছেও অনপেক্ষিত।

সুরবালার ভূমিকা চরিত্রহীন-কাহিনীর ধ্রুবতারার মত। সুরবালা স্নেহশীল সরলহৃদয় বিশ্বাসপ্রবণ। কিন্তু কেন যে তাহার উপর উপেন্দ্রের অত ভক্তি ও আস্থা তাহার ইঙ্গিতটুকুও নাই। সুরবালার মৃত্যুতে উপেন্দ্রের মনে পরিবর্তন আসিল, তাহার হৃদয়ের কাঠিন্য চলিয়া গিয়া ক্ষমাশীলতার আবির্ভাব হইল। কিন্তু সুরবালা কাহিনীর আড়ালে থাকিয়া গিয়াছে বলিয়া এই পরিবর্তন অহেতুক মনে হয়। সুরবালা উপেন্দ্রের গুরু, কিরণবালারও। সুরবালার পতিপ্রেমই কিরণবালার নিরুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির যথার্থ প্রকাশপথ দেখাইয়াছিল—স্বামিসেবার মধ্য দিয়া। সে-পথ যখন অবিলম্বে রুদ্ধ হইয়া গেল তখন সুরবালার সরল বিশ্বাস (এবং সতীশের সস্নেহ ব্যবহার) তাহাকে সান্ত্বনার পথ নির্দেশ করিয়াছিল।

কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে সাবিত্রী প্রথম দেখা দিল যেন বিলাতি বাড়ীওয়ালীর ভূমিকায়। সাবিত্রীর সম্পর্কে মেসের বাবুদের ও লোকজনের ব্যবহার আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত অ-সাধারণ। প্রেমাস্পদের উপর তাহার সুদৃঢ় অধিকারবোধ-সত্ত্বেও অযথা দুর্ব্যবহারের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। স্বীকার করি প্রেমের কৌটিল্য এবং নারীপ্রকৃতির ছলনা সাহিত্যে ও মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত তথ্য, কিন্তু তাহারো সঙ্গতি ও সীমা আছে। শুধু সাবিত্রীতে নয় শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল নায়িকা-চরিত্রেই এই প্রেমকৌটিল্য ও বাক্যব্যবহার পৌগণ্ডচাপল্যে পর্যবসিত। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিল্বমঙ্গল নাটকের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

৲ পূর্বেই বলিয়াছি কিরণময়ী-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর এবং রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মনোবৃত্তি আরোপিত হইয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া

কিরণময়ীকে পূরাপূরি বিদুষী হইতে হইয়াছে। কিরণময়ী ছাপা রামায়ণে খুশি নয়, রামায়ণের "পুথি" পাঠ না করিলে তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই পুঁথি পড়া খাপ খায় না এবং তাহার পরবর্তী জীবনেও ইহার সঙ্গতি নাই। দিবাকরের সঙ্গে তাহার মূষিকমার্জার-ক্রীড়ারও কোন সাফাই নাই, অনপেক্ষিত যৌন-ক্ষুধা ছাড়া। হয়ত কিরণময়ীর স্নায়ুবিকার ছিল।[১] পরিণামে মস্তিষ্ক বিকৃতিও ইহাই ইঙ্গিত করে। কিরণময়ীর দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের একটিকে টানিয়াছে উপেন্দ্রের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগের ও শান্তির তটভূমিতে, অপরটিকে টানিয়াছে দেহের ক্ষুধা দিবাকরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোগের ও সর্বনাশের আবর্তে। এই দুই বিপরীত টানে পড়িয়া হতভাগিনীর জীবন গেল নষ্ট হইয়া।

সমাজের হৃদয়হীন কঠোরতাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিলেও শরৎচন্দ্র সমাজের মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তাঁহার লেখায় হয়ত চাণক্যশ্লোকের নীতিসূত্র উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত নীতিবোধ, যাহার প্রেরণা বইয়ের শুষ্ক পত্র হইতে নয়, মানুষের জীবন্ত হৃদয় হইতে তাহার উপরই তাঁহার নির্ভর। সাবিত্রীর পূর্বজীবন যে ভদ্র-সমাজের অনুমোদিত প্রণালীতে যাপিত হয় নাই তাহার জন্য জ্ঞানত সে দায়ী নয়, দায়ী তাহার পারিপার্শ্বিক, তাহার সঙ্কীর্ণ সমাজ-পরিসর। কিন্তু লোকের চোখে চরিত্রহীন হইলেও সে সতীশের কাছে অসতী নয়, কেন না সতীশের ভালোবাসা পাইবার পর হইতে তাহার হৃদয় একনিষ্ঠ হইয়াছে। কিরণময়ী তাহার দেহকে অপবিত্র করিয়াছে ক্ষণিক প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু উপেন্দ্রের প্রতি তাহার প্রেমনিষ্ঠা এতটুকুও টলে নাই। সুতরাং চরিত্রহীন হইয়াও সে অসতী নয়। তবুও শরৎচন্দ্র এই দুই নারীকে জীবনের চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন সমাজের মুখ চাহিয়া। কিরণময়ীর কথা উঠে না। সতীশ-সাবিত্রীর মিলনের বাধা সরোজিনী-কাহিনীর পক্ষে অলজ্ঘনীয় নয়। তবে শরৎচন্দ্রের কাছে বিবাহের মাহাত্ম্য ছিল সুমহৎ, তাই কোনোদিক দিয়া তিনি খুঁত রাখিতে চাহিতেন না বিবাহ ব্যাপারে।[২]

বিলাতি-আচারপরায়ণ শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাই সেখানে তিনি ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য মহিলার চিত্র অঙ্কনে অকৃতকার্য হইয়াছেন। সরোজিনী-ভূমিকার পরিকল্পনায়ও তাই এই

[১] এরকম কোন ইঙ্গিত থাকিলে কিরণময়ীর চরিত্র সত্যকার "বাস্তব" হইতে পারিত।

[২] দত্তা, দেনা-পাওনা ও শ্রীকান্ত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

অজ্ঞতার প্রকাশ। এই ভূমিকায় 'গোরা'র ললিতার কিছু ছায়া আছে। অঘোরময়ীর ভূমিকায় ব্যঙ্গবিজড়িত বাস্তবতা আছে। ষ্টীমারের ও আরাকানের আখ্যানের অবান্তর ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলি জীবন্ত হইয়াছে। জাহাজে কিরণময়ী-দিবাকরের সম্পর্ক নৌকাডুবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়॥

৭

'শ্রীকান্ত' লেখকের আত্মস্মৃতিমূলক চিত্রসর্বস্ব উপন্যাস। চরিত্রহীনের সঙ্গে এই বইটির একটু সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় পর্বে বর্মার ঘটনায় চরিত্রহীনের আরাকান কাহিনীরই অনুবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম পর্বে বাল্যজীবনকে আশ্রয় করিয়া শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সুপাঠ্য কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ-ভূমিকার কল্পনা কতটা বাস্তবনিষ্ঠ জানি না, কিন্তু সে যে রবীন্দ্রনাথের তারাপদর মত সাহিত্যের অমরাবতীর অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্নদাদিদির আখ্যায়িকা উজ্জ্বল ও মধুর। 'বিলাসী'[১] গল্পে এই কাহিনীর উল্‌টাপিঠের ছবি পাই। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে অভিজ্ঞতার যোগান কমিয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্গে কল্পনার ভাগ বাড়িয়াছে, তাই এখানে আগেকার উজ্জ্বলতা নাই।

শ্রীকান্তের কাহিনীতে একরকম ধারাবাহিকতা থাকিলেও উপন্যাসের সংহত ও অখণ্ড রূপ ইহাতে নাই। বইটিতে সমগ্রতা নাই, না কাহিনীর দিক্ দিয়া, না রচনার দিক্ দিয়া, না ভাবের দিক্ দিয়া। তাহার একটা কারণ বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে রচনা। বইটির মূল গুণ এই যে ইহাতে লেখকের অভিজ্ঞতার ও কল্পনার উজ্জ্বল খণ্ডচিত্র গ্রথিত রহিয়াছে॥

৮

চরিত্রহীনের মত 'গৃহদাহ'ও[২] শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়িয়াই যে বইটি লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন একথা লেখক একটি চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন। কাহিনীর কোন বস্তুই লেখকের অভিজ্ঞতা লব্ধ বলিয়া মনে হয় না। তাই পূর্ববর্তী উপন্যাসের গুণ ইহাতে তেমন নাই। অকস্মাৎ পীড়া অথবা মূর্ছা ঘটাইয়া কাহিনীর জট কাটিয়া দেওয়া শরৎচন্দ্রের প্লট-রচনার একটি সাধারণ কৌশল। গৃহদাহে এই কৌশল বারবার চোখে পড়ে।

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১৩২৫।
[২] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৩-১৩২৬।

চরিত্রহীনের যে সমস্যা তাহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ জীবনে সেরূপ ঘটনা নিত্যই না হোক কখনো কখনো ঘটে। গৃহদাহের সমস্যা এমন স্বাভাবিক নয়। অবশ্য তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সমস্যার অস্বাভাবিকতা ঢাকা পড়িয়া যায় যদি তাহা কাহিনী ও চরিত্রের পক্ষে অপেক্ষিত এবং পরিপূর্ণ প্রেক্ষণীতে উপস্থাপিত হয়। গৃহদাহের সমস্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কৃত্রিম, এবং প্লট-পরিকল্পনার শৈথিল্যে সে কৃত্রিমতা ঢাকা পড়িতে পারে নাই। স্বামিনিষ্ঠা হইতে যে প্রেম নারীহৃদয়ে জন্মায় তাহার মূল সুদূরবিসারী, তাহা প্রতিদিনের ভুলভ্রান্তি মান-অভিমান সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকে, এবং অবস্থার বিপাকে এমন নারীর দেহ-অশুদ্ধি ঘটিলেও তাহার পাতিব্রত্যের হানি হয় না। ইহাই গৃহদাহের তত্ত্বকথা। কিন্তু প্রধান প্রধান ভূমিকার অতিরঞ্জনের জন্য ঘটনাবলীর ঘনঘটার জালে এবং বাগ্‌বিস্তারের ফলে তত্ত্বকথাটুকু পরিস্ফুট হয় নাই। যে-সমাজ হইতে শরৎচন্দ্র প্রধান কয়েকটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, জনশ্রুতিলব্ধ।[১]

গৃহদাহের প্রধান নায়ক মহিমের ভূমিকা ভালো করিয়া ফোটে নাই। উপেন্দ্রের মত মহিমও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বহীন এবং অপার্থিব। তাহাকে অহেতুক মহত্ত্বের উচ্চ আসনে বসাইয়া তাহার মানবতাটুকুকে উপন্যাসকাহিনীর যবনিকার অন্তরালেই রাখা হইয়াছে। প্রতিনায়ক সুরেশ শরৎচন্দ্রের সাধারণ নায়কের গুণবিশিষ্ট। সে ইমোশনাল, মেজাজী ও স্বেচ্ছাচারী, অন্তরে ভালো মানুষ, এবং একটুতেই তাহার চোখে জল আসে। গল্পের আসরে তাহার প্রথম আবির্ভাব অত্যন্ত অকারণ। তাহার আরো অনেক কার্যের কোন আধিভৌতিক অথবা আধিমানসিক সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। সাধু নয়, পাষণ্ডও নয়—হয়ত সে পাগল। সুরেশ কতকটা কিরণময়ীর পুরুষ বেশ। কিরণময়ী পাগল হইয়াছিল শেষে, সুরেশ প্রথম হইতেই।

কেদারবাবুর ভূমিকায় প্রথম দিকে ব্যঙ্গের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। শেষের দিকে তাঁহাকে কতকটা মানুষের মত দেখি বটে, কিন্তু অত্যন্ত রঙ-চড়া। তিনিও পরিণামে ছিঁচ-কাঁদুনে হইয়াছেন। অচলার ভূমিকায় লেখকের প্রযত্নের পরিচয় আছে। রহস্যময়তা ও অহেতু খেয়ালি-ভাব না থাকিলে ভূমিকাটি স্পষ্টতর হইত। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী সুরেশ-অচলার মেজাজও

১ চৌত্রিশ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজের উপর যে কটাক্ষ আছে তাহা অন্যায়।

ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসজল প্রেমোচ্ছ্বাসের ও মর্মভেদী কলহের দোলায় দুলিতেছে। অচলা ব্রাহ্মঘরের শিক্ষিত মেয়ে কিন্তু তাহার আচরণ সর্বদা বাঙ্গালীর মেয়ের মত নয়। অচলা-ভূমিকার পরিকল্পনায় ইংরেজি নভেলের ঋণ থাকা অসম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের ধারণায় বিধবা বাঙ্গালী মেয়ের নিষ্ঠার ও শুচিতার যে আদর্শ ছিল তাহা মৃণাল-ভূমিকায় অভিব্যক্ত॥

৯

'দত্তা'[১] (১৯১৮) পুরাপুরি রোমান্টিক উপন্যাস। ছোটগল্পের উপযোগী কাহিনীটিকে টানিয়া বুনিয়া উপন্যাসের দীর্ঘত্ব দেওয়া হইয়াছে। চার্লর্স্ গার্ভিসের 'লিওলা ডেল্স্ ফরচুন্' (Leola Dale's Fortune) উপন্যাস-কাহিনীর সঙ্গে দত্তার মিল এতটা গভীর যে শরৎচন্দ্র যে প্লটের জন্য অংশত ইংরেজি ঔপন্যাসিকের কাছে ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।[২] রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত ভূমিকায় ইংরেজির প্রভাব অনুভূত হয়। দয়াল গোরার পরেশবাবুর ছাঁচে ঢালা।

'দেনা-পাওনা'র (১৯২৩)[৩] চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মূলও ইংরেজি থেকে নেওয়া বলিয়া সন্দেহ জাগে। ষোড়শীর মত দেবদাসী বিলাতি নভেলেই মানায়, বাঙ্গালা দেশের গল্পে ও ইতিহাসে এ বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাউল-বৈষ্ণবদের সেবাদাসী আছে, কিন্তু মঠাধ্যক্ষতা দূরে থাক মোহন্তগিরিও অসম্ভব তাহাদের পক্ষে। জীবানন্দের ভূমিকায় যে আতিশয্য দেখি তাহাও বিদেশি আমদানি মনে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে লেখা (১৯২৮) একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন,

> এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করেই।...অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী।[৪]

'পথের দাবী'তে (১৯২৬) বাঙ্গালার বিপ্লব-আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব উপকূলে আছড়াইয়া পড়িয়া কিভাবে একটি অস্ফুট প্রেম-কাহিনীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহারই ছবি আঁকা হইয়াছে। বাস্তবমূলক ভূমিকাগুলি বেশ জমিয়াছে। সুমিত্রার ভূমিকায় নির্লিপ্ততার ও কাঠিন্যের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। অপূর্ব-ভারতীর প্রেমকাহিনী গল্পের রহস্যময় গম্ভীর ভীষণ পরিবেশকে জমিয়া উঠিতে দেয় নাই। অতি নাটকীয়তার আতিশয্যও ইহার জন্য দায়ী। অপূর্ব ঘরপোষা

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৪-২৫। [২] শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় এই সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।
[৩] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২৭-৩০। [৪] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', পৃ ২৩১, ২৩৩।

কুনো বাঙ্গালী ভদ্রঘরের ছেলে, স্বীকার করি। সে হয়ত লেখকের মানস-প্রতিবিম্ব, একথাও স্বীকার করিতে বাধা নাই, কিন্তু সর্বদা মেরুদণ্ডহীন ও স্ত্রীলোকের আঁচল-ধরা হইবার আবশ্যকতা শিল্পের দিক্ দিয়া ছিল কি? ছোটখাট অসঙ্গতি সত্ত্বেও ভারতীর ভূমিকায় খানিকটা স্বাভাবিকতা আছে। মোটের উপর সব্যসাচীর কোমলগম্ভীর রোমান্টিক ভূমিকাটিই পথের-দাবীর জনপ্রিয়তার হেতু। আসলে বিপ্লবপন্থার চিত্র হিসাবে পথের-দাবী খুব সার্থক রচনা নয়।

শরৎচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) লইয়া সাধারণ পাঠক-সমাজে প্রবল মতদ্বৈধ আছে। বইটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তবে সে উদ্দেশ্য আগেকার উদ্দেশ্য নয়, সাধারণ পাঠক ভোলাবার জন্য লেখা নয়। তবে ইহাও টেক্কা দিবার জন্য লেখা—"অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের। পত্রসাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি।

> "অতি-আধুনিক সাহিত্য" কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত[১]
> শেষপ্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কিরকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব করবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখবো" এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক-সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।[২]

১০

'পল্লীসমাজ', (১৯২৩) 'অরক্ষণীয়া', (১৩২৩) 'বামুনের মেয়ে' (১৩২৭) প্রভৃতি রচনা সাধারণত সামাজিক উপন্যাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে। আসলে এগুলি "সামাজিক" নয়, শরৎচন্দ্রের সব গল্পের মত এগুলিও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত। শরৎচন্দ্রের গল্পে যাহা সমাজ তাহা পটভূমিকা বা রঙ্গস্থলী মাত্র। অন্য লেখকের রচনায় বহিঃপ্রকৃতির যে স্থান শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজ অনেকটা সেই রকম। এমন কি পল্লীসমাজের "সমাজ"ও নিতান্তই গৌণ, কেননা সেখানে সমাজ স্বতন্ত্র সত্তা বা শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। পল্লীসমাজের পল্লী-পরিবেশ রমা-রমেশের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত। পল্লীসমাজের বিষয় খানিকটা বাস্তব ঘটনা হইতে নেওয়া বলিয়া শরৎচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। তবে কল্পনাও অনেকখানি। চিঠির নজীর উদ্ধৃত করি।

> এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত, খ্যাতিও তত।…জানি এও টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যেয় জড়ানো।[৩]

[১] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', পৃ ২৯১।
[২] ঐ পৃ ৩২৯। [৩] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', পৃ ২৩৩।

১১

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির প্রধান গুণ সরলতা ও মনোহারিতা। তাঁহার গল্প-উপন্যাসের উপক্রম যেমন একেবারে কাহিনীর অন্তঃপুরে পাঠককে পৌছাইয়া দেয় তাঁহার লেখার ভঙ্গিও তেমনি অজানিতে বুদ্ধির চৌকাটের হোঁচট এড়াইয়া দেয়। কাহিনীর অতর্কিত আরম্ভ রবীন্দ্রনাথের গল্প হইতে নেওয়া। যেমন, "বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এই যে মাসী, রমা কই গা' ?" —পল্লীসমাজের এই আরম্ভের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ'এর উপক্রম—"বৃন্দাবন কুণ্ডু মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—'আমি এখনি চলিলাম'।"

রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম প্রভাব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের রচনারীতির স্বকীয়তা স্বীকার্য। কিন্তু অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অত্যন্ত বেমানান হইয়াছে। যেমন, চরিত্রহীনে সতীশ কথা বলিয়া (গোরার পরেশবাবুর মত) "ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।" "অকস্মাৎ লব্ধ নূতন চেতনার মত এই একটা কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল।"

আসল কথা, কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং বর্ণনায় শরৎচন্দ্র যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্তির ও রসসৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকার্যে নৈপুণ্যের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট নয়।

শরৎচন্দ্র সজ্ঞান শিল্পী। কোন পথে তাঁহার শিল্পের সার্থক প্রয়োগ তাহা তিনি সর্বদা মনে রাখিতেন। পড়িয়া পাঠকের তৎক্ষণাৎ ভালো লাগিবে এবং সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে নিজের জীবনের ভালো লাগার মিল খুঁজিয়া পাইবে—ইহাই শরৎচন্দ্রের শিল্পের উদ্দিষ্ট। অতএব ট্র্যাজেডির ধার দিয়াও তিনি যান নাই। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি।

> গল্প পারতপক্ষে ট্রাজেডি করতে নেই।...গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ ?" তবে আবার গল্প কি ? আমি এই লাইনে চল্‌ছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ ক'রে একটা আনন্দ হয়—শেষ ক'রে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাস বাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে"। এই সমালোচনাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।[১]

> পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি ?[২]

[১] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', পৃ ৪২-৪৩। [২] ঐ পৃ ৯১।

আমার ছোটগল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।[১]

গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়।...বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়।[২]

গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে বলে প্লট তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নেই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়।[৩]

১২

বাঙ্গালার সিদ্ধ উপন্যাসরীতিকে কালোপযোগী, ঘরোয়া এবং ভাবালু রূপ দিয়া উপস্থাপিত করিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার গল্পকাহিনীতে প্রণয় ও প্রীতি-রস জমিয়া উঠিয়াছে মান-অভিমানের পালায়, প্রত্যাখ্যান-সমাদরের পর্যায়ক্রমে। শরৎচন্দ্রের প্লট রচনার এই বিশেষত্ব অল্পবিস্তর দেখা গেল এমন কয়েকজন সমসাময়িক লেখক-লেখিকার রচনায় যাঁহাদের বলা যাইতে পারে শরৎচন্দ্রের কৈশোর-ভাবশিষ্য। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন কাটিয়াছিল ভাগলপুরে, এইখানে ইঁহার সাহিত্যিক জীবনেরও আরম্ভ। তাঁহার বয়স যখন আঠারো-কুড়ি তখন তিনি ও তাঁহার সমবয়সী কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু মিলিয়া একটি সাহিত্যচর্চার ছেলেমানুষি আসর ও আড্ডা জমাইয়াছিলেন।[৪] সে আসরে ও আড্ডায় যে গল্প ও কবিতা পড়া হইত তাহা হাতেলেখা পত্রিকা 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত।[৫] কোন না কোন সময়ে এই আসরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যাঁহারা তাঁহারা প্রায় সকলেই পরে গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। যেমন,—

[১] 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', পৃ ১১৩। [২] ঐ পৃ ১৯৩। [৩] ঐ পৃ ২০৫।

[৪] শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি ছিলাম সভাপতি কিন্তু আমাদের সাহিত্যসভায় গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জন মাঠেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে-দেশে সাহিত্য-চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল।" 'ছোটদের মাধুকরী আশ্বিন ১৩৪৫' হইতে 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে উদ্ধৃত, পৃ ২৭৬।

[৫] "গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলি-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর।" ঐ।

গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৫৪) ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮১),[১] শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং তাঁহার ভগিনী নিরুপমা দেবী। আরো একজন আত্মীয় ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই দলে ছিলেন। ইঁহার গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৩১৪ সালের প্রথম কুন্তলীন-পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। গল্পটিতে শরৎচন্দ্রের হাত থাকা সম্ভব। এই লেখক-লেখিকারা, মায় শরৎচন্দ্র, সকলেই ভারতী পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলেই কুন্তলীন-পুরস্কৃত—ইহা লক্ষণীয়। সৌরীন্দ্রমোহনের কথা আগে বলিয়াছি। শরৎচন্দ্রের প্রভাবে পড়িয়া দাম্পত্য মান-অভিমানের পালা গাহিয়াছেন ইনি 'আঁধি' উপন্যাসে।[২] শরৎচন্দ্রের লেখা সভায় পড়া হইত অথবা তাঁহার রচনার খাতা এবং 'ছায়া' সভ্যদের হাতে হাতে ফিরিত। এই সূত্রে ইঁহারা সকলেই শরৎচন্দ্রের তদানীন্তন রচনাবলী পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাই ইঁহাদের কোন কোন গল্প-উপন্যাস কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের রচনাপরিচিতির পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়॥

১৩

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা ('মন্দির') সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রেরিত হইয়া কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল। ইহার স্বরচিত (?) প্রথম দুইটি রচনা ১৩১৪ ও ১৩১৫ সালে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ইনি যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রথম 'বৈরাগ-যোগ'।[৩] উল্লেখযোগ্য অপর উপন্যাস 'স্মৃতির আলো' (১৯২৮) 'মৃগ-তৃষ্ণা' (১৯৩১) ও 'পূর্বরাগ' (১৯৩৪)। গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প দুই চারিটি ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[৪] ইঁহার গল্পের বই 'মঞ্জরী' (১৯১২) ও 'বিজলী'। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ১৩১৪ সালের ভারতীতে ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর দুই একটি গল্প বাহির হইয়াছিল।[৫] তিন গাঙ্গুলীর মধ্যে উপেন্দ্রনাথই পরে সাহিত্যসাধনায় একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকার

[১] এই তিনজন শরৎচন্দ্রের নিকট-আত্মীয়। [২] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৮। [৩] প্রথম প্রকাশ মানসী ও মর্মবাণীতে।

[৪] যেমন, 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৪), 'বাগানবাড়ীর কথা' (১৩১৮)।

[৫] যেমন, 'বিভ্রম' (চৈত্র ১৩১৮)।

সম্পাদক রূপে (১৩৩৪-৪৭) এবং বহু সুখপাঠ্য গল্প-উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে ইনি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। উপেন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার প্রথম জীবনের সহযোগীদের প্রভাব খুব কম এবং ইঁহার উপন্যাস আলোচ্য কালের সীমানায় পড়ে না। সুতরাং ইঁহার লেখার আলোচনা পরে করিতেছি॥

১৪

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল ১৩১৪ সালে ভারতীতে।[১] ইঁহার কয়েকটি গল্প ভগিনী নিরুপমার রচনার সহিত 'অষ্টক' (১৯১৭) নামে সংকলিত হয় (১৩২৪)। তাহার পর বাহির হয় বড় গল্প (বা ছোট উপন্যাস) 'স্বেচ্ছাচারী' (১৯১৭) ও 'সহজিয়া' (১৯২২) এবং ছোটগল্প-সঙ্কলন 'সপ্তপদী' (১৯২৩)। বিভূতিভূষণের রচনা সরল তবে কিছু ভাবুকতার আধিক্য আছে। এইখানে তাঁহার রচনায় ভারতী গোষ্ঠীর প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। স্বেচ্ছাচারীর কাহিনীতে ভাগলপুর সাহিত্যসভার ছাপ আছে। ছোটগল্পের মধ্যে সপ্তপদীর 'হাত দু'খানি' উল্লেখযোগ্য।

সহজিয়াকে লেখক "কাব্য-উপন্যাস" বলিয়াছেন। গল্পবস্তু ক্ষীণ, লেখকের ভগিনী নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী'র কাহিনীর সঙ্গে একটু মিল আছে। লেখক চেষ্টা করিয়াছেন বাউল-সহজিয়ার সঙ্গে যোগী-সন্ন্যাসীর সাধনার এবং তাহার সঙ্গে নিরাসক্ত গৃহীর জীবনের সঙ্গে মিল করিয়া দিতে। গোড়ার দিকে যে সহজিয়া বোষ্টম-বোষ্টমীর চিত্রটি আছে তাহা দুর্লভ এবং খাঁটি। কথ্যভাষায় লেখা, ঝরঝরে রচনা তবে কিছু উচ্ছ্বাস-কণ্টকিত॥

১৫

শরৎচন্দ্র হইতে ভাগলপুরের দলের জোটবাঁধা। তাহারও আগে একজনের নাম করিতে পারি যদিও তিনি কোন সাহিত্যগোষ্ঠী বাঁধেন নাই। ইনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। (ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র শরৎচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী "ইন্দ্রনাথ"।) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ধরিলে বৃহত্তর 'বিহারের সাহিত্যচক্র'ও বলিতে পারি।

১ 'বাল্মীকির সীতা'।

ভাগলপুরের দলের লেখিকারা লেখকদের আগেই উপন্যাস লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)। ভারতীতে (১৩১৪) ইঁহার গল্প বাহির হইবার অনেক আগেই ইঁহার রচনা কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল। অনুরূপার উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১) ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে বাহির হয় (১৩১৭-১৮), এবং এই বইখানিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার শুরু। তাহার পর অচিরকাল মধ্যে 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫)[১] ও 'বাগ্‌দত্তা' (১৯১৪)[২] বাহির হইল এবং তাহার পর 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫)[৩], 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০)[৪] ইত্যাদি বাহির হইতে লাগিল। পোষ্যপুত্রের প্লটে বিদেশি প্রভাব আছে। জ্যোতিহারায় রবীন্দ্রনাথের গোরার ছাপ পড়িয়াছে। মন্ত্রশক্তিতে শরৎচন্দ্রের মন্দির গল্পেরই অনুসরণ।

অনুরূপা অনেক (পঁচিশখানারও বেশি) উপন্যাস এবং কিছু কিছু গল্প ও নাটক[৫] লিখিয়াছেন। উপন্যাস সবই গার্হস্থ্য বা পারিবারিক নয়, ঐতিহাসিকও আছে। বিস্তর এবং ভালো লেখা সত্ত্বেও অনুরূপার রচনায় ক্রমবিকাশের (অথবা ক্রমাবনতির) পরিচয় নাই। প্লট অযথা ফেনানো ও জটিল এবং বর্ণনার আড়ম্বর বিরক্তিকর। উপন্যাস লিখিতে গিয়া লেখিকা ভুলিতে পারেন নাই যে তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, পাণ্ডিত্যের আস্ফালন উপন্যাসে শোভা পায় না, এবং প্রাচীন পন্থার ও রক্ষণশীলতার সমর্থন তাঁহার কাজ নয়। একথা যদি ভুলিতেন তবে তাঁহার হাতে বাঙ্গালা উপন্যাসের মর্যাদা বাড়িত।[৬]

অনুরূপার অগ্রজা ইন্দিরা[৭] (১৮৮৯-১৯২২) সুলেখিকা ছিলেন। ১৩০৯

[১] এই বইখানিই প্রথমরচিত উপন্যাস, 'দ্বিপত্নীক' নামে ধারাবাহিক ভাবে 'সুপ্রভাত' (১৩২২) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। [২] প্রথম প্রকাশ ভারতী ১৩১৯-২০। [৩] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষ ১৩২০-২১। [৪] ঐ ১৩২৫-২৭। [৫] নাট্যরচনা এইগুলি—'বিদ্যারণ্য' (১৯২০), 'কুমারিল ভট্ট' (১৯২৩) ও 'নাট্যচতুষ্টয়' (১৯৩৩)।

[৬] শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধে ('নারীর লেখা', যমুনা ফাল্গুন ১৩১৯, "শ্রীমতী অনিলা দেবী" নামে প্রকাশিত) অনুরূপার পোষ্যপুত্রের সম্বন্ধে কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলেন। "...বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্‌স, মেটাফিজিক্‌স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ সমস্তই আছে। এ ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী—কালিদাস, সেক্‌সপিয়র, টেনিসন—যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই।... অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক হইয়াও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের বহরে লোকজনের তাক্ লাগাইয়া দিব এই স্পিরিট্‌টাই নিন্দার্হ।"

[৭] ইঁহার আসল নাম ছিল সুরূপা। এই নামে লেখা গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার পাইয়াছিল একাধিকবার। ১৩২০ সাল হইতে ইনি লেখিকারূপে ইন্দিরা নাম গ্রহণ করেন।

হইতে ইঁহার গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার পাইতে থাকে এবং ১৩১৪ সাল হইতে ভারতীতে ইঁহার গল্প বাহির হইতে থাকে। 'নির্মাল্য' (১৯১৫), 'কেতকী' (১৯১৫) ও 'ফুলের তোড়া' (১৯১৮) ইঁহার গল্পের বই। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'সৌধরহস্য'[১] কোনান্ ডয়েলের 'দি মিষ্ট্রি অব্ ক্লুম্বার'এর (*The Mystery of Cloomber*) অনুবাদ। 'স্পর্শমণি'[২] ইঁহার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মৌলিক উপন্যাস। ঘরোয়া পরিবেশের চিত্রণে বেশ নিপুণতার পরিচয় আছে। লেখার ভঙ্গি সহজ এবং আড়ম্বরবর্জিত ॥

১৬

উপন্যাস-রচনায় নিরুপমা দেবীর[৩] (১৮৮৩-১৯৫১) স্বগমতা গোড়া থেকেই পরিস্ফুট। ছোটগল্পে ইঁহার কৃতিত্ব তত উজ্জ্বল নয়, ছোটগল্প ইনি বেশি লিখেনও নাই। কয়েকটি গল্প অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্টের রচনার সঙ্গে 'অষ্টক' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৭)। ইঁহার নিজস্ব গল্পের বই 'আলেয়া' (১৯১৭)।

নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির'এর (১৯১৩)[৪] প্লট শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' গল্পের ছায়াবহ। শরৎচন্দ্রের গল্পটি নিরুপমার উপন্যাসের একবছর পরে বাহির হইয়াছিল[৫], তবে রচনাকাল নিশ্চয়ই কিছু আগে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিদি' (১৯১৫) প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া (১৩১৯-২০) সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্লটের পরিকল্পনা সরল ও ও স্বচ্ছন্দ, রচনারীতি নিরাড়ম্বর ও অবাধগতি। কাহিনীটিকে বিষবৃক্ষের কালোপযোগী রূপান্তর বলিতে পারি। দিদির কাহিনীসূত্র ধরিয়া নিরুপমা পূর্বে দুইটি গল্প লিখিয়াছিলেন, 'বিস্মৃত স্মৃতি' ও 'গুরুদক্ষিণা'।[৬] তাহার পরে একে একে বাহির হইল 'বিধিলিপি' (১৯১৭),[৭] 'শ্যামলী' (১৯১৮)[৮], 'বন্ধু'

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী। [২] প্রথম প্রকাশ মানসী ও মর্মবাণী ১৩২৪-২৫।

[৩] ইঁহার আসল নাম অনুপমা। ১৩১৫ সালের মাঘ মাস হইতে (ভারতী, 'শেফালিকা') নিরুপমা নাম গৃহীত হইয়াছিল। কুন্তলীন-পুরস্কারে (১৩১১), জাহ্নবীতে (মাঘ ১৩১৪) এবং ভারতীতে (১৩১৫ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত গল্পে অনুপমা নামই পাই। [৪] প্রথম প্রকাশ ভারতী কার্তিক হইতে চৈত্র ১৩১৮। [৫] প্রথম প্রকাশ সাহিত্য চৈত্র ১৩২০, ভারতী ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ ১৩১৫। [৬] দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই।

[৭] প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষে। [৮] প্রথম প্রকাশ প্রবাসীতে।

(১৩২৮), 'উচ্ছৃঙ্খল' (১৩২৭), 'পরের ছেলে' (১৩৩১)[১], 'আমার ডায়েরি' (১৩৩৪), 'দেবত্র' (১৩৩৪) ইত্যাদি। বন্ধুর কাহিনী-পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকলতার ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের আলেয়ার-আলোর প্লটের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। রাজেন্দ্র ও অমলা ভূমিকা ভাগলপুরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হওয়া সম্ভব।

নিরুপমার উপন্যাসের গঠন সরল ও গতি স্বচ্ছন্দ। ভাগলপুরের দলের রচনায় ঘরোয়া মান-অভিমানের পালাই জমিয়াছে বেশি। নিরুপমার উপন্যাসে সে মান-অভিমানের বাড়াবাড়ি নাই। স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা, দুর্ভাগিনী নারীর মর্ম-বেদনার প্রকাশই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। লেখিকা নারীহৃদয়ের ব্যর্থতাকে মিলনের সস্তা উপায়ে মিটাইয়া না দিয়া বাৎসল্যের ও ত্যাগের মহত্তর পরিণামে সার্থক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিরুপমার উপন্যাসে হয়তো গভীরতা নাই, তবে লেখিকার সংবেদনশীল হৃদয়ের ছাপ আছে। সেই কারণে এবং রচনার প্রসন্নতার জন্য সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে নিরুপমার নিজস্বতা সবিশেষ পরিস্ফুট ॥[২]

১৭

ভাগলপুরের দলের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলেও এইসঙ্গে আর এক লেখিকার প্রসঙ্গ উঠে। ইনি শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া (জন্ম ১৮৯৪)। ইঁহাকে প্রথমেই পাই গল্প-লেখিকারূপে। ইঁহার একটি গল্প প্রবাসীর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিল (১৩২২)। শৈলবালা তাঁহার প্রথম সম্পূর্ণ প্রকাশিত উপন্যাস 'সেখ আন্দু'র (১৯১৭)[৩] প্লটে একটু বিশেষরকম স্বাধীনতা ও সাহসিকতা দেখাইলেন। উপন্যাসের অস্ফুট ও রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর নায়ক মুসলমান ড্রাইভার, নায়িকা হিন্দু মনিবকন্যা। মুসলমান-ঘরের সরস কাহিনী 'মিষ্টি সরবৎ' (১৯২০) ও 'অবাক' (১৯২৫)। এখানেও লেখিকার উদার সাহসের পরিচয়। 'নমিতা' (১৯১৮)।[৪] ইঁহার প্রথম-রচিত উপন্যাসের অন্যতম। অপর উপন্যাস 'জন্ম অপরাধী' (১৯২০), 'জন্ম অভিশপ্তা' (১৯২১), 'মঙ্গলমঠ' (১৯২১),

১ প্রথমপ্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১৩২৯ হইতে।

২ 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র নিরুপমার অন্নপূর্ণার-মন্দিরের প্রশংসাই করিয়াছেন, "...নিরুপমার রচনাকে অনেক দিক্ হইতে ভাল বলিতেই হইবে। সহজ, সরল ও বিনীত। যাকে 'পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার' বলে সেটা নাই, এবং স্টেজ আস্ফালনিও কম। কথাবার্তাগুলি কথাবার্তারই মত।" ৩ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩২২। ৪ অংশত বামাবোধিনী-পত্রিকায় প্রথমপ্রকাশিত।

'ইমানদার' (১৯২২), 'মহিমাদেবী' (১৩২৭) ইত্যাদি। 'অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি' গল্পের বই। শৈলবালার গ্রন্থসংখ্যা তিরিশের উর্ধ্বে।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভাগলপুরের দলের মধ্যে ছিলেন না, তবে ঐ অঞ্চলেরই লোক এবং শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মীয়। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও মানসী-ও-মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত ইঁহার দশটি গল্প 'বেহার-চিত্র (প্রথম খণ্ড)' [১] নামে প্রকাশিত হয় (১৯২১)। গল্পগুলিতে সেকালের বিহার অঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত খয়ের-খাঁ ও হামবড়া জাতীয় ব্যক্তির সরস পরিচয় পাই। এ পরিচয়ের বাস্তবতা সন্দেহের অতীত। 'নিবেদন'এ লেখক বলিয়াছেন,

> যখন এই চিত্রগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন কোন কোন পাঠক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, আমি এইসকল চিত্রে বেহারী-চরিত্রের কেবল "অন্ধকার অংশ" মাত্র চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের অপদস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরা পুরুষানুক্রমে বেহার-নিবাসী। বেহার আমাদের মাতৃভূমিতে পরিণত।
>
> অন্যান্য সকল প্রদেশের মত বেহারও এখন একাগ্রচিত্তে উন্নতিপ্রয়াসী। সুতরাং এই সময়ে আমি বন্ধুভাবে বেহারবাসীর চরিত্রের অপূর্ণতাগুলি হাস্যরসের আবরণে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যতীন্দ্রমোহনের অপর গল্পের বই—'দূর্বাদল' (১৩২৩), 'বিল্বদল', 'পুষ্পদল' ইত্যাদি॥

১৮

বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক বাঙ্গালায় নারী ঔপন্যাসিকদের স্বর্ণযুগ বলা চলে। নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্ত শৈলবালা ঘোষজায়া ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও আরো কয়েকজনকে পাই যাঁহারা গল্প-উপন্যাস লিখিয়া অল্প বয়সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাহারো কাহারো লেখনী এখনো বেশ সচল।

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী (জন্ম ১৮৯৪) ও শ্রীযুক্তা সীতা দেবী (জন্ম ১৮৯৫)—দুই ভগিনীর যুগ্মচেষ্টার প্রথম ফল শ্রীশচন্দ্র বসুর সঙ্কলন *Tales of Hindoostan*-এর অনুবাদ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' (১৯১২) প্রথম রচনার পর্যায়ে পড়ে। তাহার অনেককাল পরে প্রবাসী পত্রিকায় "শ্রীসংযুক্তা দেবী" এই ছদ্মনামে 'উদ্যানলতা' (১৩২৬) উপন্যাস বাহির হয়। যুক্তপ্রয়াস এইখানেই শেষ। দুই ভগিনীই

অনেকগুলি ছোট-গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবং সেগুলি প্রধানত প্রবাসীতে প্রথম বাহির হইয়াছিল। শান্তা দেবীর রচনা—'উষসী' (১৩২৪, গল্প), 'স্মৃতির সৌরভ' (১৩২৫), 'সিঁথির সিঁদুর' (১৩২৬, গল্প), 'চিরন্তনী' (১২২৮), 'জীবনদোলা' (১৩৩৭) ইত্যাদি। সীতা দেবীর রচনা—'বজ্রমণি' (১৩২৫, গল্প), 'ছায়াবীথি' (১৩২৬), 'পথিকবন্ধু' (১৩২৭), 'সোনার খাঁচা' (১৩২৭), 'আলোর আড়াল' (১৩২৮, গল্প), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮), 'পরভৃতিকা' (১৩৩০) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী (জন্ম ১৮৯১) 'তৃণগুচ্ছ' (১৩২৯, গল্প), 'রূপহীনা' (১৩৩২), 'হিন্দুর মেয়ে' (১৩৩৭), 'দানপ্রতিদান' (১৩৪৪), 'খণ্ড মেঘ' (১৩৫২) ইত্যাদির রচয়িত্রী।

সরসীবালা বসুর গল্প-উপন্যাসে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সারল্য লক্ষণীয়। ইঁহার উপন্যাস—'প্রায়শ্চিত্ত', 'শিবানী', 'শুকতারা' (১৯২২), 'রেবা' (১৯২২) ইত্যাদি ; গল্পের বই—'শ্রেয়সী', 'মিলন'(১৯২১) ইত্যাদি।

সুরুচিবালা রায় যেসব গল্প-কাহিনী লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মর্ম্মস্মৃতি' (১৯১৯), 'ঝরাপাতা' ও 'আহুতি'।

মুসলমান সংসারের চিত্রঘটিত উপন্যাস লেখায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন 'মতিচুর'এর লেখিকা মিসেস আর. এস. হোসেন, 'অপরিচিতা'র লেখক মনির হোসেন, 'গরীবের মেয়ে'র লেখক নজিবর রহমান।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (জন্ম ১৯০৫) শতাধিক উপন্যাসের রচয়িত্রী। ইঁহার প্রথমদিকের রচনা—'অম্বা' (১৩২৯), 'আয়ুষ্মতী' (১৩৩০), 'আমার কথা' (১৩৩১), 'জাগরণ' (১৩৩৩) ইত্যাদি। উপন্যাস-রচনা যে ইতিমধ্যেই ইন্ডাস্ট্রিতে পর্যবসিত হইয়াছে প্রভাবতী দেবীর রচনার অজস্রতা তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ॥

১৯

কয়েকজন প্রবীণ লেখক বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকেও উনবিংশ শতাব্দীর নভেলের জের টানিয়া চলিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৭— ?), শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯-১৯৪৪), প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।[১]

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রায় সত্তরখানি উপন্যাস গ্রন্থের প্রণেতা। ইঁহার কয়েকখানি বই বহুকাল অবধি "বেষ্ট-সেলার" হইয়াছিল এবং দু-একখানি এখনো ছাপা হয়। যেমন 'লোহার বাঁধন' (১৯০৪) ও 'মিলন-মন্দির' (১৯১১)। অপর উপন্যাস—'কুলীনকুমারী' (১৯০০), 'ভিখারিণী' (১৯০০), 'মায়াবিনী' (১৯০১), 'প্রেম-উন্মাদিনী' (১৯০২), 'পাষাণময়ী' (১৯০৩), 'লুকোচুরী' (১৯০৩), 'সোনার কণ্ঠী' (১৯০৪), 'নারীবলি' (১৯০৬), 'লাল পল্টন' (১৯১১), 'কুলুইচণ্ডী' (১৯১৯), 'বোধনবাড়ী' (১৯২৩), 'প্রেমের বাঁধন' (১৯২৯) ইত্যাদি। রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক প্রেমকাহিনী হইতে রোমাঞ্চক ও যোগ-হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ পর্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ যায় নাই ইঁহার উপন্যাসের আওতা হইতে।

যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রায় বিশখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসও আছে। যদুনাথের উপন্যাস—'সুশীলা ও সরলা' (১৯০১), 'কমলা' (১৯০২), 'পাঁচুঠাকুর' (১৯০৪), 'কর্মবীর' (১৯০৬), 'কালাপাহাড়' (১৯০৭), 'লক্ষ্মী বৌমা' (১৯০৯), 'সোনার সংসার' (১৯০৯), 'রাজা শত্রুজিৎ সিংহ' (১৯১২), 'রাজা দেবলরায়' (১৯১৩), 'বক্তিয়ার খিলিজি' (১৯১৫), 'দুই ভ্রাতা' (১৯১৬), 'রাজা শচীপতি রায়' (১৯১৭) ইত্যাদি। 'পাঁচ ফুল' (১৯১৪) গল্পের বই।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার। ইঁহার অধিকাংশ উপন্যাস ঐতিহাসিক—'বীরপূজা', 'বাঙ্গালীর বল' (১৯০৬), 'রাজা গণেশ', 'অমরনাথ', 'রাণী ব্রজসুন্দরী' (১৯১৮), 'মেঘমালা' (১৯৩৭) ইত্যাদি। 'বারিবাহিনী' (১৯১৯) বঙ্কিম-আরব্ধ কাহিনীর উপন্যাসরূপ।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত বহু উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'রাণী ভবানী' (১৯০৩) ইত্যাদি।

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সংখ্যা বিশ-বাইশের বেশি। যেমন, 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'নবীনা জননী', 'রাজপুতের মেয়ে' (১৯২০), 'দেবতার দান' (১৮২২), 'মিলন শঙ্খ' (১৯২৫) ইত্যাদি।

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২২১।

সত্যচরণ মিত্র লিখিয়াছিলেন 'বড় বৌ বা সুধাবৃক্ষ' (১৮৯২), 'আকাশগঙ্গা' (১৯০২) ইত্যাদি।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'এর (১৮৯৬) লেখক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ভারতী সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ছিলেন। ইঁহার 'রামায়ণী কথা' (১৩১১) উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনা। রূপকথা অবলম্বন করিয়া ইনি একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'তিনবন্ধু' (১৯১১)। পরবর্তী কালে ইনি আরও কিছু গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। গল্পের বই—'গায়ে হলুদ' (১৯২০), 'লতিকা' (১৯২২), 'ভয়ভাঙ্গা' (১৯২৩), 'দেশমঙ্গল' (১৯২৪); উপন্যাস—'আলোকে আঁধারে' (১৯২৫), 'চাকুরীর বিড়ম্বনা' (১৯২৬), 'শ্যামল ও কজ্জল' (১৯৩৮) ইত্যাদি। 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৯২২) আত্মজীবনীমূলক ॥

২০

আরও অনেক লেখক গল্প-উপন্যাস লিখিয়া অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (১৮৭০-১৯৪২) 'ঋণপরিশোধ' (১৯০৯) প্রভৃতি প্রায় তিরিশখানি বই লিখিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার প্রচার ইঁহার রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু, 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৮৮১-১৯৩৯) অন্যূন একুশ-বাইশখানি গল্প-উপন্যাসের বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম গল্পের বই 'সই-মা' (১৯১৫) প্রশংসিত হইয়াছিল। উপন্যাসের মধ্যে 'ইন্দুমতী', 'স্বামীর ভিটা' ও 'ছোট বউ' (১৯১৬) জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইঁহার অপর গল্পের বই—'সুকুমার', 'অকৃতজ্ঞ', 'সম্পত্তি রক্ষা' ও 'ভৌতিক কাহিনী'; উপন্যাস—'পুষ্পরাণী', 'অণিমা', 'জীবন্তসমাধি', 'নারী', 'মধুমিলন', 'ময়ূরপুচ্ছ', 'ফিরে পাওয়া', 'মণিকাঞ্চন' (১৯২৩) ইত্যাদি। যতীন্দ্রনাথ পাল প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'মিলন' (১৯২৩), 'বিধির বিধি' (১৯২৪) ইত্যাদি। বিজয়রত্ন মজুমদারের (১৮৯৪-১৯৩৫) উপন্যাস বইয়ের সংখ্যা তিরিশের ঊর্ধ্বে। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবনের সাধ', 'নিখিলের শান্তি', 'বিশ্বনাথের দরবারে' ইত্যাদি প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি বই লিখিয়াছিলেন। শ্রীপতিমোহন ঘোষ লিখিয়াছিলেন 'দেনমোহর', 'বন্দিনী', 'বিজয়িনী', 'সাধের বিয়ে' ইত্যাদি। প্রফুল্লচন্দ্র বসু 'অঙ্গহীনা', 'বিয়ের কনে', 'বৈরাগী ঠাকুর', 'রাজা বর', 'সুরের হাওয়া' ইত্যাদির লেখক। হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিয়াছিলেন 'গৃহলক্ষ্মী', 'পল্লীমোড়ল', 'পরাধীনা', 'মুগ্ধা' ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ (জন্ম ১৮৯৫) লিখিয়াছেন 'মণ্টুর মা' (১৯২২), 'ছন্নছাড়া' (১৯২৪), 'হিন্দুর বৌ' (১৯২৬) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য (জন্ম ১৮৮৯) মানসী-ও-মর্মবাণীর প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'হাসি ও অশ্রু' (১৯১৮), 'কালো বৌ' (১৯২৩), 'পাথরের দাম' (১৯২৩), 'প্রেমের মূল্য' (১৯২৪), 'বন্ধু' (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৪৪), 'মিলন' (১৯৩৯) ইত্যাদি ; উপন্যাস—'চির-অপরাধী' (১৯২০), 'অপূর্ণ' (১৯২৪), 'অশ্রুনির্ঝর' (১৯২৫), 'প্রশান্ত' (১৯২৫), 'অদৃষ্টের খেলা' (১৯৩০), 'স্বয়ংবরা' (১৯৩৩, দ্বি-স ১৯৪৫), 'স্মৃতির মূল্য' (১৯৩৪) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রও (জন্ম ১৮৮০) প্রধানত মানসী-ও-মর্মবাণীতে লিখিতেন। ইঁহার গল্পের বই—'নীলাম্বরী' (১৯১২), 'কানের ভুল' (১৯২১), 'বিবি বৌ' (১৯২৬) ও 'সারি' (১৯২৯); উপন্যাস—'রূপতৃষ্ণা' (১৯২৮); প্রবন্ধের বই—'সুখ ও দুঃখ' (১৯৩২) ইত্যাদি।

সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) লিখিয়াছিলেন দুইখানি গল্পের বই—'সতীর জেদ' (১৯২৪) ও 'দুই চিঠি' (১৯২৮); একটি প্রবন্ধের বই—'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' (১৯১৫); দুইটি হাল্‌কা কবিতার বই—'ঝলক' (১৯২৩) ও 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) এবং তিনখানি নাট্যরচনা—'নাটিকাগুচ্ছ' (১৯২৯), 'হাটে হাঁড়ি' (১৯২৯, দ্বি-স ১৯৪৯) ও 'অগ্নিশিখা' (১৯৩০)।

ভবানীচরণ ঘোষের (১৮৬২-১৯২৫) উল্লেখ আগে করিয়াছি। ইনি লিখিয়াছিলেন 'পরিণয় কাহিনী' (১৯০৩), 'উৎপলা' ইত্যাদি। নবকৃষ্ণ ঘোষ 'মনের দাগ', 'পথহারা' (১৯১৭) ইত্যাদি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 'নাচওয়ালী', 'দামোদরের বিপত্তি' ইত্যাদির রচয়িতা। উপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছিলেন 'নকল পাঞ্জাবী' (১৯১৭) ইত্যাদি। মনোমোহন রায় লিখিয়াছিলেন 'মণিমালা', 'সতীর মূল্য' ইত্যাদি। বিধুভূষণ বসু 'সতীলক্ষ্মী', 'জ্যাঠাই মা', 'নষ্টোদ্ধার', 'লক্ষ্মী মা' ইত্যাদির লেখক।

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত 'প্রহেলিকা' (১৩২৪, দ্বি-স ?) ও 'জঞ্জাল' উপন্যাসের, 'সনাতনী' (১৯৩২) গল্পগ্রন্থের এবং 'সন্ধান' ও 'যুগমানব' নামক চিন্তাগর্ভ

প্রবন্ধগুচ্ছের লেখক। 'প্রহেলিকা' বাঙ্গালায় বৃহত্তম উপন্যাসের অন্যতম। এটির সাময়িক সমাদর হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী (জন্ম ১৮৯৫) 'ব্যথা' (১৯১৫), 'স্বপ্নশেষ' (১৯৩০), 'সেতু' (১৯৩৪) ও 'বহুরূপী' (১৯৩৭) গল্পের বই আর 'ঘরের ডাক' (১৯২১), 'বৃন্তচ্যুত' (১৯২২), 'আশীর্বাদ' (১৯২২) ও 'ঘূর্ণি' (১৯২৯) উপন্যাস লিখিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল 'বারুণী' (১৯১৫) ইত্যাদি তিনখানি বইয়ের লেখক।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত অনেকদিন হইতে লিখিতেছেন। ইঁহার গল্পের বই সাত-আটখানি—'কনকরেখা' (১৯১৪), 'হিসাবনিকাশ' (১৯১৮), 'আসমানের ফুল' (১৯২০), 'কটাক্ষ' (১৯২২) ইত্যাদি; উপন্যাস—'লাল তুম্বা' (১৯৩৬), 'বিদ্রোহী তরুণ' (১৯৩৭), 'হামজুল্লি' (১৯৪০) ইত্যাদি। 'হুদ্দাদার' ইত্যাদির লেখক তারকনাথ সাধুও সৌরীন্দ্রমোহন ও কেশবচন্দ্রের মত কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকীল ছিলেন।

বঙ্কুবিহারী ধর পাঁচ-ছয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'কাকীমা' (১৯১৪), 'কনে মা' (১৯২২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৭৬-১৯৫৪) লিখিয়াছিলেন 'শুভেন্দুর কলঙ্ক', 'দেশের বড়দা' (১৯১৭), 'নবীনের সংসার' (দ্বি-স ১৯২৮), 'জলপ্লাবন', 'সোনার বাঁধন' (বইটির অন্তত সাত সংস্করণ হইয়াছিল, বোধহয় বিবাহে উপহারের উপযোগিতার জন্য), 'হালদার বাড়ী' ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত অপূর্বমণি দত্ত (জন্ম ১৮৯৪) মানসী-ও-মর্মবাণী প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইঁহার তিনটি মাত্র বই এযাবৎ বাহির হইয়াছে। 'অভ্রপুষ্প' (১০২২) গল্পের বই; 'সিদ্ধিকবচ' (১৯২২) ও 'সোনার শাঁখা' (১৯৪৪) উপন্যাস।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উল্লেখ আগে করা গিয়াছে।[১] ইঁহার গল্প-উপন্যাসের বই—'অশ্রুময়', 'গৌরী', ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল (জন্ম ১৮৯৫) 'আগাছা' (১৯৩১), 'দিদির বর' (১৯৩১) ইত্যাদির লেখক। ইঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল (জন্ম

[১] পৃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

১৮৯৮) লিখিয়াছেন 'গৃহকল্যাণী' (১৯২০), 'ঝড়ের আলো' (১৯২৪), 'ঘূর্ণি' (১৯৩২) ইত্যাদি।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৬) পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের লেখক। ইঁহার গল্পের বই—'দুঃখের পাঁচালী' (১৯৩৭), 'হুইপ' (১৯৪০) ইত্যাদি; উপন্যাস—'কুমারী ইন্দিরা' (১৯০৯), 'তান্তিয়া মহারাজ' (১৯১৬), 'চিত্রকরী' (১৯১৪), 'স্বয়ংসিদ্ধা' (১৯৩৭) ইত্যাদি; নাটক—'রাণী মীনাবতী' (১৯১২), 'অহল্যাবাই' (১৯১৪), 'মাধবরাও' (১৯১৫), 'বাজীরাও' (১৯৩১) ইত্যাদি।

সত্যচরণ চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন 'গৌরী' (১৯১৮), 'বাঙ্গালী বীর' (১৯১৯) ইত্যাদি; গল্পের বই 'চিত্রকর' (১৯১৮)।

'মীর পরিবার'এর (১৯১৭) ও 'নদীবক্ষে'র লেখক (১৯১৮) কাজী আবদুল (জন্ম ১৮৯৪), 'রূপের নেশা'র লেখক গোলাম মোস্তাফা (জন্ম ১৮৯৭), 'আব্‌দুল্লাহ্'এর (১৯৩১) লেখক কাজী ইমদাদুল হক, 'কাঁটাফুল'এর (১৯৩২) লেখক শাহাদাৎ হোসেন—ইঁহারাও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নুরুন্নেসা খাতুন কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ডিটেক্‌টিভ কাহিনীও আছে। ইঁহার রচনাবলী 'নুরুন্নেছা গ্রন্থাবলী' (১৯২৫) নামে সঙ্কলিত।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯০-৫১) বিশেষ দক্ষতা প্রকাশিত সহজ সরল ভাষায় ছোট গল্পচিত্র রচনায়। সেগুলি 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩১), 'গল্পের মজলিস', 'গুলদাস্তা' 'ভাঙ্গা বাঁশী' ইত্যাদিতে সঙ্কলিত। প্রবন্ধ রচনাতেও ইঁহার দক্ষতা পরিস্ফুট। 'ভবিষ্যতের বাঙালী'র (১৯৪৩, চ-স ১৯৪৬) প্রবন্ধগুলির নাম হইতে প্রবন্ধবিষয়ে বিশেষত্বের ইঙ্গিত মিলিবে—'ভবিষ্যতের বাঙালী', 'রাষ্ট্রের রূপ', 'রাষ্ট্র ও নাগরিক', 'হিন্দু-মুসলমান', 'ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য', 'প্রেমের ধর্ম' ও 'জাতীয় জাগরণ'॥

সবুজপত্রের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

নবম পরিচ্ছেদ

সবুজপত্র ও নবোদ্যম

১

এক অভিনব ও চমকপ্রদ শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় বহন করিয়া প্রমথনাথ[১] চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) গদ্য-পদ্য রচনা বাহির হইল রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তির সমসময়ে অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। বৎসরখানেকের মধ্যেই প্রমথবাবুর সম্পাদিত সবুজপত্র প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায় গতানুগতিকতার উপর মর্মান্তিক ও প্রাণান্তিক আঘাত হানিল। ১৯১৩ সালের আগেও প্রমথবাবুর লেখা অল্পস্বল্প বাহির হইয়াছিল, এবং সে লেখায় স্বাতন্ত্র্য ও প্রচণ্ডতা কিছু কম ছিল না। তবে দীর্ঘকালের ব্যবধানে এক একটি প্রবন্ধ বাহির হইত বলিয়া সে সব রচনা অনেকের নজরে পড়ে নাই। সবুজপত্র বাহির হইবার পূর্বে প্রমথবাবুর রচনা প্রধানত ভারতীতেই ছাপা হইত এবং যতদিন সবুজপত্র জীবিত ছিল ততদিন অন্য কাগজে তাঁহার লেখা ছাপা হয় নাই।

কলম ধরিবার আরম্ভ হইতেই প্রমথবাবু শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্যচিন্তায় চিরাভ্যস্ত অমনস্কতার বিরুদ্ধে তাল ঠুকিতে থাকেন। ইঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[২] দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছিলেন যে ভাব ও ভাষা কোন দিক দিয়াই জয়দেবকে ভালো কবি বলা যায় না, গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শও নাই এবং জয়দেব আমাদের ভালো লাগে শুধু এই কারণে যে আমরা ভুল করিয়া চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনার সঙ্গে জয়দেবের রচনা মিশাইয়া পড়ি ("তাঁহার পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি")।

এই প্রবন্ধের প্রায় চারি বছর পরে সাধনায় (ফাল্গুন ১৩০০) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয়দেব' প্রবন্ধ বাহির হয়। বলেন্দ্রনাথও জয়দেবকে বড় কবি বলিতে পারেন নাই, গীতগোবিন্দকে অধ্যাত্ম-কাব্যও নয়। কিন্তু দুই লেখকের মেজাজ ও আক্রম (approach) ঠিক এক রকম ছিল না। প্রমথবাবু গীতগোবিন্দ-পদাবলী

[১] সবুজপত্র বাহির করিবার আগেই ইনি নামের "নাথ" অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।
[২] সবুজপত্রে (আষাঢ় ১৩২৭) পুনর্মুদ্রিত।

সংস্কৃত শ্লোকের আদর্শে বিচার করিয়াছিলেন, বলেন্দ্রনাথ সেগুলিকে লইয়াছিলেন গান বলিয়া, সেগুলির যথার্থ মূল্যে। কাব্যের প্রারম্ভে জয়দেবের উক্তি স্মরণ করিয়া ("যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্") আদিরসাত্মকতার অভিযোগে গীতগোবিন্দকে বলেন্দ্রনাথ একেবারে নস্যাৎ করেন নাই, তবে স্বীকার করিয়াছেন যে "সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গাররসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।"

এই 'জয়দেব' প্রবন্ধ দুইটিকে লইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রত্যাসন্ন প্রত্যূষে বাঙ্গালা সাহিত্যে জাগরণোন্মুখ দুইটি শক্তির পরিমাণ করিতে পারি। বলেন্দ্রনাথ বয়সে কিছু ছোট তবে সাহিত্যের ভুবনে অগ্রজ। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেককাল পরে প্রমথবাবু সাহিত্যের আসরে রীতিমত অবতীর্ণ হন। দুইজনেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-লালিত, এবং দুইজনেই গৌণত কবিতা-রচয়িতা এবং মুখ্যত গদ্যলেখক। দুইজনেই শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান্, মনীষী। তবে বলেন্দ্রনাথের প্রবল অধিকার সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রমথবাবুর বিশেষ দখল ফরাসী সাহিত্যে। বলেন্দ্রনাথের অনুভব ছিল প্রধানত ধৈর্যশীল ভাবুকের, প্রমথবাবুর অনুভব মূঢ়তা-অসহিষ্ণু বিজ্ঞানীর। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের অর্থাৎ সৃজনের সহযোগী, প্রমথবাবুর প্রবন্ধে বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যানের নির্দেশক।

১২৯৭ হইতে ১৩০৫ সালের মধ্যে জয়দেব ছাড়া প্রমথবাবুর চারিটি গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল,—'আদিম মানব',[১] 'ফুলদানী' (মেরিমে-র ফরাসী গল্পের অনুবাদ),[২] 'টরকোয়াটো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন' (ইতালীয় হইতে অনূদিত)[৩] এবং 'প্রবাসস্মৃতি'[৪]। এই পাঁচটি রচনা সাধুভাষায় লেখা। অতঃপর সাধুভাষায় তাঁহাকে লিখিতে আর দেখি না॥

২

১৩০৯ সালের গোড়াতেই প্রমথবাবু দেখা দিলেন চলিত-ভাষার সমর্থকরূপে।[৫]

[১] সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮। [২] ঐ, আশ্বিন ১২৯৮। [৩] সাধনা, বৈশাখ ১৩০০।

[৪] ভারতী, কার্তিক ১৩০৫ (সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ), লেখকের নাম ছিল না। বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনীটি প্রমথবাবুর গল্প রচনার প্রথম নিদর্শন। রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মাতুলের কাছে শোনা ঘটনাটি লইয়া অনেককাল পরে প্রিয়ম্বদা দেবীও একটি গল্প লিখিয়াছিলেন 'বিগত-বসন্তে' (বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯)।

[৫] 'কথার কথা' ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। বৈশাখ মাসে বাহির হইল 'হালখাতা'; এই প্রবন্ধেই "বীরবল" নাম প্রথম দেখা গেল।

এই সময় হইতে তিনি নিজেও চলিত-ভাষাকে আশ্রয় করিলেন এবং আর প্রায় কখনও সাধুভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।[১] গদ্য রচনায় প্রমথবাবু ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন "বীরবল"। প্রমথবাবু বলিয়াছেন যে তিনি নামটি ভাবিয়া চিন্তিয়া অবলম্বন করেন নাই। না করিলেও নামগ্রহণ সার্থক হইয়াছে। আকবরের সভাসদ্ বীরবলের স্থক্তির মতই যেন তিনি বাক্যে মর্মভেদী সত্যকে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোহারী করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার লেখায় মধু ও হুল দুইই আছে।

…বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ: প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ করে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি; সুতরাং তাঁদের এতে খুশি হবারই কথা।[২]

যখন 'কথার কথা' লেখা হয় তখন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রচলন অধিকতর করিবার জন্য সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতরা ও তাঁহাদের সমর্থকগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এই রকম দুই পণ্ডিত-ভ্রাতার[৩] প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়াই প্রমথবাবু চলতিভাষার ওকালতি শুরু করেন। প্রমথবাবুর "ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়", অর্থাৎ "আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।" সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বা আমদানিতে প্রমথবাবুর আপত্তি নাই; তবে সে সব শব্দকে যদৃচ্ছা ও আনাড়ি ভাবে নয় তাৎপর্যপূর্ণ ও সঙ্গতভাবে ব্যবহার করিলেই ভাষার বোঝা না বাড়িয়া শক্তি বাড়িবে।

এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক জোগাতে হবে। আর, আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে,

দশ-এগার বছর পরে আর দুইটি প্রবন্ধ[৪] বাহির হইল চলিতভাষার সমর্থনে।

[১] উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত 'অভিভাষণ' (সবুজপত্র, ফাল্গুন ১৩২১) সাধুভাষায় লেখা।

[২] 'বীরবল' (সবুজপত্র, চৈত্র ১৩৩০)।

[৩] শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

[৪] 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (ভারতী, পৌষ ১৩১৯), 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' (ঐ, চৈত্র)।

প্রথমটি 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন'এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদ। প্রমথবাবু লিখিলেন, সমালোচনার দ্বারা ভুল দেখাইলেই সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, "সাহিত্যক্ষেত্রে কতকটা আলো এবং হাওয়া এনে দেওয়াই সে স্থানকে স্বাস্থ্যকর করবার প্রকৃষ্ট উপায়।" তেমনি "লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, শুধু ন্যূন অর্থে, অধিক অর্থে কিংবা অনর্থে বাক্য প্রয়োগের বিরোধী।" কথ্যভাষা বলিতে প্রমথবাবু কোন আঞ্চলিক উপভাষাকে ধরেন নাই, ধরিয়াছেন দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষিত লোকের ভাষাকে —যাহার উপর একদা সাধুভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

> লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুসরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লেখকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশি ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের ও মুখের ভাষার ঐক্যসাধন করছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।...ঐ একটি মাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

তবে এ ভাষা খাস "কলকাত্তাই" উপভাষা নয়। "বাঙালে ভাষা কিংবা কলকাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনোটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না।"

৩

চলিতভাষা বনাম সাধুভাষার মামলা যখন চলিতেছে তখন প্রমথ চৌধুরী দেখা দিলেন কবির ভূমিকায়। ১৩১৮-২০ সালের ভারতীতে ইঁহার কতকগুলি সনেট বাহির হইল, জের চলিল সবুজপত্রে। কবিতাগুলি দুইটি বইয়ে সঙ্কলিত হইল, 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদ-চারণ' (১৯১৯)। সমসাময়িক বাঙ্গালা কবিতার (—রবীন্দ্রনাথের ছাড়া—) কৃত্রিম ভাবালুতা, গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনা অথবা বইপড়া তত্ত্বকথার নিরর্থ শব্দপ্রচুর ভাষার এবং শিথিল সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে প্রমথবাবুর প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। শব্দচয়নের শ্রমসাধ্য নিপুণতায়, ভাষা ও ভঙ্গির কঠিন দীপ্তিতে এবং রচনাবন্ধের গাঢ়তায় প্রমথবাবুর সনেটগুলি নূতন স্বাদ বহন করিয়া আনিল। ভাষায় গদ্যের ভারবহতা দেখা দিল। স্বতঃস্ফূর্তির অভাব থাকিলেও তাহা নির্মাণকৌশলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর কঠিন কাব্যকলার উপযুক্ত বাহন সনেট। সনেট-পঞ্চাশৎ

পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা ইঁহার কবিতার যথার্থ মূল্য-বিচার।

> বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোন লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।[১]

পুরানো বাঙ্গালা কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর তুলনা চলে। (ভারতচন্দ্রের রচনার প্রতি প্রমথবাবুর পক্ষপাতিত্ব তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনায় ছড়াইয়া আছে।) প্রমথবাবুর সনেটের গঠনরীতিতে ইতালীয় অপেক্ষা ফরাসী সনেটের প্রতি বেশি পক্ষপাত দেখা যায়, বিশেষ করিয়া ষষ্ঠকের প্রথম দুই ছত্র দ্বিপদীতে। সনেট-পঞ্চাশতের অর্ধেকেরও বেশি কবিতায় মিলের কাঠামো এই—কখখক কখখক গগ ঘঙঘঙ। একটি ছাড়া[২] আর কোথাও অষ্টকের মিলে ব্যতিক্রম নাই। অষ্টকের দ্বিপদীতে কোথাও ব্যতিক্রম নাই, আছে শুধু ষষ্ঠকের শেষ চতুষ্পদীতে।[৩] স্তবকবন্ধ সাধারণত ৪+৪+২+৪। চারিটি কবিতায় ৮+৬।[৪] দুই জায়গায় ১০+৪।[৫] এক জায়গায় ৪+৪+৬[৬], আর এক জায়গায় ১৪[৭]। ৪+৪+২+৪ এই বন্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা আছে,—(৪+৪)+(২+৪), (৪+৪+২)+৪, ৪+৪+(২+৪), (৪+৪)+২+৪, ইত্যাদি।

সমসাময়িক কবিতার সম্বন্ধে প্রমথবাবুর অভিমত 'উপদেশ' কবিতায় খোলাখুলিভাবে বর্ণিত।

> প্রিয় কবি হ'তে চাও, লেখো ভালবাসা,
> যা' পড়ে' গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
> তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,—
> জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!

১ চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৬৭। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা চিঠিখানিও দ্রষ্টব্য (ঐ, পৃ ২৪-২৫)। ২ 'বসন্তসেনা' (কককক খখখখ গগ ঘঙঘঙ)।

৩ ঘঙঙঘ ('জয়দেব', 'বন্ধুর প্রতি', 'রূপক', 'হাসি', 'উপদেশ'), ঘকঘক ('ধরণী', 'গোলাপ', 'ধুতুরার ফুল', 'একদিন'), ঙঙঙঙ ('চোরকবি', 'তাজমহল', 'ভুল'), কঘঘক ('ভাব', রজনীগন্ধা', 'স্বপ্ন-লঙ্কা'), কঘকঘ ('সনেট', 'বাহার'), খঘখঘ ('গজল', 'ফুলের ঘুম') গখখগ ('রোগ-শয্যা') কগগক ('মুস্কিল-আসান'), এবং গগগগ ('প্রতিমা')। ৪ 'চোরকবি', 'ধরণী', 'একদিন' ও 'প্রতিমা'। ৫ 'পূরবী' ও 'মুস্কিল-আসান'। ৬ 'প্রিয়া'। ৭ 'ধুতুরার ফুল'।

বড় কবি কিম্বা যদি হ'তে তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জন-সাধারণ,
শেখো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,—
দরকারি ভাব, আর সরকারি ভাষা।

যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে॥

নিজের কবিতা সম্বন্ধে উক্তি আছে 'আত্মকথা'য়।

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর
ওঠেনা তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকেনা ঝুলিতে
স্বর্গ্য-মর্ত্ত্য-মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর!

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,—
আমার হৃদয়-সাথে বাহুর বন্ধন॥

'বিশ্বরূপ'এও আছে,

আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক!

অনেককাল পরে 'আমার সনেট'[১] কবিতায় প্রমথবাবু সমালোচকদের কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

আমি নাকি ভাবদেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ যুড়ে।
প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোরে না এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে!

প্রমথবাবুর শ্রেষ্ঠ কবিতার কাব্যকৌশলে নিটোল ভাব ও তীক্ষ্ণ পরিমিত ভাষা অলঙ্কারের দীপ্ত কারুকার্যে জড়ানো। যেমন কামিনীকাঞ্চনের রূপক কবিতাটি।

কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রি হেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥

[১] 'পদ-চারণ'; রচনাকাল আষাঢ়, ১৩২১।

বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ ॥

কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস ॥

বসন্তের দিবা আর হেমন্ত যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার কাঞ্চন কামিনী ॥

পুরাতন ভাবও অনেক সময় শব্দের ছটায় নবজীবিত হইয়াছে। যেমন,

লীন হ'য়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে!

সনেট-পঞ্চশতের চারিটি কবিতার উদ্দিষ্ট চারিজন সংস্কৃত কবি—ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি ও চোরকবি। জয়দেবকে প্রমথবাবুর পছন্দ নয়। ভাসের নাটকে প্রণয়বিলাসের তেমন স্থান নাই সুতরাং গতানুগতিককার বাহিরে বলিয়া তাঁহার পক্ষপাত। নিজের আদর্শ—ভোগ ও যোগের সমদৃষ্টি—ভর্তৃহরিরও আদর্শ ছিল বলিয়া ভর্তৃহরি প্রমথ চৌধুরীর প্রশস্তি পাইয়াছেন। আর চোরকবির মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে তাঁহার রচনায় প্রেমোদ্দীপনার উষ্ণতা আছে বলিয়া। দুইটি কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের দুইটি নায়িকার বিষয়ে—'বসন্তসেনা' এবং 'পত্রলেখা'। দ্বিতীয় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে। বসন্তসেনার অভ্যর্থনা এই বলিয়া,

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন

বিদেশী সাহিত্যিকের মধ্যে শুধু বার্নার্ড্ শ-র উপর একটি কবিতা আছে। শ-র সঙ্গে প্রমথবাবুর আত্মিক মিল ছিল। প্রমথবাবু বলিয়াছেন,

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।

প্রমথবাবুর চাবুকও নেহাৎ মোলায়েম ছিল না।

পদ-চারণের কবিতাগুলি ১৯১১ হইতে ১৯১৮ সালে মধ্যে লেখা। বইটির নামকরণ করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায়[২] বোধহয় কাজ

[১] চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ২৬২। [২] ঐ, পৃ ২৪-২৫।

হইয়াছিল; পদ-চারণের কবিতাগুলিতে "পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার" যে ঝোঁক ছিল তাহা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তবে জলুসও খানিকটা ম্লান হইয়াছে। গদ্যবন্ধের দৃঢ়তা হ্রাস পাওয়ায় এ কবিতাগুলি যেন প্রচলিত কাব্যরীতির দিকেই খানিকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে। রহস্যকৌতুকের আমেজ একটু নূতন ঝাঁঝ দিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন,[১] কবিতাগুলির ভিতর "আর কিছু না থাক্, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason"; আর সেইসঙ্গে আছে এমন কিছু রস যাহা আর কোন কবির রচনায় পাই নাই। Rhyme (মিল) যেমন,

> সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে,
> না মরিয়া চলে এনু একদম স্বর্গে।

Rhyme এবং reason যেমন,

> এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
> কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
> প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।
>
> অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
> রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
> বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরাপুরি 'চোদ্দ'।[৩]

তীক্ষ্ণ কৌতুকের স্পর্শ, যেমন,

> জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
> না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজ কংস!
> সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা,—
> অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।[৪]

পদ-চারণের গোড়ার দিকে দু-একটি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভঙ্গির আভাস আছে। যেমন,

> এস সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি,
> রূপরসগন্ধ-সার শুষে পান করি।
> ওকি কথা? কার ভয়ে হও তুমি ভীতু?
> সুরাপানে পাপ হবে?—হোক না তাই বা!
> জীবনে কদিন আসে বসন্তের ঋতু?
> ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি ময়্‌সে তৌবা?[৫]

এই প্রসঙ্গে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের রচনা স্মরণ করিতে পারি॥[৬]

১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করকমলেষু। ২ সনেট সপ্তক। ৩ কৈফিয়ৎ
৪ সনেট চতুষ্টয়। ৫ 'ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা?' ৬ পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য।

৪

সাহিত্যের বাহনের প্রশ্ন হইতে স্বভাবতই প্রমথবাবু সাহিত্যের বস্তু ভাব ও শিল্পের সমস্যায় উপনীত হইলেন।[১] সমসাময়িক সাহিত্যকে যাচাই করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে ছয়টি লক্ষণ পরিস্ফুট। (১) সাহিত্যসৃষ্টি আর স্বল্পসংখ্যক অধিকারীর একচেটিয়া নয়, বহু লোক বহু কারণে বহুবিধ রচনায় সহজেই অগ্রসর। (২) কালধর্মে মানুষের মধ্যে মানুষের ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও শ্রমবিভাগ আর টিকিতেছে না, সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অব্যপারে ব্যাপার করিতে হইতেছে। (৩) রচনার আয়তন কমিয়া আসিয়া প্রায় চুটকি-আকার ধারণ করিতেছে, সেইসঙ্গে বিষয়ের বৈচিত্র্যও বর্ধিত হইতেছে। (৪) সাহিত্যসৃষ্টি অর্থোপার্জনের উপায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। (৫) মাসিকপত্রের সচিত্রতা ক্রমশ বাড়িতেছে, আর সেইসব বিশ্রী ছবিতে পাঠকের শিক্ষারুচি তো জন্মাইতেছে না অধিকন্তু আর্টের চোখ নষ্ট হইতেছে। (৬) কাব্যে গৎমাফিক প্রকৃতিবর্ণনার ও কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসেরই ছড়াছড়ি।[২] অতএব, প্রমথবাবু সিদ্ধান্ত করিলেন, লেখকদের পক্ষে আবশ্যক—"বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন" হওয়া এবং ভাববস্তুকে যথোচিত শিল্পরূপ দিবার জন্য পরিশ্রম করা। এককথায় রীতিমত সাধনা করা।

> অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না—এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধারসাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে, সাধনার আবশ্যক, এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা।··· নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁরা যেন দেশি বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' (১৮৯১-১৮৯৫) এই ইঙ্গিতই দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাধনা শুধু তো সাহিত্যের নয়, জীবনেরও। সাহিত্যের ক্ষেত্রের সীমানা এখন (১৯১৩) বহুদূর বিস্তৃত, তাই সাহিত্যের সাধনায় এখন ডিসিপ্লিনের আবশ্যকতা অনেক

১ 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' (ভারতী, আশ্বিন ১৩২০)।

২ "অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত তাহলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।"

বেশি। বাজে লোকের বাজে তর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালী উদ্‌ভ্রান্ত, তাহাকে সাহিত্যের সচল পথটির নির্দেশ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়া 'সবুজপত্র' নিশান মেলিয়া ধরিলেন (বৈশাখ ১৩২১), এ কথা আগে বলিয়াছি। প্রমথবাবুর চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা এবং তাঁহার ভাষার জোর ও উজ্জ্বলতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই সাহিত্যশাসকরূপে বরণ করিলেন। (সাধনার সময়ে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দিয়া এই কাজ করাইবার অস্ফুট বাসনা ছিল তাঁহার।) সবুজপত্র বাহির হইবার কয়েকমাস পূর্বে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন,

> আমার ত দেখে শুনে মনে হচ্চে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসচে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।[১]

প্রচলিত অপ্রচলিত কোন বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সঙ্গে সবুজপত্রের মিল দেখা গেল না। সাইজ অর্ধ-ফুলস্‌ক্যাপ, ছবি নাই, কোন রকম বিজ্ঞাপন নাই। সবুজরঙের মলাট, মলাটের মধ্যখানে সবৃন্ত তালপাতার সিলুয়েৎ। উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, চিরনবীন প্রাণের সরল সবল উদ্দণ্ড ঊর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধ্বজ।

কি অভাব পূরণের ও কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অভিনব পত্রটির প্রকাশ তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন সম্পাদক 'সবুজপত্রের মুখপত্র'এ। লেখকদের নিজের ত্রুটি-অসম্পূর্ণতার বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই; তাঁহাদের দৃষ্টি ঘোলাটে, মন অনড়, গতানুগতিক। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবণতা রূপকথার মত পুরানো কথার পুরানো ভাবের জাবর কাটিয়া পাঠকের মনকে থাবড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া দেওয়া, তাহাকে নাড়িয়া দেওয়া জাগাইয়া দেওয়া নয়। সুতরাং সবুজপত্রের মিশন হইবে—(১) ইউরোপীয় সাহিত্যের স্পর্শে আসিয়া আমাদের সাহিত্যে যে মুক্তির আনন্দ-সচলতা আসিয়াছে সেই সৃষ্টির বেগ নিরুদ্ধ না করা। (২) সর্বভূমিক, সর্বজনিক ও সর্বকালিক ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে নিজের দেশে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা —ইউরোপীয় সাহিত্যের এই-যে শিক্ষা আমাদিগকে আমাদের গৌরবের অতীত চিনাইয়াছে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইয়াছে,—এই শিক্ষা প্রত্যাখ্যান না করা। (৩) বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা। (৪) সাহিত্যকে শিক্ষা ও উপদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা, অর্থাৎ

[১] চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭০।

সাহিত্যকে সামাজিক প্রয়োজনের সামগ্রী বলিয়া না দেখা। (৪) ভাবকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য লেখার সাধনা করা। (৬) ইংরেজি শিক্ষাকে ঠেকাইয়া না রাখিয়া তাহা আমাদের স্বকীয়তার রসে জারিত করিয়া লওয়া।

রবীন্দ্রনাথকেই দেখা গেল সবুজপত্র-অন্তরালে। কৈশোরে লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১)[১] ছাড়া আর কিছু তিনি আদ্যন্ত চলিতভাষায় লেখেন নাই। উক্ত রচনাটি প্রথমত[২] চিঠি হিসাবেই লেখা হইয়াছিল, এবং রচনার ভাবে ও ভাষায় চিঠির অন্তরঙ্গতা ও জনান্তিকতা বিদ্যমান। বাহন শুধু চলিত-ভাষাই নয়, তাহা কথ্যভাষার অত্যন্ত অনুগত, এমন কি মেয়েলি ভাষার ছোঁয়াচ-বর্জিত নয়।[৩] ভূমিকা সাধু-ভাষায় লেখা, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে।" পোষাকি গদ্যে চলিত-ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলেন প্রথম সবুজপত্রে প্রকাশিত রচনায়। শুধু গদ্যরীতিতে নয় তাঁহার কবিতায় এবং গল্প-উপন্যাসেও অভাবনীয় নবীনতা দেখা দিল। কবিতায় পাইলাম ছন্দের যতিমুক্তি ও ভাবনার বিস্ফার, গল্পে-উপন্যাসে পাইলাম জীবনের সবল দৃষ্টি, ভাবনার সতেজ তীক্ষ্ণতা। মৃত্যুর অল্পদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব।

৬

রবীন্দ্রনাথের গল্পসপ্তক ও চতুরঙ্গ বাহির হইবার পরে এবং ঘরে-বাইরে চলিবার সময়ে প্রমথ বাবুর গল্পচতুষ্টয় 'চার ইয়ারী কথা' সবুজপত্রে প্রকাশিত হইল (১৯১৬)।[৪]

১ প্রথমপ্রকাশ ভারতী (১২৮৬ হইতে) 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে।

২ তেরটি চিঠির মধ্যে প্রথম পাঁচটি ছাপার জন্য লেখা হয় নাই।

৩ যেমন, "সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ"; "এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব"; "তাঁকে দেখলেই ার গা কেমন করত", "আমরা নিরুপায় লজ্জায় ও রাগে পুড়ছিলেম"; "যদি একবিন্দুও খবর জানে"; "আমার আদবে ভাল লাগে না"; "তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি"; "তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি"; "এখানকার বাড়িগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে", ইত্যাদি।

৪ প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্র। রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনাতেই গল্পগুলি লেখা (চিঠিপত্র, পঞ্চমখণ্ড, ১৮০, ১৮৮, ১৯৬)।

বিলাত-প্রত্যাগত, ক্লাব-চর চারি বন্ধুর ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনী। নায়িকা চারিজনই বিদেশিনী। ঘটনাস্থল একটির কলিকাতা, দুইটির ইংলণ্ড, একটির ইংলণ্ড ও কলিকাতা। চারি জন নায়িকা চারি রকম, সকলেই অসামান্য সুন্দরী—অবশ্য নায়কের চোখে। একজন পাগল, একজন জুয়াচোর, একজন প্রগল্‌ভ ও ধর্মনিষ্ঠ আর একজন মূক সেবিকা। চারি জনই চিরন্তন নারীত্বের লক্ষণ বহন করিয়াছে। তবে শেষগল্পের নায়িকা পুরাপুরি রক্তমাংসের মানুষ, বাকিগুলিতে কিছু তির্যকভাব আছে। চিরন্তন নারীর ও তাহার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে একটি বিরাট রহস্য "ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাঙ্গালা অর্থেও বটে—অর্থাৎ ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke"। নায়ক-নায়িকা ছাড়া কোন তৃতীয় ভূমিকার স্থান নাই। নায়কের অনুভূতি ও বিচার-বীক্ষণের মধ্যদিয়াই কাহিনী প্রবাহিত। ইতিপূর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলের কাহিনী শুনিয়াছি। প্রমথনাথের গল্প-চতুষ্টয় কিন্তু অন্য ধাঁচের ও অন্য রসের। প্রমথনাথের গল্পের চরিত্র সোজাসুজি জীবন থেকে নেওয়া নয়, সেগুলিকে জীবনের প্রতিস্ফুরণ (refraction) বলিতে পারি। চিন্তার বঙ্কিমসুভগতা ও তীক্ষ্ণতা এবং ভাষার শাণিত উজ্জ্বলতা গল্পগুলিতে যেন ভাস্কর্যের কঠিন কারুকার্যে মণ্ডিত করিয়াছে। প্রমথনাথ পরে আরো অনেক গল্প লিখিয়াছেন[১], এবং সেগুলি তাহার নিজস্বতায় ঝলমল, তবে শিল্পের দিক দিয়া চার-ইয়ারী-কথা অনতিক্রান্ত॥

৬

সবুজপত্রের সারথি রবীন্দ্রনাথ, গাণ্ডীবী সব্যসাচী প্রমথনাথ। সবুজপত্রের দল যেটি ছিল তাহা মোটেই ভারি ছিল না,—কয়েকটি শিক্ষিত, চিন্তাশীল তরুণ। ইঁহাদের সকলেরই লেখায় সবুজপত্রের বিশিষ্টতা ছিল,—সে লেখা ছিল ভাবসংহত, ভাষা-পরিমিত এবং সতেজ ও স্বাধীন চিন্তা-প্রণোদিত। পরে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রচনায় নিজস্ব রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সবুজপত্রের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ইঁহারা ছিলেন,—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বরদাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বীরেশ্বর সেন, ইত্যাদি।

সবুজপত্রের গল্পলেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা দেবীর

১ 'গল্প-সঙ্কলন'এ (১৩৪৮) সঙ্কলিত।

(১৮৮৬-১৯১৮) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সবুজপত্র বাহির হইবার অনেক আগে হইতেই গল্প লিখিতেন। বিদেশী গল্পের অনুবাদে এবং মৌলিক গল্প রচনায় মাধুরীলতার সহজ দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট। 'মাতা শত্রু'[১] ও 'সুরো'[২] চমৎকার। এসব কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া সম্ভব।

আঞ্চলিক কথ্যভাষায় লেখা দুই একটি গল্পও সবুজপত্রে বাহির হইয়াছিল। যেমন, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্যের[৩] 'হৈরা'।[৪] গল্পটি বেশ জোরালো। রচনার কিছু নমুনা দিই।

> বেলা তলানের আগেই যাব যার মতো কিছু কিঞ্চিৎ ট্যাকে গুইজা গায়ের যত মুরুব্বি মাতব্বর এই ব্যাপারটীরে পানে চুনে মিশানের মতন নিভাজে হজম করণের লাইগ্যা এক জুঠ্ হৈল। সদ্য খুনের দিন বৈলা স্মৃতিচুরামণি মশায় সেদিন আব ঐ দলে যোগ দিলেন না কিন্তু পরের দিন তিনির মোকাবিলা। গয়ানাথ যেমুন রাইমণির পাওনা টাকার খতখান ফাইরা ফ্যালাইল, অমনি তিনির মনে বাওয়নের জাইৎ রাখনের লাইগা ফট্ কৈরা ধর্ম্মভাব উৎলায়্যা উঠ্ল।

৭

সবুজপত্র বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ আশংসা করিয়াছিলেন, "সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্মস্থানে গিয়ে লাগ্‌বে।" এ কথা ফলিতে দেরি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পুরানো বিরোধীরা, অতীতে নিবদ্ধদৃষ্টি পণ্ডিতেরা, ঈর্ষালুরা, এবং "হঠাৎ-ডিমক্রাসির" নকলনবীশেরা[৫] —সকলে একজোট হইলেন এবং সবুজপত্রের প্রতিপক্ষরূপে চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত ও পরিচালিত এবং বিপিনচন্দ্র পাল-পরিপুষ্ট 'নারায়ণ' পত্রিকার (অগ্রহায়ণ ১৩২১ হইতে) আশ্রয়ে সমবেত হইলেন। আক্রমণের লক্ষ্য হইল প্রমথবাবুর ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব। চলিত-ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান জোর পাইল না।[৬]

[১] ভারতী, কার্তিক ১৩১৫। [২] সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২২। [৩] ইনি হাস্যরসের কবিতা লিখিতেন। [৪] ফাল্গুন ১৩২৪। "মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত"।

[৫] "আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ-ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরেনি—গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শস্তাদামের শৈথিল্য-প্রাচুর্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্ছে।" (প্রমথনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ২৬ অক্টোবর ১৯১৩)।

[৬] প্রমথনাথের ভাষার তথা চলিত-ভাষার দোষ ধরিতে গিয়া প্রতিপক্ষেরা যে কতটা ছেলেমানুষি প্রলাপ বকিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নারায়ণে প্রকাশিত (পৌষ, ১৩২১) বিপিনচন্দ্র পালের 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে মিলিবে। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন, "ক্রিয়াটা সকলের ছোট, সর্ব্বাপেক্ষা হেয়, আর এই কারণেই কর্তৃপদ ও কর্ম্মপদ উভয়ের পর ক্রিয়াপদের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। এটি আমাদের ভাষাতেই

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ জোর পাইল বিশেষ করিয়া দুইটি রচনায়, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। স্ত্রীর-পত্রের প্যারডি 'মৃণালের কথা' বাহির হইল নারায়ণের প্রথম সংখ্যায়।[১] আর ঘরে-বাইরের বিষয় ও ভাব যে নিতান্ত দুর্নীতিপূর্ণ সে বিষয়ে প্রতিপক্ষেরা একমত এবং সরবে একতান। সন্দীপের মুখে সীতার বিরুদ্ধে গ্লানিকর মন্তব্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসংস্কৃতির মর্মে শূল হানিয়াছেন এবং বিমলা-ভূমিকার দ্বারা বর্তমান হিন্দু-সমাজের ভিত্তিতে বোমা ফাটাইয়াছেন—এই অপরাধে "সাহিত্যিক" ও "চিন্তাশীল" সমাজের আশাস্থলেরা কেহ কেহ ব্যবস্থা দিলেন লেখনীর সাহায্যে সম্ভবপর না হইলে লগুড়ের সাহায্যে "কালাপাহাড়" রবীন্দ্রনাথকে শায়েস্তা করিতে হইবে, তাঁহার সাহিত্যকে নস্যাৎ করিতে হইবে। নিঃসার প্রগল্‌ভতা নীরব হইতে দেরি হইল না। তবে বিরুদ্ধবাদীরা বিনা যুদ্ধে—যদিও অসম যুদ্ধ—ক্ষান্ত হইলেন না। সনাতন শাস্ত্রের ও চিরন্তন সমাজের দোহাই ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা অবলম্বন করিলেন পাশ্চাত্য বিদ্যার অস্ত্র। সবুজপত্রের বিরুদ্ধে ইঁহাদের মনোভাবের কঠিন অথচ সত্য মূল্যবিচার করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রমথ-নাথকে লেখা একটি চিঠিতে।[২]

> আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এইরকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্দ্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়—এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্টেভ্‌স্কি বার্নার্ড শ কোট কর তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্চে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চল্‌বে না।

সবুজপত্র বিরোধীদের ইউনাইটেড ফ্রণ্ট্ বা সম্মিলিত শক্তির আক্রমণ হইল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বর্ধমানে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে। মূল এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রবীণ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের

হয়।... অন্যান্য দেশের ভাষায় হয় না। ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্কা। এটি ক্ষইয়া গেলে মুছিয়া ফেলিলে, ভারতের ভারতত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আমাদের সভ্যতার ও সাধনার মূলগত বৈশিষ্ট্যটুকু—নষ্ট হইয়া যাইবে।"

১ লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, তবে নাম ছিল না। স্ত্রীর-পত্র বাহির হইয়াছিল সবুজপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায়।

২ চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ২৪০। চিঠিটি লেখা হয় ২ ফাল্গুন ১৩২৪।

ও তাঁহার অনুবর্তীদের রচনাকে চুটকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন।[১] নবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'নব-নাগরিক সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার অনুপ্রাণিত সাহিত্য-সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টি বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন। সবুজপত্রের একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-সূত্র ছিল সাহিত্য-সাধনায় অধিকারবাদের স্বীকৃতি। রাধাকমলবাবু একথা মানিয়াও মানিলেন না। তিনি বলিলেন শিক্ষাই সাহিত্যের রঙ্গভূমির পাশপোর্ট। আর লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান দিন দিন বাড়িতেছে তাহার জন্য দায়ী ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজি-অনুকারী সাহিত্য। রাধাকমলবাবুর অভিমত অনুসারে বাঙ্গালায় দর্শনের আলোচনায় প্রাণসঞ্চার হইয়াছে কিন্তু সাহিত্যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। নূতন-পুরানোর সমাবেশে গীতি-কবিতায় অল্পস্বল্প লাভ হইয়াছে,

> কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, নাটক-নভেলে আমরা শুধু নূতন লইয়া খেলা করিতেছি মাত্র। আমরা এখনও ইউরোপীয়নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানা কারেনিনার (Anna Kareninaর) মোহে "চোখের বালিতে" দেশের মনের সম্পূর্ণ বিরোধী নায়ক-নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেছি, "স্ত্রীর পত্রে" ও "নারীর মূল্যে" ইবসেন (Ibsen)-এর মত প্রচার করিতেছি। আলফন্‌সো ডডে (Alphonso Daudet) ও গিডে মোঁপাসা (Guy de Maupassant) বর্তমান নব্য-সাহিত্যিকদলের গুরু হইয়াছেন।
>
> ইঁহারা ভাবিতেছেন, ইঁহারা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন তাহা আসল, সত্য ও সুন্দর, তাহাতে সমাজের মিথ্যা আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সমাজের কদর্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ করে না। সেখানকার জীবন একেবারে স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন, নিত্য-সরস, নবীন, সবুজ।

এই সাহিত্য, রাধাকমলবাবুর মতে, যাহা আঁকিতেছে তাহা জীবন নহে, জীবনের অলীক কল্পনা যাহার সহিত সমগ্র জীবনের যোগাযোগ নাই। টবে সাজানো মৌশুমি ফুলের মত "বর্তমান নব্য-সাহিত্য আভিজাত্য-দোষপুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের নিকট নিষ্ফল হইতেছে"। তথনো ঘরে-বাইরে বাহির হয় নাই, সুতরাং রাধাকমলবাবুর সমালোচনার লক্ষ্য হইল 'গোরা'।

> সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের "গোরা"। প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলা ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। এই "গোরা"ই হইতেছে নব-নাগরিক-সাহিত্যের কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

সবুজপত্র-লাঞ্ছিত সাহিত্য অভিজাত-দোষপুষ্ট এবং তাহা জাতীয় জীবনের

[১] ১১৬-১১৭।

বিরোধী। তবে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে "লোকসাধারণের, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে।" স্কুল-কলেজে, আপিস-আদালতে, ড্রয়িংরুমে-বৈঠকখানায়, ক্লাব-ঘরে যে জীবন যাপিত হয় তাহা নকল আর যাহা আসল জীবন তাহা "গরুচরা মাঠে, ছায়াঢাকা খেয়াঘাটে, বনে-ঘেরা কুটীরে, নিত্য-নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে।" "আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া।"

রাধাকুমুদবাবুর অভিযোগের সমুচিত উত্তর দিলেন প্রমথবাবু 'সাহিত্যে খেলা'[১] প্রবন্ধে। প্রমথনাথ বলিলেন, সাহিত্যে খেলা করিবার অধিকার লেখকদের আছে কেন-না সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান—কাহারো মনোরঞ্জন নহে, শিক্ষাদান তো নয়ই।

> সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক, এইসব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

রাধাকমলবাবুর প্রত্যাশিত "আসল সাহিত্য" গড়িয়া ওঠার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়।[২]

> আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কি হত?…কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করচিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা যুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে' বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

নব্য-সাহিত্যকে অস্বীকার করিলেও ইহার বাহন নব্য-সাহিত্যের ভাষা যে রাধাকমলবাবুরাও ব্যবহার না করিয়া পারেন না, উক্তিতে ও আচরণে এই অসঙ্গতির দিকেও রবীন্দ্রনাথ অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন।

> বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলা ভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না, এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করবে ও গৌরব করবে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব, গদ্যে-পদ্যে সব জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যারা তাকে জাতিচ্যুত বলে' নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে বর্জন করতে পারেন না।

[১] সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২২। [২] 'সোনার কাঠি' (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

৮

সবুজপত্রের দলের বাহিরেও কোন কোন লেখক চিন্তাশীলতার সঙ্গে উজ্জ্বল রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। যেমন হরিদাস হালদার (১৮৬২-১৯৩৪)। ইঁহার 'গোবর গণেশের গবেষণা' (১৯১৫)[১] একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বইটির ছয়টি পরিচ্ছেদে লেখক আমাদের ধর্ম, আইন-আদালত, স্বাদেশিকতা ও সংস্কৃতিতে যে মিথ্যা ও আত্মপ্রবঞ্চনার জঞ্জাল রহিয়াছে তাহা উদ্‌ঘাটিত ও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। রহস্যচ্ছলে লেখা প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও স্বাধীন চিন্তার সাহসিক প্রকাশ সমসাময়িক সাহিত্যে সবুজপত্রের বাহিরে অভাবিত ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন,

> আমরা সকল হারাইয়া একমাত্র ধর্মকেই সার করিয়াছি। তাই সকল কাজেই আমরা ধর্মের নাড়া দিয়া থাকি। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, "ধর্ম আছেন, আমি সহিলাম, ধর্মে সহিবে না।" আমাদের অক্ষমতার অনুপাতে ধর্মের দোহাই বাড়িয়া গিয়াছে।[২]

অতীতে ধর্মের মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টা হইয়াছিল পঞ্জাবে। তাহার কি ফল ফলিয়াছে সে সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন,

> আমি পঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম সেখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যতদূর ধর্ম-বিরোধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততদূর নহে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের বিবাদ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে গুরু নানক উভয়ের ধর্মশাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্যমূলক শিখধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, ধর্মের সিমেণ্ট দিয়া রাম ও রহিম নামক দুই সহোদরকে জুড়িয়া এক করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে রাম, রহিম ও গ্রন্থ-সাহেব, এবং এই তিন সহোদরের মধ্যে বহুদিন যাবৎ পৈতৃক বাস্তুভিটার জন্য পার্টিশনের মামলা চলিতেছে।[৩]

সাহিত্যের বিচার সম্পর্কে হরিদাসবাবু লিখিয়াছেন,

> ...বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে আমার নিকট অনুরোধ আসিল যে, উক্ত[৪] পুঁথিখানি যথামূল্যে সংগ্রহ করিয়া এডিট্ করিয়া দিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি তাহা করিয়া পরিষদের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের কোন কোন অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ এডিশনের মধ্যে সর্বত্রই মৌলিক আদিরসকে আদ্যন্তমধ্যরস করিয়া সর্বাঙ্গীন ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল এবং তাহার কোথাও বস্তুতন্ত্রের অভাব হয় নাই। আমি জানিতাম, যে কথা সাধারণ ভাবে বলিলে

[১] তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২২। [২] প্রথম পরিচ্ছেদ। [৩] ঐ।

[৪] "তরজার দলের কবি শ্রীবল্লভের প্রপিতামহের রচিত রাসলীলা বিষয়ক একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি"।

অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রাচীন কাব্যের দোহাই দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবরণে প্রকাশ করিলে সকলে বিশেষ রুচিপূর্বক উদরস্থ করে।[১]

গোবর-গণেশের-গবেষণা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন হরিদাসবাবুকে সবুজপত্রের আওতায় আনিতে।[২] তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষরা তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছিলেন। নারায়ণে হরিদাসবাবুর দুই-একটি "বাস্তব" গল্পচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩] শতাব্দীর গোড়ার দিককার বিপ্লবী নায়ক অবলম্বনে তিনি একটি "সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস" লিখিয়াছিলেন, নাম—'কর্মের পথে' (১৯১৭)। "বাস্তবতা"র যৎসামান্য স্পর্শ ছিল। ১৯০৬-১০ সালের বিপ্লবী আন্দোলন অনুসরণ করিয়া কাহিনী পরিকল্পিত। লেখক বলিয়াছেন, "এই উপন্যাসের সকল ঘটনার উপর বাস্তবের আবরণ দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সকল চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক সুতরাং কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনও প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এইগুলোর মধ্যে কোথাও কিছু ইঙ্গিত করা হইয়াছে।" মনে হয় নায়ক রাসবিহারী বসুর আদর্শে পরিকল্পিত।

'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি' ব্যঙ্গরসাত্মক। 'মদন পিয়াদা, গল্পের বই ॥

৯

নারায়ণের পোষক ও সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) কিন্তু মূল স্তম্ভ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯৩২)। বাগ্মিতা ও লিপিকুশলতা বিপিনচন্দ্রের অনায়াসসাধ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গদর্শন পরিচালনা করিতে-ছিলেন তখন ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ তাহাতে বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দিলে বিপিনচন্দ্র সেখানে জাঁকাইয়া বসেন। বঙ্গদর্শন উঠিয়া গেলে (১৩২০) পর নারায়ণে আবির্ভাব। বিপিনচন্দ্র কয়েকটি গল্পও লিখিয়াছিলেন, এগুলি 'সত্য ও মিথ্যা' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৯১৭)।

চিত্তরঞ্জন দাশ অনেকদিন আগে কবিতাকর্মে অল্পস্বল্প মনোযোগী হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়িয়া। ১২৯৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'নব্যভারত'এ তাঁহার 'বন্দী' কবিতায় এ প্রভাব লক্ষিতব্য। চিত্তরঞ্জনের (ও তাঁহার ভগিনীদের) রচনা আরো কিছু নব্যভারতে এবং মানসীতে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার প্রথম দিকের

[১] পঞ্চম পরিচ্ছেদে। [২] চিঠিপত্র, পঞ্চমখণ্ড, পৃ ১৯৬।
[৩] যেমন, 'মদনপিয়াদা' (কার্তিক ১৩২২)।

রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন ছিল বলিয়া মনে হয়। নারায়ণ বাহির করিবার কিছু আগে হইতেই চিত্তরঞ্জন ভক্তকবিদের দলে ঢলিয়া পড়েন এবং রবীন্দ্র-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক হন।

চিত্তরঞ্জন এই কাব্যগ্রন্থগুলি বাহির করিয়াছিলেন—'মালঞ্চ' (১৮৯৬, দ্বি-স ১৯০৫), 'মালা' (১৯০২), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩) ; 'অন্তর্য্যামী' (১৯১৪), ও 'কিশোরকিশোরী' (১৯১৫)। সাগরসঙ্গীতের একটি অভিজাত সংস্করণও বাহির হইয়াছিল, তেমন বাহারি বই বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব ছাড়া আর কেহ বাহির করেন নাই।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহযোগিতায় 'বাঙ্গালার কথা' নামে সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন (১৯২১-২২)।

চিত্তরঞ্জনের ভগিনী অমলা দেবী সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়িকা ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও কীর্তনে ইনি যশস্বিনী ছিলেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইঁহারই নেতৃত্বে "জনমনগণ-অধিনায়ক" গানটি প্রথম প্রকাশ্যে গাওয়া হইয়াছিল। অমলা দেবীর কবিতা দুই একটি মানসীতে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার একটি নাট্য-রচনাও আছে—'ভিখারিণী' (১৯১১)॥

১০

দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা, চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতৃজায়া সরযূবালা দাসগুপ্তা (১৮৮৯-১৯৪৯) নারায়ণের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। অকালে স্বামিবিয়োগের পরিণত শোকোচ্ছ্বাস ইঁহার কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া একটি দীর্ঘ ভাবুক রচনার আকারে ঘনীভূত হইয়াছিল। বইটি প্রকাশিত হয় 'বসন্ত প্রয়াণ' নামে (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা মণ্ডিত হইয়া। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলিলেন যে বসন্তপ্রয়াণ কাব্য, তবে কাব্য বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তেমন নয়। ইহার মধ্যে রসের এবং তত্ত্বের অংশ অন্তরের আগুনে গলিয়া গদ্যে-পদ্যে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কাব্যের তত্ত্বকথা সব সময়ে ব্যাখ্যা করিয়া কহা যায় না, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> আমার প্রতি অনুরোধ ছিল এই রচনার তত্ত্বকথাটি ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে। কিন্তু সে ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। নিজের লেখার অস্পষ্টতার জবাবদিহি

আজও আমার চুকিল না ; অতএব আমি চেষ্টা করিলে পাঠকদের কাছে অস্পষ্টকে অস্পষ্টতর করা অসম্ভব না হইতে পারে, হয়ত ইতিমধ্যেই তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি।

...মানুষের মর্মাস্তিক একটি বোধশক্তি, বেদনায় জাগরিত হইয়া উঠিয়া, বিশেষ হইতে বিশ্বে ও বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে সমস্ত ব্যবধানকে সহজেই দূর করিয়া দেখিতেছে ইহাই এই লেখায় আমি বুঝিয়াছি, ইহা বুদ্ধি করিয়া ভাবা নয় ; চিন্তা করিয়া পাওয়া নয় ;...

এরূপ রচনাকে একেবারে জলের মত বোঝা যায় না—যে বেদনা পাইয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে তাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া দিয়া তবে বুঝিতে হয়।

ইঁহার অপর গ্রন্থ 'ত্রিবেণী-সঙ্গম' (১৯১৪) ও 'দেবোত্তর বিশ্বনাট্য' (১৯১৫)। এই দুইটি রচনায় দার্শনিক পিতার চিন্তার ও রচনার (?) প্রভাব অত্যান্ত স্পষ্ট। লেখিকার নীহারিকাবৎ ভাব প্রায়-অদৃশ্য রূপকের সূত্রে দাঁনা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই জন্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে রচনাগুলি খুব সার্থক হয় নাই। বসন্ত-প্রয়াণের খ্যাতিটুকুও আজ সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

দেবোত্তর-বিশ্বনাট্য রূপক নাটক, কতকটা রবীন্দ্র-প্রভাবিত। আধুনিক যুগের যে প্রধান সমস্যা—শ্রমিকের ও ধনিকের, শাসিতের ও শাসকের বিরোধ—তাহার সমাধানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে নাট্য-কাহিনীতে। শেষ (তৃতীয়) অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের এই অংশটুকু হইতে লেখিকার উদ্দেশ্য বোঝা যাইবে।

দীনুমোড়ল—মহারাজ ! একদিন আমি ব্যক্তিশক্তির উপাসক ছিলাম, এই গুরুদেবই আমাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ! যৌবনে আমি চাষীদের দলবল নিয়ে অনেক জমিদারী মহাজনী সরকারী সংক্রান্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার নামে লড়াই করেছি, অনেক কুঠি ও গোলাঘর লণ্ডভণ্ড করেছি, অনেক ভালমন্দ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গেছি, ভাঙ্গাতেই ছিল আমার স্ফূর্তি, আমি শান্তি অপেক্ষা ঝড় ভালবাসিতাম ! আজ সেই ঝড় আমার ঘরের উপর দিয়ে বহে গেছে, বেশী কিছু নয়, আমার মাথার চুল কয়গাছাকেও উড়াইয়া লইয়া গেছে ! স্বাভাবিক মায়ার টানে আমি একটা মস্ত বড় একাধিকার আঁকড়াইয়া ছিলাম, সে টান ছাড়া করিয়া ঠাকুর আমায় সকল অধিকার থেকে মুক্ত করেছেন ! আমার কুঁড়ের বেড়া ভেঙ্গে ফেলে আমায় ফাঁকা রাস্তায় দাঁড় করাইলেন, ঠাকুর ধন্য !

রাজা—(স্বগত) আমি ত ফাঁকা ছেড়ে এলাম, এর দেখি উল্টা গতি ! (প্রকাশ্যে)—বিশ্বমানব-ধর্ম্মে রাজার নিকট চাষীর পক্ষ হইতে কি দাবী শুনিতে চাই।...

দীনুমোড়ল—এবার চাষী-বংশের জন্য নূতন ব্যবস্থা চাই। জমি কেবল জমিদারের নয়, সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। যে আপন শ্রম ও দক্ষতায় জমি চষ্‌বে, জমি তার কাছে গচ্ছিত থাক্‌বে। এবার প্রতি চাষীই হবে ভূস্বামী ও মহাজন, প্রতি চাষীই গৃহপতি।

১১

সবুজপত্রের শত্রু সনাতনীদের মিত্র নারায়ণের কোলেই কিন্তু ঈষৎপরবর্তী কালের আভাষ। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণেই প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, এবং এই

কাগজেরই একজন বাঁধা লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 'ডালিম' গল্প[১] লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্রের উত্তর হিসাবে ইনি 'মৃণালের দুঃখ' লিখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাইয়ের বংশধর। ইনি দুই-একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন। যেমন, মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে 'মহাপ্রস্থান' (১৯৩২)। ইঁহার লেখা কয়েকটি একাঙ্ক "কথানাট্য" নারায়ণে বাহির হইয়াছিল ॥[২]

১২

নারায়ণে প্রকাশিত কয়েকটি রচনার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া একজন প্রবীণ লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। 'উড়িষ্যার চিত্র' রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন সিংহ নারায়ণে প্রথম বছরেই রবীন্দ্র তথা সবুজপত্র বিরোধী হইয়া দেখা দিয়াছিলেন।[৩] কিছুকাল পরে (১৯২০) ইনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপাইলেন—'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা'। ইহাই পরে 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল (১৯২২)। লেখকের অভিযোগ ব্যাপক, এবং অভিযুক্ত তিনজন জীবিত সাহিত্যিক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হরিদাস হালদার। বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও ধরা পড়িতেন। 'ডালিম', 'মরণে জয়', 'হাসির দাম', 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা', 'বিভাকর' ইত্যাদি নারায়ণে প্রকাশিত গল্প উপলক্ষ্য করিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণে একটি বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' নামে।[৪] ললিতকুমারের বিপরীত দৃষ্টি লইয়া হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মানসী-ও-মর্ম্মবাণীতে প্রবন্ধ লিখিলেন—'সাহিত্যে বাস্তবতা'।[৫] এই দুই প্রবন্ধ বিচার করিয়া যতীন্দ্রমোহন এই চারিটি চার্জ আনিলেন সমসাময়িক শক্তিশালী লেখকদের বিরুদ্ধে।

১. বিধবার প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে এই দুর্নীতির সূত্রপাত। পরিণতি রবীন্দ্রনাথে (চোখের বালি), শরৎচন্দ্রে (বড়দিদি, পল্লীসমাজ), হরিদাসে (কর্মের পথে)।

[১] পৌষ ১৩২১। চিত্তরঞ্জনের গ্রন্থাবলীতে গল্পটি সঙ্কলিত আছে। আসলে লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করি।

[২] যেমন 'মরণে জয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২), 'আঁধার ঘরে' (আষাঢ় ১৩২২) ও 'হাসির দাম' (শ্রাবণ ১৩২২)।

[৩] 'ভাষার কথা', আষাঢ় ১৩২২।

[৪] শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৬। [৫] পৌষ ১৩২৬।

২. সধবার প্রেম (কুমারী অবস্থায় সঞ্জাত)। এ দুর্নীতির উৎসও বঙ্কিমচন্দ্র। পরিণতি শরৎচন্দ্রে (দেবদাস, স্বামী)।

৩. সধবার প্রেম (বিবাহের পরে সঞ্জাত)। ইহার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ (নষ্টনীড়, ঘরে-বাইরে) ও শরৎচন্দ্র (চরিত্রহীন)।

৪. গণিকার প্রেম। "বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দিকে একটা ঝোঁক (tendency) দেখা যাইতেছে—এমন কি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন।"

লেখক এই রায় দিলেন,

> আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—পাশ্চাত্য-সমাজের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেক দিন হইতে "ভাঙ্গন ধরিয়াছে"; সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে,......পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া—হিন্দুজাতির মজ্জাগত সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষাপদ্ধতি (godless education) নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া আসিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নামধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে?

দেশের হাওয়া অনেকদিন ফিরিয়াছে। হিন্দু-জাতির সংযম-আদর্শ ইত্যাদি বড় বড় কথা সকলেরই মুখস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা আর ভবীকে ভুলানো গেল না। সমাজপতির দলের এই শেষ কামড়ও ব্যর্থ হইল॥

১৩

অসহযোগিতা আন্দোলনের গোড়ার দিকে কয়েকজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (জন্ম ১৮৮০) এ বিষয়ে প্রবীণতম। (ইহারও পূর্ববর্তী হইতেছেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ইঁহার 'নির্বাসন কাহিনী' (১৯১১) জনপ্রিয় হইয়াছিল।) বারীন্দ্রবাবুর ছাত্রাবস্থায় লেখা গল্প কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। আন্দামান হইতে মুক্তি পাইয়া বারীন্দ্রকুমার তাঁহার অবরুদ্ধ কর্মোদ্যম সাহিত্যের পথে নিয়োগ করিলেন। কয়েকখানি উপন্যাস ইত্যাদি ছাড়া ইনি লিখিয়াছেন ভাগে ভাগে আত্মকাহিনী —'দ্বীপান্তরের কথা' (১৩২৭), 'আত্মকাহিনী' (১৩২৯)[১], 'বোমার যুগের

[১] 'দ্বীপান্তরের পথে' নামে বিজলীতে প্রথম প্রকাশিত।

কথা',[১] এবং 'আমার আত্মকথা' (১৯৩১)। উপন্যাস—'সোনার সিঁড়ি', 'মুক্তির দিশা' (১৩৩০) ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫১) দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' সম্পাদন করিতে থাকেন (১৯২১)। প্রধানত জার্নালিস্ট হইলেও ইঁহার রচনা স্থায়িত্ব-গুণহীন নয়। সরস-গম্ভীরতায় ইঁহার 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯২২) উপভোগ্য রচনা॥

১৪

সবুজপত্রের একজন তরুণ লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (জন্ম ১৮৯১) গদ্য রচনায় নিজস্বতা দেখাইয়াছিলেন গোড়া থেকেই। ইনি গদ্য পদ্য দুইই লিখিয়াছিলেন, তবে ঝোঁক ছিল জীবন-ভাবনার দিকে। নূতন চিন্তার পরিচয় আছে তাঁহার প্রবন্ধের বইগুলিতে—'নবযুগের কথা' (১৯১৯), 'সবুজ কথা' (১৯২১), 'উড়োচিঠি' (১৯২২)। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর ও লিপিকার ইঙ্গিত অনুসরণে রূপকথার অনিন্দনীয় এবং নিজস্বরীতিতে লেখা 'নতুন রূপকথা ও একটি রূপক গল্প' (১৯২০, দ্বি-স ১৯২৭) সুপাঠ্য রচনা। বইটির ভূমিকায় প্রমথনাথ চৌধুরী রচনা দুইটির ভাব ও ভাষা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, সুরেশচন্দ্রের

> ভাষা সাবেগ কিন্তু অসংযত নয়, প্রচুর কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। তাঁর লেখার ভিতর প্রাণের উচ্ছ্বাস, গতি, লীলাভঙ্গী সবই আছে। এই রূপকথা দুটি একটি জ্যান্ত মানুষের জ্যান্ত মনের জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ অতএব এ যথার্থ সাহিত্য।

নতুন-রূপকথার তত্ত্বকথাটুকু হইতেছে এই যে আমরা ভারতীয়েরা পরলোকাপেক্ষী সুতরাং ইহজীবনের কর্তব্যের তথা আনন্দের প্রতি উদাসীন হইয়া আমাদের অতীত দিনের ঐশ্বর্য এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। ভারতীয়

> মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণ-হীনতায় তার চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি নির্জীব আনন্দহীন হ'য়ে উঠেছে, মহারাজ! আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে, তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে, ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হ'য়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকের সামর্থ্য হ'য়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা. মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গলাভের সহজ ও সত্য উপায়।[২]

'ইরাণী উপকথা'য় (১৯২০) পাঁচটি গল্প আছে। 'একটি অসম্ভব গল্প' ও

[১] বিজলীতে আংশিক প্রকাশিত ও অসমাপ্ত। [২] পৃ ৪১।

'সমুদ্রের ডাক' এই দুইটি ছাড়া সবই রূপক ও রূপকথার রীতিময়। ও দুইটি গল্পও রূপকের স্পর্শবিহীন নয়। রচনা স্বচ্ছন্দ ও সুপাঠ্য।

ইঁহার অপর রচনা—'ঐন্দ্রজালিক' (১৯২৬), 'সাকী' (১৯২৬), 'ইন্দ্রধনু' (১৯২৮) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) কাশী হইতে 'উত্তরা' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নবীন লেখকদের প্রথম রচনা অনেক বাহির হইয়াছিল। সুরেশবাবুও সবুজপত্রের তরুণ দলে ছিলেন। ইঁহার গল্পের বই—'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব' (১৯২১) ও 'মানসী' (১৯২২)। 'মধুপ' (১৯২৫) উপন্যাস।

ব্যবহারজীবী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'বাসবী' 'দেবনাথ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক॥

দশম পরিচ্ছেদ

"কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি"

১

স্কুল-কলেজের শিক্ষা দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, পাশ করা ছেলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা বাড়তির মুখে, অতএব বাঙ্গালা বইয়ের পাঠকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান বলিতে হইবে। তবুও শিক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে সাহিত্য-পাঠকের বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা ও মনের উজ্জ্বলতা তেমন স্পষ্ট হইতেছে না। ইহার একটা বড় কারণ ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের ব্যবস্থার ও আবহাওয়ার পরিবর্তন। ভদ্র বাঙ্গালী অধিকাংশ এখনো ছিলেন পল্লীবাসী এবং অনেকেই আপন ভূমির উৎপাদনভোগী। চাকরির খাতিরে শিক্ষিতদের শহর-নিবাসী হইতে হইয়াছে বটে কিন্তু শতাব্দের গোড়ার দশক পর্যন্ত তাহার মনের টান ছিল ভিটার পানে। বছরে একবার অন্তত, অন্তত পূজার ছুটিতে, দেশে গিয়া মানসিক শ্রান্তি বিনোদন করিয়া আসিতে হইত। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে শরতে ম্যালেরিয়ার বিস্তার, পল্লীসমাজের নিরুদ্যম অকর্মণ্যতা এবং জমির ভাগাভাগির দরুন দেশে যাওয়া ক্রমশ কঠিন হইতে লাগিল। সুতরাং যাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল সে শহরে—মুখ্যত কলিকাতায়—বারো মাসের বাসিন্দা হইল। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে ম্যালেরিয়ার অত্যাচার ছিল না বটে তবে সেখানেও ভদ্র বাঙ্গালীর অর্থসঙ্কট দেখা দিতে লাগিল এবং কলিকাতার মহিমা উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এই ভাবে পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত বাঙ্গালী যতদূর সম্ভব কাজে, নপার্যমাণে চিন্তায় (কলিকাতা) নগরবাসী হইয়া পড়িতে লাগিল। কলকারখানার প্রসারের ফলে অশিক্ষিত শ্রমোপজীবী বাঙ্গালীও পারিলে নগরোপকণ্ঠবাসী হইতে লাগিল। এ পরিবর্তন কালগত এবং অবশ্যম্ভাবী।

পল্লীজীবনে ছেদ পড়ার আগেই একান্নবর্তিতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ভদ্র বাঙ্গালীর সংসার ব্যবস্থা একান্নবর্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। একান্নবর্তিতা অচল হইল অথচ সমস্ত সামাজিক কাজই আগেকার মত যথাসম্ভব বিরাট আয়োজনে ফাঁদিতে হইতে লাগিল যতদিন পারা যায়। এই কারণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার

দ্রুততর অবনতি ঘটিতে লাগিল। বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া শক্ত হইতে লাগিল। অগত্যা মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাইতে হইল। শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের পক্ষে আর আগেকার একান্নবর্তিচালে জাঁকজমক লইয়া চলা অসম্ভব হইল। সুতরাং ঘরের আবহাওয়াও বদলাইতে লাগিল।

উনবিংশ শতাব্দে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবাধ ক্ষেত্র ছিল হাইকোর্টে অথবা জেলা কোর্টে ওকালতি। এখন বি-এল্ পাশ করা গ্র্যাজুয়েটের ভিড়ে সে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল। চাকরির ক্ষেত্র তো আরও সঙ্কীর্ণ। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশের বাহিরে গিয়া জীবিকা-অর্জন করিবার দিকে খানিকটা ঝোঁক দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের সে চেষ্টার ফলে অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এখন স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পাণ্ডা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালাদেশের বাহিরে খাতির জমাইতে দিতে বিদেশী শাসকের অত্যন্ত অনিচ্ছা। এমন কি বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে খাস বাঙ্গালারও খানিকটা বাহির করিয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশকেই ছোট করিয়া ফেলা হইল। বাঙ্গালীর ঘরের হাতায় যেন প্রাচীর উঠিল। বিহার উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র আরো সঙ্কুচিত হইল। অথচ এখনো উচ্চ শিক্ষা এতটা ধাতস্থ হয় নাই যে আপিসের চাকরি ও কোর্টে ওকালতি ছাড়া আর কিছুতে তাহার মন লাগিতে পারে। শিক্ষকতার কথা তুলিলাম না, কেন-না কলেজের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় আর সাধারণ স্কুলে গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতনের হার ছিল মাসিক তিরিশ হইতে ষাট টাকা।

মিণ্টো-মর্লি রিফর্মের দৌলতে (১৯১০) শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতম চাকরিতে নিতান্ত দুইচারি জন উচ্চশিক্ষিতের স্থান হইতে লাগিল। ওকালতি ও শিক্ষকতার দিকে আকর্ষণ না থাকায় এই দুই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দিল। বাঙ্গালীর জেদ যখন জয়ী হইল, বঙ্গভঙ্গ রদ হইল, শাসন-কর্তৃপক্ষ ভাবিলেন ইহাতে বাঙ্গালী শান্ত হইবে। তাহা হইল না, পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গের পুনর্মিলন বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটাইতে পারিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে প্রচেষ্টায় বাহিরে-চাপা আগুন নিভিল না, ধূম ছাড়িতে লাগিল। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের সান্ত্বনা (১৯১৯) কার্যকর হইল না। গান্ধিজী নন্-কোঅপারেশনের শঙ্খধ্বনি করিলেন, দেশের সর্বত্র হইতে সাড়া জাগিল। প্রমাণ হইয়া গেল যে স্বাধীনতার

আকাঙ্ক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিমত নাই। নন-কোঅপারেশনের ফল ভালো-মন্দ দুই রকমই ফলিল। ভালো ফল—জনশক্তির সংহত রূপের ক্ষণিক হইলেও অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গেল, আর মন্দ ফল—ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মনে অ-বিনয়ের বিধি-উল্লঙ্ঘনের বীজ উপ্ত হইল আর দেশের অন্তস্তলে যে গঠনক্রিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল তাহাও খানিকটা ব্যাহত হইল।

বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনায় উপরের কথাগুলি স্মরণীয়॥

২

ভারতীর দলের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া নবীন সাহিত্যিকেরা "বাস্তব"-প্রবণ হইলেন। অর্থাৎ কল্পনার ঘোড়দৌড় ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সন্নিকট পারিপার্শ্বিকের দিকে তাঁহাদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মোগলাই ভারতবর্ষ ও বঙ্কিমী বাঙ্গালা ও গার্হস্থ্য কলিকাতা ছাড়িয়া সমাজের দরিদ্র কুৎসিত অবজ্ঞাত ও ছায়াচ্ছন্ন অংশের দিকে নজর দিলেন। এ দৃষ্টি ঘোলাটে তবুও আগেকার দরিদ্রনারায়ণী, সমাজ-সংস্কারী বা ভলন্টিয়ারী দৃষ্টি নয়। ইহার মধ্যে ছিল কিছু সমবেদনা, কিছু জিজ্ঞাসা, খানিকটা রোমান্টিক কল্পনাবিলাস, এবং সর্বোপরি "হঠাৎ ডিমক্র্যাসির" প্রেরণা। কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন "বস্তি"-বিলাস হইয়া দাঁড়াইল। এ বিলাসমোহ অবশ্য বেশিদিন থাকিল না। অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি এবং শক্তি-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক কমিয়া আসিল।

এই "বাস্তব" বিলাসিতার বা "বাস্তব" দৃষ্টির প্রথম উন্মোচন ভারতীর আসরে।[১] লালন খানিকটা নারায়ণের পৃষ্ঠায়।[২] স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু হইলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৮২)। ইনি আইন-অধ্যাপনাসূত্রে ঢাকায় গিয়া ধীরে ধীরে যে সাহিত্যিক মণ্ডলী উদ্বুদ্ধ করিলেন তাঁহারাই গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায় এই "বাস্তব" বা "আধুনিক" ভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়

[১] তুলনীয়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঠকোঠায়' (পৌষ ১৩২৮)।

[২] শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহারই মাধ্যমে ঢাকার তরুণ ছাত্র ও ভাব-শিষ্য শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কৈশোর কবিতা ('যাত্রী') নারায়ণে বাহির হইয়াছিল (ফাল্গুন ১৩২৮)।

করিয়াছিলেন। ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া আসিলে, দলভাঙ্গা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯২৩)। কল্লোলের বীজ বোনা হইয়াছিল ঢাকায়,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)। স্বভাবতই বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাসের আওতায় এ বীজ সতেজে প্ররূঢ় হইতে পারে নাই। কল্লোলের প্রবাহ কিয়দ্দূর গড়াইলে পর ইহার একটি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়—'প্রগতি' (১৯২৭)। কলিকাতায় আগেই হইয়াছিল—'কালি-কলম' (১৯২৬)। তখন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ভক্ত পাঠক। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পোষকেরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্র মহিমা ইঁহাদের কাছে প্রতিভাত হয় নাই। তাহার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য যে প্রাচীন-ঐতিহ্যকে স্বীকার করিয়া বিচিত্রভাবে বিকশিত সে বোধ তাঁহাদের ছিল না। আর একটা কারণ, নব নব সৃষ্টির অভিমুখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিশীলতা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তা ছাড়া আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের দ্বারা ইঁহারা অনেকটাই অভিভূত ছিলেন এবং সেই প্রভাবের ফলে ইঁহারা যেন এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রচনা করিতে লাগিলেন এবং সেই রচনার প্রচারও জোর গলায় করিতে থাকিলেন। সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজ সমান জোর দিয়া করিতে গিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইঁহাদের রচনায় ও প্রচারে উগ্রতা ও আতিশয্য দেখা দিল। ইঁহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন প্রথমেই উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনামুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে। ইঁহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা, এবং দৃঢ় ধারণা—যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ইহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের কবিতা 'আবিষ্কার'[১]—অর্থাৎ আত্মাবিষ্কার।

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরিনা কভু, …

[১] কল্লোল (কার্তিক ১৩৩৬), প্রথম রচনা।

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর,—

আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।

গভীর আত্মোপলব্ধি এ আমার দুর্দান্ত সাহস,...
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা!

... আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক্ আয়ু ঊর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখনী!

স্পষ্ট রবীন্দ্র-বিদ্বেষ না থাকিলেও রবীন্দ্র-বিমুখতা ছিল অনেকেরই। ঢাকাই (বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সাহিত্য) সমাজ রবীন্দ্রনাথের স্থানে শরৎচন্দ্র ও নজরুলকে বসাইয়াছিল, একথা স্মরণ করিব।

বয়সের বৃদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় "তরুণ" সাহিত্যিকদের এই যে দৃষ্টি-আবিলতা তাহা নিঃশব্দে কাটিয়া যাইত যদি না বিরুদ্ধবাদী কোন কোন লেখকগোষ্ঠী[১] তাঁহাদের পত্রিকায় ইঁহাদের রচনার টুকরা সাধারণ পাঠক-সমাজে রুচিকর অপথ্য হিসাবে মাসে মাসে পরিবেশন না করিত। আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মত কাগজ প্রকারান্তরে এই রোচক "বাস্তব" সাহিত্যেরই বাজার-দর বাড়াইয়া দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কিন্তু এখনও রেহাই নাই। সবুজপত্রের তাড়নায় বিপিনচন্দ্র পাল অনেকদিন ক্ষান্ত এবং শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া নিরস্ত। এখন বিরোধ করিতে আসিলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁহার পিছনে রহিল তাঁহার ঢাকার দল, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার ও "তরুণ" আধুনিক সাহিত্যিকেরা। ইঁহারা প্রবলভাবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথের যুগ অতীত হইয়াছে, এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনের নঙ্গর ছেঁড়া নবীন, "অতি আধুনিক" যুগ। এ যুগের নেতা গল্পে-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় নজরুল ইসলাম (ও মোহিতলাল মজুমদার[২])।

[১] যেমন, 'শনিবারের চিঠি'। প্রথমপ্রকাশ সাপ্তাহিক (নভেম্বর ১৯২৪) পরে মাসিক রূপে। নবপর্যায় ১৩৩৪ হইতে।

[২] "বাঙলা কাব্যের নবতম সম্ভাবনার প্রতি যিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, রবীন্দ্রনাথের (ও সত্যেন্দ্রনাথের) অনুকরণে তিনিও প্রথমে স্বপ্ন ফিরি করে' বেড়াতেন, কিন্তু সেই কবিরই পরিণত বয়সের রচনায় বর্তমান অতি-আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে আছে।" (প্রগতি, আষাঢ় ১৩৩৬)।

অতি-আধুনিক লেখকদের প্রতিপক্ষেরাও মুখর হইলেন প্রতিবাদে। তাঁহাদের মতে "অতি-আধুনিক" সাহিত্য অশ্লীল, অপাঠ্য, কুৎসিত রচনা যাহার উৎপত্তি লেখকদের মানসিক অসুস্থতায় এবং যাহার প্রেরণা আসিয়াছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান হইতে। ধীরমতি মধ্যস্থ যাঁহারা তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে "অতি-আধুনিক" লেখকদের কেহ কেহ শক্তিমান বটেন, তবে তাঁহাদের রচনার বস্তু বিদেশের ধার করা; তাঁহারা যে সমস্যার প্রবর্তন করিতে চাহেন সে সমস্যা আমাদের দেশে সামাজিক অথবা পারিবারিক সমস্যারূপে গুরু আকার ধারণ করে নাই।

> আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে-সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।
>
> তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল ঢুঁড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক যাঁহারা সত্যসত্যই হাতে হাতিয়ারে "লজ্জা ঘৃণা ভয়" এই তিনকে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যেসব অবধূতমার্গ অঘোরপন্থী তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। একাধিকে হয়ত শিল্প-রচনার দিক দিয়াই দেখাইয়াছেন বিশেষ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য—বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাব উভয় হিসাবে তাহাদের হাতে পাইয়াছে একটা বিশেষ পুষ্টি ও ঋদ্ধি, তবে কথা এই, এই শিল্প হইতেছে মুখ্যতঃ পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের জিনদানার (—কথাগুলি সদর্থেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা আমার অভিপ্রায় নয়।—) শিল্প, দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।[১]

রবীন্দ্রনাথ সর্বথা ও সর্বদা জীবনের তথা সাহিত্যের উদারতম ভাবক। অতি-আধুনিকদের মধ্যে যাঁহাদের রচনার ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু "অতি-আধুনিক" সাহিত্যের নামে যে কাদাখেড়ু চলিতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু করিবার ছিল না। তাঁহার প্রতি "অতি-আধুনিক"দের অপ্রসন্নতা একরকম স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তবুও তাহাদিগকে তাঁহারই দ্বারস্থ হইতে হইল। "অতি-আধুনিক" সাহিত্যের অনুরাগী অথচ

[১] 'আধুনিকতম সাহিত্য', শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত (বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪)।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন দুই-চারিজন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন অতি-আধুনিক ও অনতি-আধুনিক সাহিত্যের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করিতে রাজি হইলেন। তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা সদনে সভা ডাকা হইল দুই দিন, চৌঠা ও সাতই চৈত্র ১৩৩৪। প্রথমদিনে শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, দ্বিতীয় দিনে আলোচনা। আলোচনায় কিছুই সিদ্ধান্ত করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে যে পরিষ্কার ইষু ধার্য করিয়া দিলেন[১] দলাদলির পাণ্ডাদের তাহা স্বভাবতই মনঃপূত হইল না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, সাহিত্যশিল্পের বিচারে রূপসৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য। ভাব ও ভাষা ভেজাল ধারকরা বা চোরাই মাল হইলেও ক্ষতি নাই যদি তাহার দ্বারা কোন নূতন রূপের প্রকাশ হয়। মাইকেল ও বঙ্কিম বিদেশী সাহিত্য হইতে মালমশলা ও প্যাটার্ন লইয়া আমাদের সাহিত্যে নূতন রূপের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন ; "তারা বল্‌লে না যে, এটা বিদেশী, এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে"। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন"।[২] তাহার পর রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক" সাহিত্যের আধুনিকত্ব বিশ্লেষণ করিলেন।

> সাহিত্যের যুগ বল্‌তে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া কর্‌বার সময় হয়েচে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো-একটি ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাস-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাসের জোরে যে-সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ কর্‌তে দাঁড়ায় জান্‌ব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে ব'লেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেচে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেচে সেই লিখেচে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তক্‌মাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনে বারো আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তাহ'লেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হ'বে না—কেন না তার পনেরো আনাই হ'বে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তার নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন, সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ—সেটা ভিন্ন লোকের

[১] 'সাহিত্যরূপ' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫)।

[২] আধুনিকেরা একথার জবাব দিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তবুও বলিলেন, "উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নবী নব জন্ম-সম্ভাবনা" ('আবিষ্কার', কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬)।

ভিন্ন রকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বল্‌বার চেষ্টা হয় যে, যে-হেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও অসঙ্গত। পাগলামীর মতো অপূর্ব আর কিছু নেই—কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব-ঘোষণাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে শুদ্ধ নয়। তার চল্‌তিধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা-নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কালই তা আবর্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্‌চারের লক্ষণ বলে মানি। চল্‌তি স্রোতে যা-কিছু সব শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হ'য়ে যায় এবং ভাবী কালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুবরূপ পায় এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে-সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্চ্ছা আক্ষেপ দেখা যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান্ ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক।

এই তো গেল সাহিত্যের রূপ। সাহিত্যের ধর্ম লইয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রবন্ধ লিখিলেন।[১] তাহার প্রতিবাদ করিলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্যধর্মে সীমানা' বিচার করিয়া।[২] নরেশচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাহিত্যধর্মের সীমানা লঙ্ঘন-অপরাধী।

শারীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া "হৃদয়-যমুনা", "স্তন", "বিজয়িনী", "চিত্রাঙ্গদা" প্রভৃতি বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমানা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন্ বই, ভিতরেই বা কোন বই,—তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দেশই কবি দেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের জবাব দিলেন।[৩] নরেশচন্দ্র লিখিলেন তাহার কৈফিয়ৎ।[৪]

এই বাদ-প্রতিবাদে অতি-আধুনিকেরা সুবিধা করিতে না পারিলেও নিজেদের

[১] বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৫। [২] ঐ, ভাদ্র। [৩] ঐ, আশ্বিন। [৪] ঐ, অগ্রহায়ণ।

কোট ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর যখন 'শেষের কবিতা' বাহির হইল[১] তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা ত্রিশঙ্কুর অবস্থাপন্ন। বুঝিলেন, যে টেকনিক "অতিআধুনিক"দের কাম্য অথচ নাগালের বাহিরে তাহাতে কেমন অনায়াসে সাহিত্যে নূতন রূপের সৃষ্টি হইতে পারে। কথায় ও লেখায় যে কথা স্পষ্টভাবে বলা অসম্ভব ছিল সে কথাও তিনি সহজে বুঝাইয়া দিলেন,—যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে দেউলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া নিজেদের নূতন কারবার ফাঁদিতে চান তাঁহাদের মূলধন রবীন্দ্রনাথের কাছেই ধার করা। রবীন্দ্রনাথই নিবারণ চক্রবর্তী, যিনি পদে পদে নিজের শিল্পের মোহ কাটাইয়া নূতনতর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

> মিতা কি ক'রে জান্‌বে তুমি কী বলো, আর সে বলার কী অর্থ! আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাক্‌তে হ'ল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হ'য়ে যায়নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা।

অতি-আধুনিকেরা "বিবাহের চেয়ে বড" নর-নারী-সম্বন্ধ লইয়া বড়াই করিতেছিলেন। সে সম্বন্ধের সাহিত্যে রসরূপটি কি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি দিক ঘরে-বাইরেতে দেখাইয়াছিলেন, আর একটি দিক এই শেষের-কবিতায় দেখাইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি স্মরণীয়।

> পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়, তার মানেই হচ্চে পরকীয়া আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার প'রে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্য বিবাহ যখন বর্বর যুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশী হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া সাধনার যুগ এসেচে ব'লেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।[২]

তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির অস্বীকৃতি তাহাদের দ্বারা যাহারা সেই সাহিত্যেরই অধমর্ণ —ইহা রবীন্দ্রনাথের মনে লাগিয়াছিল। শেষের কবিতা লিখিয়াও তাঁহার ক্ষোভ মিটিয়া যায় নাই, 'বাঁশরী'তে (১৯৩৩) কঠিন ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তবে অতি-আধুনিকদের সম্বন্ধে আশা তিনি একেবারে ছাড়েন নাই। ক্ষিতীশের সম্বন্ধে বাঁশরী লীলাকে বলিতেছে,

[১] রচনাকাল জুন ১৯২৮ ; প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫।

[২] শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪)।

অবিচার করিস্‌নে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে ভিতরে পোকা হোতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে।

শেষের-কবিতার ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। সত্তর বছরের জয়ন্তী-উৎসবে (১৩৩৮) অতি-আধুনিকেরা আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

'শেষের কবিতা'র পর গদ্য-কবিতা। "নূতন" কবিতার নবীন কবিরা বাক্য-হারা হইয়া গেলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে মানিয়া লইতে হইল—মনে না হোক মুখে। প্রগতিবাদ ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা এখন নিজেদের নিজেদের ঘাঁটি আগলাইয়া গোষ্ঠী-গঠনে মন দিলেন। ইঁহাদের সাহিত্যচর্চা একটু মোড় ফিরিল॥

৩

স্বল্পজ্ঞাত ও স্বল্প-প্রচারিত "অতি-আধুনিক" সাহিত্যকে তুচ্ছ করিতে ও ভ্যাংচাইতে গিয়া শনিবারের-চিঠির দল প্রকারান্তরে তাহাই পরিজ্ঞাত ও পরিচিত করিয়া দিয়া দর বাড়াইয়া দিয়াছিল, সে-কথা বলিয়াছি। আসলে শনিবারের-চিঠি কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিককে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের যোগান দিবার জন্যই প্রথম বাহির হইয়াছিল। এই উদ্যোগের মূলে ছিলেন শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস আর পিছনে ছিলেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও তাঁহার বন্ধুগণ। এই দলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকও দুই-একজন ছিলেন। প্রবাসী আফিস ইহার জন্মভূমি। শনিবারের-চিঠির ব্যঙ্গবাণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিলেন তিনজন—কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। শনিবারের-চিঠিতে ইঁহাদের বিকৃত নাম ছিল যথাক্রমে "গাজী আব্বাস বিটকেল", "মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল" এবং "ক্ষীণেন্দ্র খেয়াল গায়"। ব্যক্তিবিশেষ লক্ষ্য হইলে ব্যঙ্গকৌতুকের মাত্রা ঠিক রাখা যায় না। শনিবারের-চিঠিও তা পারে নাই। কিছুদিন বন্ধ থাকিবার পর পত্রিকাটি মাসিক রূপ ধারণ করিল, এবং শিকারের ক্ষেত্রও বাড়িয়া গেল। তখন সহজ ও সুপ্রচুর লক্ষ্য হইল "আধুনিক সাহিত্য" ও "আধুনিক সাহিত্যিক"। বাছা বাছা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার ফলে সাধারণ (প্রধানত অল্পবয়স্ক) পাঠক "আধুনিক সাহিত্য"এর মজাদারত্বের পরিচয় পাইল এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের নাম সুপরিচিত হইল। প্রবীণ সাহিত্যিকেরাও সকলে রেহাই পাইলেন না। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নয়—তাঁহার সাহিত্যও নয়, ছবিও নয়। প্রথম

লক্ষ্যদের অন্যতম মোহিতলাল মজুমদার নিজেই শিকারীর দলে ভিড়িয়া গেলেন এবং রবীন্দ্র-বিদ্বেষ-বিষ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছড়াইতে লাগিলেন। শনিবারের-চিঠিতে সৃষ্টির কাজও অল্প-স্বল্প হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের ও শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর গদ্য রচনা এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি। ভালো প্রবন্ধ এবং গল্প-উপন্যাসও বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শনিবারের-চিঠির বিশেষ ছাপ নাই।

কল্লোল-কালিকলমের কর্তৃপক্ষ দল বাঁধিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লড়াই করেন নাই। কিন্তু প্রগতির পরিচালকেরা গোড়া হইতেই দুই ভূমিকা লইয়াছেন, ফরিয়াদীর এবং উকীলের। এ ব্যাপার আমাদের দেশে আগে হয় নাই। প্রমথনাথ চৌধুরীও করেন নাই। নিজেদের সাহিত্যমতের ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রোপাগ্যাণ্ডা রীতিমত ভাবে এই-ই প্রথম। ইহার ফলও মিলিয়াছে। "অতি-আধুনিক" সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত প্রোপাগ্যাণ্ডার জোরেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন।

কল্লোল-পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ব্যক্তি ভাগীদার আছেন। তিনি ডি-এম লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ কল্লোল-গোষ্ঠীর রচনা পুস্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়া-ছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত॥

৪

ঢাকার দল ভাঙ্গিয়া গেলে প্রগতিচালকদের কেন্দ্র কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। ঢাকায় যে ভাঙ্গা দল রহিয়া গেল তাহা প্রগতিচালকদের বামপন্থী, এমনকি তাহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ্টা বলা চলে। প্রগতিওয়ালাদের সঙ্গে এই বামপন্থীদের মিল ছিল শুধু রবীন্দ্র-বিদ্বেষে। যতদিন প্রগতিওয়ালারা রবীন্দ্র-বিমুখ ছিলেন ততদিন বামপন্থীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নাই। এখন অবস্থা পাল্টাইয়া যাওয়ায় ইঁহারা দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করিবার জন্য সাজিয়া আসিলেন। যুদ্ধ আসলে একাই করিলেন সব্যসাচী মোহিতলাল মজুমদার—লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, একদা রবীন্দ্রভক্ত ও ভারতী-গোষ্ঠীভুক্ত, অধুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের শিক্ষক।

মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথকে খর্ব করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলকে তুলিয়া ধরিয়া একটা কাল্‌ট্ বানাইতে ব্রতী হইলেন।

মোহিতলাল (তথা ঢাকার ভাঙ্গা দল) ভর করিলেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই "প্রবীণ" দলের মনোভাব কেমন দাঁড়াইল তাহার একটু প্রমাণ দিই। প্রথম সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে পৌষ (১৩৩৯) সংখ্যা প্রবাসীর সমালোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হইয়াছিল,

> সন্ধ্যা সঙ্গীতের নূতন রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া' লেখা সমাপ্ত করিয়া হঠাৎ যেদিন 'শেষের কবিতা'র দুর্ভাগ্য নিবারণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে পুরাতন মনে করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সেদিনই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে তখন অতিনূতনে পাইয়া বসিল। পুরাতনের ধারা ছিন্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিনব হইতে চাহিলেন। সুরের ওস্তাদের সুর কাটিল, তাল কাটিল।
>
> পৌষের প্রবাসীর প্রথম কবিতা 'শুচি' পুরাতন রবীন্দ্রনাথের সেই নূতন সুরকাটা তালকাটা কবিতা। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী পাঠক এইগুলিকে গদ্য-কবিতা আখ্যা দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের পূজাভাষ জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে।

এই বছরের বঙ্গশ্রীতে মোহিতলাল মজুমদার ("শ্রীসত্যসুন্দর দাস" ছদ্মনামে) 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধের শেষে লেখক সব ছাড়িয়া সেই "কর্তিতপুচ্ছ শৃগালক"কে লইয়া পড়িয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'! মোহিতলালের বক্তব্য,

> 'চিত্রাঙ্গদা'-র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ নূতন নহে; স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক সময়ে এই লইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদেশী সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ-ভক্ত টমসন সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে এই অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই, কতকটা স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। আমি ঠিক এই ধরণের অভিযোগ সমর্থন করি না; 'চিত্রাঙ্গদা'-র যাহা প্রধান দোষ তাহা অশ্লীলতা নয়, দুর্নীতি; তাহাতে ভাষাগত অশ্লীলতা ত নাই-ই, অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে ধরণের দুর্নীতি এ কাব্যের প্রধান দোষ, তাহা কল্পনাবস্তু ও কল্পনাভঙ্গিতেই প্রকট হইয়াছে। আমি যে দুর্নীতির কথা বলিতেছি তাহা নীতি-বাগীশের দুর্নীতি নহে; কবির কল্পনায় যে ভাব-বঞ্চনা রহিয়াছে, সৃষ্টির সত্যকে উপেক্ষা করিয়া একটা অযথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা উহাতে লক্ষিত হয়—এ কাব্যের সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূল কারণ তাহাই; ইতিপূর্বে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই।[১]

রাগ ও বিরাগ—দুই ভাব হইতেই জানা গেল যে রবীন্দ্রনাথের পথ অপরের

[১] জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ ৫২৩।

অনুগমনীয় নয়। যিনি master তিনি যে শিল্পসৃষ্টি করেন তাহা স্বসম্পূর্ণ। তাহার অনুকরণ করিলে কপি হইবে শিল্প হইবে না, তাহার উন্নয়ন পাগলের কল্পনা। নবীন-প্রবীণ দুই দলেই এ কথাটা অবশেষে বুঝিলেন। তবুও এটুকু অনেকে বুঝিলেন না যে রবীন্দ্রনাথের কালান্তর নাই, কোন বড় কবিরই নাই। সুতরাং যখন "উত্তর-রৈবিক" কাব্যের দাবি শুনি তখন মনে জাগে রবীন্দ্রনাথেরই বাণী—

কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে॥

একাদশ পরিচ্ছেদ

কবিতায় তৃতীয় দশক

১

দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহবাসী ভাবুকতা ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ-মঞ্জুলতা, কিরণধন্ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৮৭-১৯৩১) কবিতায় একটু নূতনতর রসের আভাস দিল। কবির জীবন দীর্ঘ হয় নাই, কবিতালেখার জন্যও বেশি সময় পান নাই। মোটামুটি বলা যায় বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাঁহার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি রচিত। ইঁহার কাব্যগ্রন্থ একটিমাত্র 'নূতন খাতা' (১৮২৩)।[১] কিরণধনের রচনা প্রচুর নয়, তাহাতে খুব ক্ষতি হয় নাই। কবির যে বিশিষ্ট অনুভব তাহাতে বেশি কবিতা লেখা চলিত না।

কিরণধনের কবিতায় ঘরোয়া প্রেমের মৃদুসৌরভটুকু পাওয়া যায়। যেমন 'আব্দারের আধঘণ্টা'য়

> ওদিকেতে চেও না, চাও এই দিকে ;
> আলোটা নিভে আসে দাও করে ঠিক ;
> লাগচে চোখে আলো ক'রে দাও কম ;
> ঐ যা, বাতি গেল নিভে একদম !

অথবা 'আব্দারের বেড়ি'তে

> কাল রাতে ভাল করে হয়নিক ঘুম,
> কাঁদবে যে খোকা, তাকি আগে জানতুম ?
> শোবো তারে নিয়ে আজ আলাদা না হয়,
> দেখো দেখো হবে ঘুম আজ নিশ্চয়।
> কথা তুমি শোনোনাক এই ভারী দোষ,
> ব্যথা দিলে পরে মনে পাবে আফ্‌শোষ,
> তাই বলি কাল যেও, থেকে যাও আজ,
> ঐ দেখ বিদ্যুৎ পড়ে বুঝি বাজ !

পত্নীবিয়োগে কবির বেদনা প্রকাশিত দুই তিনটি কবিতায়। সেগুলি কিরণধনের শ্রেষ্ঠরচনার অন্তর্গত। 'ব্যথার স্মৃতি'তে সদ্যোবিরহীর উৎকণ্ঠা।

[১] দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের দুই-একটি কবিতা বর্জিত এবং নূতন তিনটি কবিতা গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের সম্পাদনায় তৃতীয় সংস্করণ 'নূতন-খাতা ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা' প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫২)।

চুড়িওলা হাঁকে, জানালার ফাঁকে কতজনা ডাকে—'এ বাড়ী!'
আধ-ঘোমটায় মুখ দেখা যায়, মন চমকায় ফি-বারই।
বাসন্তী রং কাঁচের বাসন আরো কি-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে-ডেকে কে তাদের দেখে নিরখি!

'উড়ো চিঠি'র ভাবুকতায় কবিত্বের সহজ প্রকাশ।

কে পাঠালো উড়ো চিঠি বসন্তের এই রঙীন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস্ তোরা কোন্‌খানে সে কোন্ ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভাল আছে জানা।
বকুল বলে—না না না না
কাজ কি গোলাপ পরের কথায়?
চাঁপা বলে—কথা আমি কইব নাক তোমার সনে,
মানুষগুলো এমনি খেলো কিছু কি তার রয়না মনে?
আমি ত কই যাইনি ভুলে
সেই কালো সেই রেশমী চুলে,
নরম নরম দু আঙুলে
আমায় তুলে পোরতো খোঁপায়।

'ব্যথার ভুল'এর শেষ লাইনটিতে একটু মোহকর মাধুর্য আছে—

স্বপ্ন-জাগরণের মায়া সঞ্চরে তার এলো চুলে!

২

সমসাময়িক ও সমবয়স্ক কবিদের হইতে মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) খানিকটা ভাবগত স্বাতন্ত্র্য আছে। মোহিতলাল নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, বোধ করি অতিসচেতন ছিলেন, এবং তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে একটা মনগড়া কাব্যিক আদর্শ—সুন্দরতৃষ্ণা—ও আধ্যাত্মিক (কতকটা আধিদৈবিকও বলা চলে) মতবাদ প্রায় সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। (প্রথমদিকের গদ্যরচনায়—যেমন 'তুমি' (মানসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)—'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'এর আতিশয্য আছে। 'সুন্দর' কবিতায়ও (ঐ, আষাঢ়) তাহাই পুনরুক্ত।) এই "আধ্যাত্মিক" মতবাদ খুব স্পষ্ট নয়। তবে তাহাতে ছিল বৈষ্ণবতার সঙ্গে বেদান্তের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা। বৈষ্ণবভাবটুকু পাইয়াছিলেন তিনি আত্মীয়-গুরুজন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে, আর বেদান্তাশ্রিত তত্ত্বটুকু পাইয়াছিলেন 'অভয়ের কথা'[১] ও 'ঠাকুরাণীর কথা'[২] রচয়িতা

[১] প্রথমপ্রকাশ মানসী ১৩২০।

[২] প্রথমপ্রকাশ (অংশত) মানসী, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩২১। মোহিতলালের কবিতার অভিনব বৈষ্ণব-শক্তিবাদের উৎস-সন্ধান এই রচনাটিতে মিলিবে। "তবেই বেদান্তবেদ্য চরম তত্ত্বটী, একান্ত এক অক্ষয় নারীতত্ত্বই হইল নাকি? শ্রীরাধাই কি মূলা আদ্যাপ্রকৃতি শক্তি।"

অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ভাদ্র ১৯১৪) কাছে। দেবেন্দ্র-নাথের প্রভাব খুব গভীর, এইজন্যই তাহা মোহিতলালের অনেক রচনায় সহজে বোঝা দায়। ক্ষেত্রমোহনের প্রভাব তত গভীর নয়। তাহা তাঁহার প্রসিদ্ধতর কবিতাগুলিকে ভারি ও গুরুপাক করিয়াছে।

বাঙ্গালা কবিতাক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রকৃত আবির্ভাব ১৯১৯ সালে যখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাশিল্প সমসাময়িক কবিতালেখকদের উপর ব্যাপক ও প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার পূর্বেও মোহিতলাল কবিতারচনা করিতেন এবং সে রচনা দুই চারিটি কোন কোন পত্রিকায় বাহিরও হইয়াছিল। যেমন, ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'জাহ্নবী'তে প্রকাশিত 'জীবন ও মৃত্যু' নামক সনেট-যুগ্ম। কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'জীবন'এর শেষ দুইছত্র

> ক্ষুদ্র সে প্রাণীর তরে ক্ষণিক জীবন ;—
> জগতের অন্তঃপুরে কোথায় মরণ !

'মৃত্যু'র আরম্ভ ও শেষ

> হেমন্তের মৌনস্নিগ্ধ সায়াহ্ন ছায়ায়
> হিম অবসাদ যথা নেমে আসে ধীরে—
> তেমতি তুমিও প্রিয় আসিবে কি হায়,
> জীবনের বেলাশেষে ?...
>
> কার মাঝে ওগো সখা সে বা কতদুর,
> সবলে আমারে যেথা লইবে টানিয়া ?
> সেকি সুপ্তি—অন্ধকার রজনী-বন্ধন ?—
> অথবা আলোক মাঝে চির জাগরণ !

১৯১২ সালে মোহিতলালের 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'—ক্ষীণকায় পুস্তিকা, তের-পৃষ্ঠার—বাহির হয়। ইহাতে আছে ষোলটি চতুর্দশপদী কবিতা। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রশস্তি। বইটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগ্রন্থগুলির আকারে, সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইয়া মোহিতলাল ভারতীর আসরে যোগ দেন এবং ভারতী পত্রিকায় তাঁহার অনুবাদ ও মৌলিক কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই কবিতাগুলি তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ, মণিলালের

উদ্যোগে প্রকাশিত 'স্বপন-পসারী'তে (১৯২২)[১] সঙ্কলিত আছে। স্বপন-পসারীর অনেকগুলি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিল্পের অনুসরণ দেখি।[২] সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন[৩], কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্রপ্রভাব জাগিল।[৪] যেমন,

তার সে ভুরুর এক্‌টুকু চাঁদ আধ্‌ ঢাকা
'রোজা'-র উপোস ভেঙে দিল যেন 'ইদ্‌'-রাতে!
রাত হ'ল দিন সেই আতশের রোশ্‌না'য়ে—
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল নিদ্‌ প্রাতে!
ইয়ারা! তোমার পিয়ালা শপথ—সেই দিনই
শরাব-খানার পথটি প্রথম নেই চিনি'!
পথে বাহিরিনু, পিরাহান্‌ মোর মদ-মাখা—
সেই দিন হ'তে ঠাঁই নাই আর 'ঈদ্‌গা'-তে![৫]

ইহার সহিত তুলনা করুন সত্যেন্দ্রনাথের 'পেয়ালার প্রেম (উর্দ্দু হইতে)'।[৫]

ভাল নাই বা বাসিলে হায় সাকী।
এই পেয়ালা বাসিল! তায় বা কি?
সরাবখানাই হ'ল মশ্‌গুল
সবারের ফেনা গায় মাখি'।
পেয়ালা বাসিল তায় বা কি?...

কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটিতে দেরি হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ ভারতী ১৩৩০ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'কালাপাহাড়' ও 'স্মর-গরল'এ (১৯৩৬) সঙ্কলিত 'রুদ্র-বোধন'। সত্যেন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।[৬] বিশুদ্ধ সত্যেন্দ্র-রীতির নমুনা,

যৌবনের মউ-বনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি,
দুপুর-বিজন ঝরণাতলায় এক্‌লা বসে চুল খুলি'।
পূর্ণিমারই ঢেউ উঠেছে রূপ-সায়রের মাঝ-খানে—
থির রহে না মোতির মালা, উঠ্‌ছে কানের দুল্‌ দুলি'![৭]

১ দ্বিতীয়-সংস্করণে (১৯৪১) সাতটি কবিতা বেশি আছে। প্রথম সংস্করণে কবিতা-সংখ্যা তেতাল্লিশ। ২ তবুও আছে যেমন 'বসন্ত-আগমনী', 'মহামানব', আবির্ভাব', 'ইরাণী', ইত্যাদি।

৩ 'দিল্‌দার', 'হাফিজের অনুসরণে', 'বেদুঈন' ইত্যাদি।

৪ 'গজল্‌-গান' (প্রথমপ্রকাশ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮)।

৫ মানসী, ফাল্গুন ১৩২৭ পৃ ৩৮-৩৯।

৬ বিস্মরণীতে সঙ্কলিত 'শব-সঙ্গীত', 'অগ্নি-বৈশ্বানর', 'বাদল-রাতের গান', 'ঘুঘুর ডাক' দ্রষ্টব্য।

৭ 'ইরাণী' (স্বপন-পসারী)।

'কিশোরী', 'লীলা', 'ভ্রান্তি-বিলাস', প্রভৃতি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের ছাপ অভ্রান্তভাবে পড়িয়াছে। পরে এই প্রভাব চাপা পড়িলেও লুপ্ত হয় নাই। যেমন,

মনে হ'ল, একি সেই ?—কণ্ঠে যার পরাইনু
সর্ব্বসুখ-বিনিময় পণে
কল্পনার পঞ্চনরী ! (ধুক্‌ধুক্‌ করে বুকে
পাঁচখানি ধুক্‌ধুকি তার)—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত রসে—এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার ![1]

এত চুপিচুপি এয়োরা সাজায় বরণ-ডালা—
সিঁদুরের ঝাঁপি খুলে তুলে রাখে গোধূলি-বালা !
এক কোণে হোথা বাখানে কেহ বা কনে'র সিঁথি,
পরখিছে কেহ ঝাঁপ্‌টার মণি-মুকুতা-বীথি ।[2]

মোহিতলালের কবিতার ভাষায় যে মাঝে মাঝে মাইকেলি পদ বা বাক্যাংশ দেখা যায় তাহা দেবেন্দ্রনাথের সূত্রেই প্রাপ্ত।

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও বেদান্ত অদ্বৈতবাদ মিশ্রিত যে জীবনদৃষ্টি মোহিতলাল স্বীয় কাব্যসাধনায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তান্ত্রিক শবসাধনার সঙ্গে ওমর-খয়্যামি দেহবাদও ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এই বিভ্রান্ত দৃষ্টির প্রথম পরিচয় মিলিল 'অঘোরপন্থী'তে[3]।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার,
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি' সার !
তখন মাথাটি রিম্‌ঝিম্‌ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে,
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার, পড়গো সবাই ঢুলি'।

এই আইডিয়াটিই 'মৃত্যু' কবিতায় অন্যরকম রূপ লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চুপিচুপি আসা 'মরণ'কে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,

কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্মের নামে পরিচয় করে' থাকা—

[1] 'রূপ-মোহ' (স্মর-গরল)। [2] 'চাঁদের বাসর' (ঐ)। [3] প্রথমপ্রকাশ, ভারতী ১৩২৬।

সে কথা বলিনা, দেখেছ কি কভু তারে,
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে ?

যে মৃত্যুকে কবি সম্মুখে দেখিয়াছেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন সে মৃত্যু দুঃস্বপ্নের মত ; কবিতা শেষ হইবার পূর্বেই বিস্মৃত হইয়াছে। কবি চাহিতেছেন দুঃখসুখ ভোগের শেষে শান্ত নির্বাণ।

ঝিরি-ঝিরি নিশা-বায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি'—
ধরণীতে মাথা রাখি,—
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক !

দেহের বাহিরে দেবতার মন্দির নাই, কামনাই নিত্য ও সত্য, এবং বাসনার হুতাশনে আত্মসমর্পণই পরমদেবতা মদনের আরাধনা—এই ভাবটি মোহিতলালের বিশিষ্ট ও গম্ভীর কবিতাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত।

আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই !
সুখ-দুখ ভুলে যাই !
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা লাগি' কুলবালা।[১]

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী
দেবতারে স্পর্শ করি করি যে প্রণাম।[২]

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা।...
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না !
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত ![৩]

আজ আর নাহি ভয়, দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম আর হেথা নাই—
স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা !
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই !
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা।[৪]

১ 'ব্যথার আরতি' (বিস্মরণী)। ২ 'স্পর্শ-রসিক' (ঐ)।
৩ 'স্মর-গরল' (স্মর-গরল) ৪ 'বুদ্ধ' (ঐ)।

স্বপন-পসারীতে নাম-কবিতাটির[১] মত অ-তত্ত্বগর্ভ কয়েকটি কবিতায় গীতিকাব্য-গুঞ্জরণের স্মরণীয় ইঙ্গিত আছে। এমন কবিতায় মোহিতলাল বাঙ্গালা গীতি-কবিতার মূল ধারাকে সবলে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই। যেমন,

> তাই বটে, এ যে তাহারি লিখন—সবুজ মলাটে জোড়া
> পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া!
> কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
> প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদল-রাতের গানে।[২]
>
> আকাশের তারা বকুলের মত ঝরিছে তরুর মূলে,
> পুঁথির লিখন কণ্টকী-লতা—তাও ভরে' গেছে ফুলে!
> মধু-সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
> আপনারি প্রাণ দুইখান হ'য়ে হ'ল বর, হ'ল বধূ![৩]

৩

মোহিতলাল প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাহিত্য-আসরের সভ্য ছিলেন, এবং এই আসরের সভ্যদের মত তিনিও রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে দেখি মানসীর দলে। সেখানেও তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত। (তুলনীয় 'বিজয়িনী' প্রবন্ধ[৪]—"বঙ্গের গীতিকবিতার দেবতা, বাঙ্গালীর Apollo রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা"র রসাস্বাদন।) সেখান হইতে তাঁহাকে দেখা গেল ভারতীর বৈঠকে। তখনো তিনি রবীন্দ্র-অনুগত। ১৯১৯ সালে দেখি মোহিতলাল রবীন্দ্র-কাব্যের নিগূঢ় রসজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ।[৫] কিন্তু হঠাৎ কি হইয়া গেল। অল্পকালের মধ্যেই (স্বপন-পসারী বাহির হইবার কয়েক মাস আগে) রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে মোহিতলালের মত কিছু ফিরিয়া গেল। এবিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। সাক্ষ্যদাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, ভারতী-গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সদস্য। ইনি নাম করেন নাই। তবে অজ্ঞাতনামা শক্তিধর সাহিত্যিক যে মোহিতলালই তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

> বর্তমান বাংলা সাহিত্যের কোন শক্তিধর পুরুষ (ডাঃ নরেশচন্দ্র নন) রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভঙ্গির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেও কিছুকাল আগে থেকে হঠাৎ রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। তিনি মণিলালের আসরে সকলেরই বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হবার পর থেকেই তিনি 'ভারতীর দলে'র প্রায় প্রত্যেকের কাছে হয়েছিলেন চোখের বালির মত।[৫]

১ প্রথমপ্রকাশ, ভারতী, পৌষ ১৩২৬। ২ 'কেতকী'। ৩ 'আঁধারের লেখা'।
৪ 'মাসকাবারি', ভারতী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ ১৩২৬ দ্রষ্টব্য।
৫ 'মণিলালের আসর' (দ্রষ্টব্য পৃ ১৫৪)।

(রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হইবার পরেই মোহিতলাল কলিকাতায় ইস্কুল-মাষ্টারি ছাড়িয়া দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার রূপে যোগ দেন।) মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিদ্রোহের কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকা অসম্ভব নয়। 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে' কবিতায় মনে হয় ইহার কিছু ইঙ্গিত আছে।[১]

তাই আমি কাব্যগীতিমুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ হেন জনতা-বিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা, গণি নাই মানি নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ!
কত ভক্ত নিবেদিল পূজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্য-সম্ভার!
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত,-নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে,—ধন্যবাদ! সে যে হ'ত বড় অশোভন!

মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্র-বিমুখতার পরিমাণ-অনুপাতে ভোগসর্বস্ব দেহতাত্ত্বিকতার ভার বাড়িতে লাগিল। ভারতীর আসর হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং পরে তরুণ "অতি-আধুনিক" লেখকদের দলে যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন।[২] ইতিমধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাইয়াছেন। সেখানকার আবহাওয়া পূর্বাপর রবীন্দ্র-বিরোধী। ঢাকায় থাকিয়া মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিমুখতা নূতন রূপ লইল। তিনি পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্র-কাব্যকে মানিলেন না এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির চ্যাম্পিয়ান রূপে মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়াইয়া "বিশ্ব কবি" রবীন্দ্রনাথকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণমঞ্চ হইল 'শনিবারের চিঠি', কেননা অতি-আধুনিকেরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। স্বভাবতই মোহিতলালের উষ্মা রবীন্দ্রনাথ হইতে অতি আধুনিকদের উপর সঞ্চারিত হইল। এ রাগ শেষ অবধি যায় নাই। ইঁহাদের উপর নিদারুণ বিদ্বেষ।

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!—
কে শোনে তাদের গান?—মাছিদের কল্লোলে হারায়!
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ!—তুমি রবি, তবুও হা ধিক!
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়![৩]

[১] ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮। নিশ্চয়ই কবিতাটিতে ১৩২৮ সালে ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-সংবর্ধনার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

[২] মোহিতলালের 'পান্থ' প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিতা কল্লোলে বাহির হইয়াছিল।

[৩] 'রবির প্রতি' (হেমন্ত-গোধূলি)।

এই দলাদলির ফলে মোহিতলালের সাহিত্যসৃষ্টি বিঘ্নিত হইয়াছিল।

মোহিতলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিস্মরণী'র (১৯২৭) কবিতাসংখ্যা পঁচিশ। অনেকগুলি কবিতা স্বপন-পসারীর সমসাময়িক এবং সহজ আবেগে লেখা। তত্ত্বগর্ভ কবিতার মধ্যে প্রধান হইতেছে 'মোহমুদ্গর' ও 'পান্থ'। মোহমুদ্গরে দেহসর্বস্ব ভোগবাদের সমর্থন। প্রথম দুই স্তবকের উদ্দিষ্ট যথাক্রমে মোক্ষকাম তপস্বী ও শবসাধক কাপালিক। তৃতীয় স্তবকে চ্যালেঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে।

> ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী
> নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—
> কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি, নীরক্ত অধরে,
> উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
> বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি ইন্দ্রজাল,
> আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
> কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
> হে কবি-বাসব ?

জীবনপ্রেমিক কবি, চিরন্তন জীবনপ্রবাহ মানেন না, পুনর্ভবে তিনি বিশ্বাসহারা। তাই কবির অভিনব চার্বাকবাণী,

> কারে চেয়ে ঠেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, হে চিরভিখারী ?
> —আনন্দের ক্ষণ অধিকারী !

কবিতাটির শেষ স্তবকে পৌছিয়া দেখি যে নব-চার্বাকীয় মূড চলিয়া গিয়াছে, মোহিতলাল পূরাপূরি "বঙ্গ-কবি" রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

> এ ধরার মর্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
> তাই রবে ফিরিবার আশা !
> দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি—
> মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি' !
> ক্রোড়ে তার বার বার আহ্বান-আকুল—
> ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
> তারি তরে, ওরে মূঢ় ! জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ-ভালবাসা
> —নবজন্ম-আশা।

'পান্থ' "দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশে" লেখা। কবিতাটির মূল আইডিয়াটি দুর্বল। কবি চাহেন মৃত্যুর পরেও চেতনার প্রবাহ রুদ্ধ হইবে না, এবং নির্বাণ তাঁহার কিছুতেই কাম্য নহে এইজন্য যে তাহা হইলে জীবন-মরণের

অন্তর্বাহী চেতনার ধারা লুপ্ত হইয়া যাইবে। এ চেতনা ঠিক আত্মা নহে, বৌদ্ধমতের সুখ-দুখের অনুভবকারী সংস্কার-প্রবাহ।

আমারে হারাই যদি!—যদি মরি সুচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা!—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা?

এই ব্যথা-বেদনার অভীপ্সা একটা ভঙ্গিমা মাত্র। ইহাকে বলিতে পারি ড্রয়িংরুম দুঃখবাদ অর্থাৎ দুঃখবিলাসিতা।

তৃতীয় 'স্মর-গরল'এ (১৯৩৬) কবিতাসংখ্যা চল্লিশ, তাহার মধ্যে একটিকে ('প্রেম ও ফুল') ক্ষুদ্র কাব্য বলা যাইতে পারে। এটির বিষয় যোগাইয়াছে বোধকরি কবির প্রথম যৌবনের স্মৃতি। 'নারীস্তোত্র'এ কবি যেন নূতনতর শাক্ত মত প্রচার করিতেছেন। নারী কামরূপিণী।

স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ওযে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

নারী চিন্ময়ী এবং মৃণ্ময়ী।

রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়মহারা পীরিতি পরমা।

মানবের মানস-মোহিনী, মানবের দেহ-প্রসবিনী নারীর মাঝে নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিণীকে হেরিয়া

লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ?

'বুদ্ধ' কবিতায় মোহিতলাল নির্বাণকামী ব্রহ্মচর্যকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। 'শেষ-শিক্ষা'য় কবি কামের সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শুনি নাই প্রেমের আহ্বান,
প্রাণেরে পাড়ায়ে ঘুম স্বপনেরে দিয়েছিনু ফাঁকি,
বাজে নাই দেহ-বীণে আত্মহারা কামনার গান।

মোহিতলালের চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি' (১৯৪১)। বইটির দুইটি অংশ,—মৌলিক 'হেমন্ত-গোধূলি', অনুবাদ 'বিদেশী কবিতা'। প্রত্যেক অংশে কবিতার সংখ্যা উনচল্লিশ। বিদেশী কবিতাগুলি সবই আগের লেখা, মৌলিক কবিতার কতকগুলিও তাহাই। মোহিতলালও বোদ্‌লেয়ারের সন্ধ্যা-রাগিণী কবিতাটির অনুবাদ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদের[১] সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য প্রথম দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিলাম।

১ পৃষ্ঠা ৯৯-১০০ দ্রষ্টব্য।

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে, গীতের মূর্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্ছার রেশ, চরণে ছড়ায় ঘুম !

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম !
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ !
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ ।

মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে নূতন কোন ভাবের বা ফর্মের সন্ধান নাই। তবে তত্ত্ববাদের বোঝা নামিয়া গিয়াছে। সবশেষের দিকে লেখা একটি কবিতায়[১] দেবেন্দ্র-শিষ্য ভক্তকবি নিজেকে ধরা দিয়াছেন।

সব শেষে আর রহিবে না কিছু বাহির ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে !
তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে ।

অধরের বেণু, বনমালা আর পায়ের নূপুর-মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিব না আর যবে,
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবে না জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে ।

মোহিতলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ছন্দ চতুর্দ্দশী' (১৯৫১)। ইহার একটি সনেট (১২) প্রথম বই 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' হইতে নেওয়া ॥

৪

ভারতীর আসরে মোহিতলাল মজুমদার প্রথম হইতেই কবি ও ক্রিটিক এই যুগল সাজে দেখা দিয়াছিলেন। তাহার আগে একটি যে গদ্য-রচনা চোখে পড়িয়াছে তাহাতে 'অভয়ের কথা'র লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্বই পরিস্ফুট।[২] ভারতীর (১৯১৯) 'মাসকাবারি' প্রবন্ধগুলি চলিত ভাষায় লেখা। পরে মোহিতলাল সাধুভাষার দিকে একান্তভাবে ঝুঁকিয়াছিলেন।

ভারতীর প্রবন্ধগুলিতে মোহিতলাল "আর্ট-তত্ত্ব"এর আলোচনা করিয়াছিলেন। মোহিতলাল বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন ক্রিটিকের দরকার নাই "কিন্তু আমাদের সাহিত্যে বর্তমান যুগে ক্রিটিকের দরকার খুব বেশী"।

[১] 'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে'।   [২] 'আমি' (মানসী, পৌষ ১৩২১)।

ঘরের সমস্যা ঠিক কি, সেটাকে শুধু বাইরের দিক থেকে, বিশ্বের দিক থেকে নয়—ঘরের দিক দিয়ে ভাল করে' বুঝে, ভাল টনিকের ব্যবস্থা করে' সমালোচনা ও সৃষ্টি—দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে, সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে', ভুল ভাঙিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, রস-বস্তুর স্বরূপ ও বিরূপ বেশ ক'রে ফুটিয়ে তুলে, উচ্চ-সাহিত্যের পত্তন করাই কি ক্রিটিকের কাজ নয় ?[১]

মোহিতলালের এই উক্তির মধ্যেই তাঁহার কবিজীবনের বিনষ্টির বীজ নিহিত আছে। ঢাকায় গিয়া তাঁহাকে অধ্যাপনা-সূত্রে পাঠ্যগ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইত। তাহা হইতে তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়েন। তাঁহার এই সমালোচনাপ্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাতরণের ভেলা হিসাবে উপযোগী নিশ্চয়ই কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে সেগুলি খুব মূল্যবান্ নয়। মোহিতলাল "সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে' " দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতীতে প্রবন্ধ রচনার সময় হইতে মোহিতলাল তাঁহার সমালোচনা প্রবন্ধগুলিতে "শ্রীসত্যসুন্দর দাস" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতে থাকেন। এই নামটি গ্রহণ করিবার হেতু মোহিতলালের উক্তি হইতেই বোঝা যাইবে।

সর্ব বিষয়ের উপর মনের স্বচ্ছন্দ গতি রেখে, সর্ব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে অপরোক্ষ করতে হবে। এই দৃষ্টি—জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা করবার সাধনা—তাই হচ্ছে কবির সৌন্দর্য্য-সাধনা, ক্রিটিকের সত্যসাধনা। তাই এ যুগে কবিও ক্রিটিক, ক্রিটিকও কবি।...

...এই সত্যসুন্দরের প্রচারই হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাজ।[২]

মোহিতলাল ভুল করিয়াছিলেন। কবি যেখানে ক্রিটিক এবং ক্রিটিক যেখানে কবি সেখানে কোন কিছুরই প্রচারের কথা উঠিতে পারে না। কবি ক্রিটিক হইলেও শিল্পী, কদাপি প্রচারক নহেন। মোহিতলাল প্রচারক হইয়া স্বীয় কবিধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন। এখানে তিনি "অতি-আধুনিক" প্রগতি-পন্থার পন্থী হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকতা-কর্ম ইহার জন্য কম দায়ী নয়॥

৫

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) বি-ই পাস ইঞ্জিনিয়ার। ওভারসিয়ারি ছিল তাঁহার আজীবিকা। এদিক দিয়া তিনি আমাদের কবিদের মধ্যে একক। তাঁহার আজীবিকার প্রভাব তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে খানিকটা প্রতিফলিত হইয়াছে।

[১] ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬। [২] ঐ, পৌষ।

রবীন্দ্রানুসারী সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইনি প্রথম হইতেই রচনাশক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'-প্রভাবিত যতীন্দ্রনাথের 'শীত'[১] তাহার নিদর্শন।

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী।
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ!
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্বনাশী?
বর্ষ পরে বিশ্ব জুড়ে' বসিলে আবার—হে রুদ্র সন্ন্যাসী!

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিঘোষিত "হঠাৎ ডিমক্র্যাসি"র প্রভাব যতীন্দ্রনাথের রচনায় অনতিবিলম্বে পড়িয়াছিল। তাহাতে কবির দৃষ্টি প্রথমে দুঃস্থ দুর্গত মানুষের দিকে, তাহার পর মানবজীবনের দুঃখসর্বস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে একটি প্রথম রচনা 'মানুষ'।[২]

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ;[৩]
মাঝ পথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি করুণা[৪] কোরো না তাদের, কর গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী!

যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দুঃখবাদ ভাববিলাসিতায় এলাইয়া যায় নাই। মৃদু ব্যঙ্গের ঝাঁজ থাকায় ইঁহার কবিতায় একটু নূতন রকম স্বাদের সঞ্চার হইয়াছে।

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৭। প্রথমপ্রকাশিত কবিতাটির শেষ স্তবকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ'এর (১৩৩০) সূচনা আছে। এ গুলি 'মরীচিকা'য় সংকলিত রূপে বর্জিত হইয়াছে। বর্জিত স্তবকগুলি কি তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সংযোজন?

২ প্রথমপ্রকাশ মানসী, আষাঢ় ১৩২২। মরীচিকায় সঙ্কলিত, সংশোধন ও সংযোজন সহ। উদ্ধৃতপাঠ মানসীর।

৩ অতঃপর মরীচিকায় এই চারি লাইন সংযোজিত,

যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষপরে
লক্ষ দুঃখ ঝড়;

৪ মরীচিকার পাঠ "কামনা" লক্ষণীয়।

যতীন্দ্রনাথের কবিতা পাঁচখানি বইয়ে সঙ্কলিত—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম্' (১৯৪০) ও 'ত্রিযামা' (১৯৪৮)। মৃত্যুর পরে বাহির হইয়াছে 'নিশান্তিকা' (১৯৫৭)। 'অনুপূর্বা' (১৯৪৬) সঙ্কলনগ্রন্থ। 'কাব্য-পরিমিতি' (১৩৩৮) কাব্যতত্ত্বের বই। কাব্যনামগুলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার একটা স্থূল পরিচয় আছে। প্রথম জীবনে মানুষ ছোটে মরীচিকার পিছনে, পড়ে মরুশিখার দহনে, তাহার পরে মরুর মায়া।[১] জীবনসন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনায়। মৃত্যুর, নবজীবনের প্রত্যাশায় সে ভাবে "সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা"। উমার তপস্যার দীর্ঘরাত্রি সম্বন্ধে কালিদাসের উক্তি স্মরণে রাখিয়াই বুঝি কবি শেষ বইটির নাম দিয়াছিলেন।

মরীচিকার 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিতে যতীন্দ্রমোহন ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তাশ্রিত পলায়নী মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়াছেন।—যাঁহারা ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করিয়াছেন পৃথিবীতে তাঁহাদের বাণী ব্যর্থ হইয়াছে বার বার। "প্রথম ঝোঁক"এ "বন্ধু" নিষ্করুণ, জড়বৎ অবিচলিত।

> যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
> ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !

ঈশ্বর নির্লিপ্ত, নিরীহ। তিনি স্রষ্টা না হইতে পারেন, তিনি দ্রষ্টা।

> ঘুরণের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে' যায় দূরে,
> তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে'।

মানুষের ধর্ম মানুষের প্রেম দুইই ক্ষণধর্মী, স্থায়িত্ববিহীন, মূঢ় মানবের অসহায় অক্ষমতার আবরণ।

> মরণে কে হবে সাথী,
> প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি !

জগতে যে শৃঙ্খলা আমরা কল্পনা করি তাহা গোঁজামিল মাত্র, এবং চৈতন্য সে তো জড়েরই বিকার।

[১] তুলনীয়,

> ধূ ধূ করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে,
> মরীচিকা পিছাইয়া যায় ;
> শুধু দাহ, শুধু তাপ এ মানব ভবনে
> কোথা প্রেম নিত্য রস পায় ? 'প্রেমের স্পর্দ্ধা' (মরীচিকা)

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

ঘুমের "দ্বিতীয় ঝোঁক"এ "বন্ধু"র কাছে আরো ঘুমের জন্য প্রার্থনা। ইহজীবনের পূর্ব এবং পর দুইই অব্যক্ত। মৃত্যু ছাড়া কিছুই ধ্রুব ও নিয়মাধীন নয়। নিত্য সত্য শুধু দুঃখ।

চারি দিক দেখে চারি দিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম!
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমাদের "ঘুমিওপ্যাথি"!

"তৃতীয় ঝোঁক"এ সুখের দিন আগত, কিন্তু তাহার পিছনে শত দুঃখের স্মৃতি। কবিচিত্ত তাহাতে ভুলিতেছে না।

তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক বিভাবরী!
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি' ছানি'?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

"চতুর্থ ঝোঁক"এ কবিচিত্ত নিত্যসত্য দুঃখের নগ্নমূর্তির আবির্ভাবের প্রতীক্ষারত।

কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি!...
এ কথা বুঝিব কবে—
ধানভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে!

"পঞ্চম ঝোঁক"এ ঘুমের চটকা-ভাঙ্গা ও জাগরণের ক্রন্দন বেদনায় "বন্ধু"র অন্বেষণ।

বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।...
যদি ভাল লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে',
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

"ষষ্ঠ ঝোঁক্"এ জাগরণ সম্পূর্ণ, কিন্তু জীবনে ক্লান্তি ও শ্রান্তি।

ঢেলে সাজ', সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ স্বপ্ন হউক, যত সাদা সব কালো।

"সপ্তম ঝোঁক্"এ দুঃখমূর্তি "বন্ধু"র বিশ্বরূপদর্শন।

হে বিরাট! আজ হেরি যেন এত দুঃখের নাহি ওর;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান' আঁখিলোর!
ওগো অক্ষয় বট!
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।

এ দুঃখদর্শন কবিকে জীবনরসের প্রতি বিতৃষ্ণ করে নাই। দুঃখের ফ্রেমে বাঁধা হইলেও জীবন-চিত্রের উজ্জ্বলতা কিছু কম নয়।

'প্রেমের স্পর্দ্ধা' কবিতায় চিত্ররূপ উপভোগ্য। বিষম বৈশাখী রোদে পোড়াদহ ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মে টিনে-ছাওয়া শেডের তলায় বরযাত্রীদল জড় হইয়াছে। বরের

শুকায়ে গিয়াছে মুখ, চোখ গেছে বসিয়া,
কণ্ঠে মলিন ফুলমালা,
সারাদিন অনাহারে, রাঙা পানে রসিয়া
ঠোঁট দুটি মোহরের গালা!
নিঙাড়ি সে নীরসতা রসিকতা যা মেলে,
সঙ্গীরা ঢালিতেছে কানে;

'পথের চাকরি'কে বলিতে পারি এ কালের কবির "বারমাস্যা"।

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে যেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা!
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা!
আমি কি করি?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল্-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে';
যোগাই যে চায় তারে কলসি দড়ি!

'অভাগার ভাগ্য'এর ব্যঞ্জনা উপভোগ্য।

চাই ধন জন স্বাস্থ্য শান্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্না পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই!

তোমারে জীবনে চাব কি চাব না,
ভুলেও কখনো এমন ভাবনা
ভাবিনে বসে'—
তাই, চাইনে বলিয়া পেয়ে বস যদি
কপাল-দোষে !

মরুশিখার 'দুখবাদী', 'নবপন্থা', 'কবির কাব্য' ইত্যাদি কবিতায় যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী ভাবনার প্রকাশ।

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ
যেজন কিছুতে গিলিতে চায়না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্য্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।[১]

দুখের মাঝে সুখের মরুশিখা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠে, তাহাতেই কবিচিত্ত চকমকির স্পর্শ পায়।

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ।
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা !
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা !
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।[২]

কয়েকটি কবিতায় সমসাময়িক নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া কবির বাণী ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে নিগূঢ় বেদনায় উৎসারিত। যেমন,

সেই দুর্য্যোগউৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা করো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া সে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিষ্টার ![৩]

১ 'দুখবাদী'। কবিবন্ধু যতীন্দ্রমোহন বাগচী (যাঁহাকে 'মরীচিকা' ও 'মরুমায়া' উপহৃত) এই কবিতাটির উত্তরে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

২ 'কবির কাব্য'। ৩ 'দেশোদ্ধার'।

মোদের কি বল দোষ ?
অহিংসা পেলে অহিংসা করি রাগ পেলে করি রোষ।
এই ভবজ্বালা প্রাণ ঝালাপালা, তবু ত ছাড়িনি বুলি।
নাম জপিবারে কিনেছি এবারে খাঁটি খদ্দরে ঝুলি।
সময় পেলেই বলি,—সকলেই মহা যুগবাণী শোন—
নিজ চরকায় তেল দাও, নিজ আস্‌কের ফোড় গোণ।
বোকা বোকা ছেলে চ'লে যাক্ জেলে আমরা বাহিরে আছি,
কাগজে দেখিব এল কিনা দেশ স্বরাজের কাছাকাছি।
সিদ্ধ পুরুষ নেতা ভারতের,—মন্তর যদি ঝাড়ে,
কোন্ ভোরে ঠিক লেগে যাবে ফিক্ যত সাহেবের ঘাড়ে।
কি মজাই ভাই হবে,—
ফিকে আড়ষ্ট রাজা ও রাজ্য, আমরা ঘুমাব সবে।[১]

মরুমায়ার বিশিষ্ট কবিতার মধ্যে একটি হইতেছে 'বিভীষণ। চিরজীবী বিভীষণ চিরন্তনী মৃত্তিকার মোহিনী মায়ায় বন্দনা করিতেছে।

রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃন্মহামায়া,
স্বার্থপ্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
মিছে, ওরে সব মিছে,—
মাটির প্রেমের হেমকুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।

'নূতন পথে' কবিমানসের জীবন-অভিসারের ছবি।

এই ধূলায়-ছাপা
বুকে পাথর-চাপা
সদা দুরু দুরু গুরু গুরু চাকায় কাঁপা
সিধা বাঁধা রাজপথে আমি আর না র'ব।
আজ মরণে পড়েছে মোর পন্থা নব
ওই 'পাওটা' পথের আমি পথিক হ'ব।
বামে তর-তর ভরা গাঙ্, শাওন-রাঙা,
ডানে থর-থর খাড়া পা'ড় ভাঙন্-ভাঙা;
গাঙ্-শালিখের দল
খোপে কলচঞ্চল
যেথা বেণার শিকড় ধরি' ঝুলিছে ডাঙা;
সেই উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা
পাউড়ির বুকে আঁকা
যে পথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য নব,—
আজ সে পাওটা-পথে একা পথিক হ'ব।

১ 'ক্ষণিকের জাগরণ'।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প সহজ ও স্পষ্ট, কারুকার্যহীন, হয়ত খানিকটা শ্লথ। কবির অনুভব ও আবেগ খাঁটি, উজ্জ্বল এবং সংযত। এ বিষয়ে মোহিতলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের গুরুতর পার্থক্য। দুইজনের লেখার চালও আলাদা। যতীন্দ্রনাথের কবিতার চাল হালকা, মোহিতলালের ভারি। একই ছন্দে লেখা দুই কবির 'কেতকী' কবিতা দুইটি পড়িলে দুইজনের কবিভাবনার ও নির্মাণকৌশলের পার্থক্য বোঝা যাইবে।[১] যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

কে জানে সে কোন বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে' আঁধারে সঙ্গোপনে!
শ্যাম পাতে ঢাকা শ্বেত কিসলয়, তাহে ঢাকা পীত রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।
এল বায়ু-রথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে' ফোঁসে ক্ষোভে।...
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে' এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ!...
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়িছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে।
পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর' ভাই,
তোমারেও তবে ধোরেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই!
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা?

মোহিতলাল লিখিয়াছেন,

প্রাবৃট্-আঁধারে বিদ্যুৎ যবে বিদারিয়া নভ-তল
ঘোর গর্জনে শিহরিয়া তোলে নিম্নে জলস্থল—
তুমি বন্দিনী রবি-বিরহিণী তাপসিনী ফুলবালা
সবুজ বাকলে ঢাকি' তনুখানি পর' যে কাঁটার মালা!

ফণী-ফণিনীরা ফুঁসিয়া উঠিছে সৌরভ-সংবাদে,
তাই সে তরুণী সারা তনুখানি নিবিড় নিচোলে বাঁধে;
গরল-শ্বাসে মেলিতে পারে না আপন দীর্ঘ দল—
গোরোচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল!...

বাদল-তিমিরে বেদনার মত গন্ধের আবেদন
সারা প্রাণ-মন নিমেষে হরিল, হয়ে গেনু অচেতন।
তবু বুকে করি' নিয়ে গেনু ফুল—পাইনু কি সন্ধান?
জনমে জনমে খুঁজে ফিরি যারে এ তারি অভিজ্ঞান?

[১] যতীন্দ্রনাথের কবিতা মরুমায়ায়, মোহিতলালের কবিতা স্বপন-পসারীতে সঙ্কলিত।

যতীন্দ্রনাথের ও মোহিতলালের 'দুঃখের কবি' কবিতা দুইটিতে[১] দুইজনের জীবনভাবনার পার্থক্য পরিস্ফুট। যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত ঠুনকা সুখের মোহে পড়িতে চায় না।

ও নাকি শপথ কোরেছে,—'কপালে না জুটিলে খাঁটি সোনা,
আভরণহীন কেঁদে যাক্ দিন, খাদে তবু ভুলিব না'।...
ভক্তি প্রেম কি দণ্ডের তালে শ্রীচরণে মাথা ঠোকা?
মুক্তি কি এই?—দড়া ছিঁড়ে' ছুটে' সাকিম খোঁয়াড়ে ঢোকা?

মোহিতলাল বলেন, ঠুনকা সুখের সান্ত্বনাও তো মিথ্যা নয়।

মিথ্যার মোহে যদি কেহ কভু সত্যই সুখ পায়—
তপ্ত বলিয়া ভান করে' কেহ পান্তা জুড়াতে চায়—
লয়ে গোপালের পাষাণ-পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায়?
কঠোর সত্য স্মরণ করায়ে কে তারে শাসিতে চায়!

৬

স্কুলের পড়া বোধকরি শেষ না করিয়াই কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালী পল্টনে ভর্তি হইয়া মেসোপোটেমিয়ায় যান (১৯১৭)। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে কাজী ও তাঁহার সহপাঠী সুহৃদ শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দুইজনে গল্প-কবিতা লিখিতেন। মেসোপোটেমিয়ায় বাঙ্গালী পল্টনের মুসলমান সিপাহীদের তদারকের জন্য একজন পাঞ্জাবী মৌলবী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মুখে একদিন হাফিজের কবিতা-আওড়ানো শুনিয়া নজরুল মুগ্ধ হইয়া যান এবং মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসী শিখিতে থাকেন।[২] তাঁহার কাছেই নজরুলের ফারসী-কাব্যের পাঠগ্রহণ হয়। এখন হইতেই নজরুলের কবিজীবনের উন্মেষ শুরু হইল। "হাবিলদার" কবির প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা-রচনা হাফেজেরই অনুসরণে।

নাইবা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন যুঁইকুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে—তেম্‌নি বিভোর থাক্ রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোরও নাসায়।

[১] যতীন্দ্রনাথের কবিতা মরুমায়ায়, মোহিতলালের কবিতা হেমন্ত-গোধূলিতে সঙ্কলিত।

[২] বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয় দশকেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ছেলেরা বেশিরভাগ স্কুলে ফারসীর বদলে সংস্কৃত শিখিত।

বরষ শেষে একটিবারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অম্‌নি অবুঝ হরষ ![১]

দেশে ফিরিয়া (১৯১৯) দুই-চারি দিন মক্‌শ করিবার পর[২] নজরুলের কবিতা স্বীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে মাত করিয়া দিল, এবং বাঙ্গালা কবিতার যে বাজারদর হইতে পারে তাহা জানাইয়া দিল নজরুলের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২ ; দ্বি-স ১৯২৩)।

দম্‌কা-হাওয়ার কবি শুধু অগ্নিবীণা বাজাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি 'ধূমকেতু'ও ছাড়িলেন। কবিতার ঝঙ্কার যাহাদের কানে কোনদিন পশিবে না তাহারাও 'ধূমকেতু'র ঝাপটা হইতে রেহাই পাইবে না। 'ধূমকেতু' পাক্ষিক পত্রিকা (১৯২২)। মটো রবীন্দ্রনাথের এই কয় ছত্র[৩],

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

ধূমকেতুর জন্য কবি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নজরুলের অগ্নিবীণা বাহির হইবার মাসকয়েক পরে মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' প্রকাশিত হয়। এই সময় পর্যন্ত দুই কবির মধ্যে সহৃদয় সহযোগ ছিল। এই সহযোগিতায় নজরুল কতটা লাভবান্ হইয়াছিলেন জানি না তবে লোকসান হয় নাই। মোহিতলালের সম্বন্ধে সে কথা কতটা খাটে বলিতে পারি না। বোধকরি নজরুলই তাঁহাকে কল্লোলের আসরে (১৯২৩-৩০) ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের শেষে শনিবারের-চিঠি বাহির হইয়া দুই কবিকেই আঘাত হানিল।[৪] অনুমান করিতে পারি এই আঘাতই দুইজনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল।

১ 'আশায়' (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬)।

২ এইসব অপরিপক্ব রচনা প্রবাসীতে (১৩২৭) এবং 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় (১৩২৭-২৮) প্রকাশিত।

৩ 'হুগলীতে কাজী নজরুল', শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ভট্টাচার্য (দেশ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) দ্রষ্টব্য।

৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

নজরুলের প্রথম উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জোরালো কবিতা দুইটির[১] প্রত্যক্ষ প্রেরণা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতা হইতে।[২] নজরুল যোগ করিলেন "বেগের আবেগ"। কবিতা দুইটির অসাধারণত্ব কাহারো দৃষ্টি এড়াইবার মত নয়। উচ্ছ্বসিত প্রাণের পেয়ালা-ভরা তরুণ কবিকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করিলেন 'বসন্ত' উৎসর্গ করিয়া (১৯২৩)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসিত হইল কিন্তু প্রাচ্যভূমির দুর্দশা ঘুচিবার লক্ষণ দেখা গেল না। মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া নজরুল স্বাধীনতাকামী নবজাগ্রত মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কীর উদ্যম খানিকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কবিতায় বিদ্রোহ-উল্লাসের সুর আনিয়াছিল।

'অগ্নিবীণা' নামটি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নেওয়া।

> অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে,
> আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।

অগ্নিবীণার লিরিক আবেগ বিদ্রোহের, নির্জীবতার নিশ্চেষ্টতার নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রাণবান্ চিত্তের অসহিষ্ণুতা। তাই কাব্যখানি উপহৃত হইয়াছিল "বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণেষু"। অগ্নিবীণায় কবিতাসংখ্যা বারো। নজরুলের কবিপ্রকৃতি যে ধর্মের গণ্ডীর মাপে গড়িয়া উঠে নাই তাহার পরিচয় কবিতাগুলির মধ্যে,—'রক্তাম্বর-ধারিণী মা' এবং 'আগমনী'ও আছে আবার 'কোরবাণী' এবং 'মোহর্‌রম্'ও আছে।

অগ্নিবীণায় অগ্নি আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তাহার সুরটি ঠিক বীণার নয়, বিষাণের।

> আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
> সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
> মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
> মহাকালের চণ্ডরূপে
> ধূম্র ধূপে
> বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
> ওরে ঐ আস্‌ছে ভয়ঙ্কর!
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!‌[৩]

[১] 'প্রলয়োল্লাস' (প্রথমপ্রকাশ 'মোসলেম ভারত', ১৩২৮) এবং 'বিদ্রোহী' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)।

[২] 'দুরন্ত আশা' (মানসী) এবং 'বিজয়ী' (পূরবী; প্রথমপ্রকাশ চৈত্র ১৩২৪)।

[৩] 'প্রলয়োল্লাস'।

এই-যে বিদ্রোহের, ধ্বংসের আবেগ-উচ্ছ্বসিত মুড ইহাতে টানা কাব্যরচনা চলে না পুনরাবৃত্তি ছাড়া। সুতরাং অনিবার্য ভাবেই অতঃপর নজরুলের কবিতা প্রেমের আবেগ ও প্যাশনের উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। নজরুল তরুণ "অতি-আধুনিক" কবিদের পথপ্রদর্শক হইলেন। কল্লোলে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) বাহির হইল তাঁহার 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে'। নজরুলের কবিতা এখন খাদের উৎরাই অনুসরণ করিল।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় যে দেহ-বাদ তাহা মোহিতলালের দেহ-বাদের তুলনায় আবেগ-সংযত।

> আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
> বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
> প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
> চিনেছি তোমায়,
> যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি
> ধরা দেবে তায়![1]

'দোলনচাঁপা' (১৩৩০), 'ভাঙ্গার গান' (১৩৩১), 'পুবের হাওয়া' (১৩৩২), 'বিষের বাঁশী' (১৩৩১), 'সিন্ধুহিল্লোল', 'ছায়ানট' (১৩৩০), 'বুলবুল' (১৩৩৫; তৃ-স ১৩৩৭), 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (১৩৩৭) ইত্যাদি কবিতা ও গানের সঙ্কলন। (নজরুলের গজল গানে একদা বাঙ্গালাদেশ মুখরিত হইয়াছিল)। 'ব্যথার দান' (১৯২২)[2], 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্পের বই। 'কুহেলিকা' (১৩৩১), 'মৃত্যুক্ষুধা' ইত্যাদি উপন্যাস, 'রিক্তের বেদন' গল্প, 'ঝিলিমিলি' নাটক। গদ্য-রচনায় নজরুল বিশেষ কোন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

নজরুলের কবিতার সম্পদ ছন্দের চটুলতা ও বাগ্‌ভঙ্গির ওজস্বিতা। আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ তাঁহার রচনারীতিকে দীপ্তি দিয়াছে, তবে ইহার বাহুল্যও কোন কোন কবিতাকে অত্যন্ত দুর্বল ও ঘোলা করিয়াছে। মোটের উপর আবেগের অকৃত্রিমতা ও অধীর তীব্রতা নজরুলের কবিতার প্রধান বিশিষ্টতা।

নজরুলের কবিতা সত্য অর্থে সাময়িক কবিতা। অর্থাৎ সে সময়ে দেশের মধ্যে এমন কবিতার আসর প্রস্তুত হইয়া ছিল। অসহযোগ-আন্দোলন বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতটুকু আলো, যতটুকু ভালো, যতটুকু মুক্তি আনিয়াছিল তাহা নজরুলের

[1] 'অনামিকা' (কালি-কলম, আশ্বিন ১৩৩৩)।

[2] অগ্নিবীণার পূর্বে প্রকাশিত।

কবিতা-গানের দ্বারা অনেক অংশে সম্ভাবিত হইয়াছিল। নজরুলের কবিতার ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের উচ্ছ্বাস পাঠকের চিত্তে যে বিস্ফার সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার মূল্য সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তী সাহিত্যের পক্ষে তুচ্ছ নয়। কবি নজরুল ইস্‌লামের প্রাণ-প্রাচুর্যের সমগ্র প্রকাশ তাঁহার কবিতা-গানের মধ্যে নাই। তাঁহার বলিষ্ঠ প্রাণবত্তা তাঁহার সহচর ও অনুচর কতিপয় তরুণ লেখককে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাতেই নজরুলের সাহিত্যশক্তির যথার্থ পরিচয় উহ্য রহিয়াছে ॥

৭

দ্বিতীয় দশকের কবিতালেখকেরা অনেকেই পল্লীজীবনের নিরাবিল শান্তিসুখের বর্ণনায় মুখর হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কিন্তু অল্পবিত্ত পল্লীজীবন দিন দিন কষ্টময় ও দুর্বহ হইয়া আসিতেছিল। সেই অনুপাতে কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে কলকারখানার শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়িতেছিল। পল্লীবাসীর দুঃখময় ও শহরবাসী শ্রমিকের কদর্য জীবনযাত্রার দিকে কবিতালেখকদের এইবার নজর পড়িল। শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'পল্লীব্যথা'য় (১৯২০)[১] কয়েকটি কবিতায় পল্লীজীবনের নিরানন্দের ছবি তুলিয়া ধরিলেন।

> গম্ ধরে' আছে, পাতাটি কাঁপে না ছম্‌ছম্ করে দেহ,
> দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ জনহীন সব গেহ !
> মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য রণতাণ্ডব সম,
> আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম।

কাব্যশিল্পে অথবা কাব্যবস্তুতে কোন নির্দিষ্ট আদর্শ অথবা উদ্দেশ্য লইয়া কবিতা রচনায় হাত দেন নাই এমন কয়েকজন কবিও কিছু না কিছু পাঠযোগ্য ও উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন। যেমন, "সুরেশ্বর শর্ম্মা" (বিজ্ঞানাধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৮১-১৯৪৪) কবিনাম বা "তখল্লুস্")। ইঁহার কবিতা-গ্রন্থ 'শতপর্ণী,' 'জোনাকি,' 'অন্তঃসলিলা,' 'পর্ণজা' ইত্যাদি। ব্রাউনিঙের কবিতার অনুবাদ, "ব্রাউনিঙ-পঞ্চাশিকা' (১৯৩৬)-ও ইঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীও (জন্ম ১৮৯৭) প্রথমে প্রবাসী-সম্পাদনা কার্যের

[১] পল্লীব্যথার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই নূতন উদ্যমের দিক্‌নির্ণয় করিয়াছেন। "শ্রমজীবীই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী ; শ্রমের জয়গান করা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের নিকট বর্তমান যুগ দায়-স্বরূপ অর্পণ করিয়াছে।"

এক বৎসর (১৩৩১-৩২) সাবিত্রীপ্রসন্ন রাধাকমলের সহযোগিতায় 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩৩৫-৩৬ হইতে এ কাজ একক করিতে থাকেন।

সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু একটি ছাড়া কবিতার বই নাই এবং সেটিও বহুকাল পরে সংকলিত—'একান্তা' (১৯৪৭)। ইঁহার তিনখানি গল্প-উপন্যাস বই অনেকদিন আগে বাহির হইয়াছিল—'রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প', 'যৌবনের ছিট ও অন্যান্য গল্প' এবং 'আবছায়া' (১৯৩৫)। শেষ বইটিতে একটি প্রেমের কাহিনী পাই। তাহাতে প্রেততত্ত্ব, প্রেতাবেশ এবং মুগ্ধ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মিশিয়া গিয়াছে। বইটি উপভোগ্য এবং বিশিষ্ট রচনা।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীর কবিতা সাধারণত একটু বড় বহরের। ইঁহার কবিতায় স্বচ্ছন্দ ও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সৌষ্ঠব দেখা দিয়াছে। যেমন,

এই ভয়াতুর হাসি, এই যে বিপন্ন হাসি,
এই অপরাধী হাসি,—কতকাল রবে এরে লয়ে?
কোনো শুদ্ধ সঙ্গীহীন অন্ধকার বর্ষারাতে
বুক কি ওঠেনি ভার হয়ে
অনামা অমানা বেদনাতে,
শুধু শুধু দুটি ফোঁটা জলকণা কখনো কি
জড়ায়ে আসেনি আঁখিপাতে,
ব্যথা সে কি বলে নাই, আছে আছে,
তবু সে যে আছে?...
মনে হয় ত্রাণ কারো নাহি।
প্রতিটি কীটাণু তার তৃণাঙ্কুর সনে মোরা চলিয়াছি একই পথ বাহি'
অন্তরের পানে অনিবার;
সে-পথে যা-কিছু আছে সে আমা-সবার,—
হোক তা দহন, হোক অনাদর, অপমান, শ্লেষ,
ভাষার অতীত ব্যথা, সহাতীত ক্লেশ,
সে-সবই সহিতে হবে সবাকারে কোনো-একদিন।
অনন্ত কান্নার ঋণ
যেতে হবে কাঁদিয়া শুধিয়া
বেদনার কিম্বা সমবেদনার আঁখিজল দিয়া।

৮

তৃতীয় দশকের শেষের দিকে আরও কয়েকজন নবীন লেখক দেখা দিয়াছিলেন যাঁহারা কবিতা-রচনায়, অনেকে গদ্য-রচনায়ও, বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকে পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব (জন্ম ১৮৮৯) ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী (১৯০৪) দুই জনেই কল্লোলে লিখিতেন। মেঘদূতের ও ওমর খৈয়ামের ইংরেজী অনুবাদের নরেন্দ্রবাবু কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ একদা সমাদৃত হইয়াছিল। ইঁহার মৌলিক কবিতার বই 'বসুধারা' (১৯২৮)। 'বোঝাপড়া' (১৯১৩) গল্পের বই। 'গরমিল' (১৯২৫) বিয়র্ণসনের (Bjornson) একটি নাটিকার কাহিনী অবলম্বনে লেখা। 'যাদুঘর' (১৯৩০) উপন্যাসটি প্রথমে কল্লোলে (১৩৩৪) বাহির হইয়াছিল। অপর গল্প-উপন্যাসের বই—'খেলার পুতুল', 'আকাশকুসুম' (১৯৩৭), 'সুহাসিনী' ইত্যাদি। রাধারাণী দেবী মুখ্যত কবি। ইঁহার স্বনামে কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' (১৯৩০), 'বনবিহগী' (১৯৩৭), 'সিঁথি মোর' (১৯৩২) ইত্যাদি; "অপরাজিতা দেবী" ছদ্মনামে 'বুকের বীণা' (১৯৩০), 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫), 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭) ইত্যাদি। ছদ্মস্বাক্ষরিত কবিতাগুলি লঘু এবং উপভোগ্য রচনা। এগুলি কিরণধনের কবিতা স্মরণ করায়। 'প্রেমের পূজা' গল্পের বই।

রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৩৮) প্রবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার কবিতা প্রবাসী ছাড়া কল্লোল প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকায়ও বাহির হইত। ইঁহার কবিতার বই 'আলেয়া' (১৯৩০), 'দীপা' (১৯৩৩) ইত্যাদি; গল্পের বই 'বুকের ভাষা' (১৯৩৪), 'বৈরাগীর চর' (১৯৩৫) ও 'চক্রপাক' (১৯৩৬); উপন্যাস 'মৃগয়া' (১৯৩৪), 'সাত তাল' (১৯৩৫), 'কো এডুকেশন' (১৯৩৫), 'ভাঙ্গন ভাঙ্গা' (১৯৩৫), 'ঘরমুহানী' (১৯৩৫), 'ঝড়' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

রাধাচরণ চক্রবর্তীর মত প্যারীমোহন সেনগুপ্তও (১৮৯৩-১৯৪৭) প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ইঁহার কবিতার বই 'অরুণিমা' (১৯২২) ও 'কোজাগরী' (১৯৩২)।

শ্রীযুক্ত অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৯৬) কবিতা প্রবাসী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইত। 'আকাশ গঙ্গা' (১৯২৫) বাহির হইবার সুদীর্ঘ-কাল পরে ইঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা পুস্তক 'নূতন কবিতা' (১৯৫২) ও 'চার্বাকের উক্তি' (১৯৫৫) বাহির হইয়াছে। ইঁহার কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হুমায়ুন কবির (জন্ম ১৯০৬) ছাত্রাবস্থাতেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত

হইয়াছিলেন।[১] ইঁহার কবিতার বই 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৭ ; তৃ-স ১৯৫৫), 'সাথী' (১৯৩০) ও 'অষ্টাদশী' (১৯৩৮)।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কবিতা-লেখক—'চারণ' ইত্যাদির রচয়িতা কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৪৭); 'মঞ্জরী', 'মঞ্জুলা' (১৯৩৩) ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত (জন্ম ১৯০০) ; 'ছন্দের টুংটাং' (১৯৩০) ইত্যাদি শিশুপাঠ্য ছড়া ও কবিতাগ্রন্থের রচয়িতা সুনির্মল বসু (১৯০২-৫৭) ; 'টুনটুনির গান' (১৯৩০) ইত্যাদির রচয়িতা গোলাম মোস্তফা (জন্ম ১৮৯৭) ; 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'রাখালী' (১৯৩০), 'বালুচর' (১৯৩০), 'ধান খেত' (১৯৩২) ইত্যাদির রচয়িতা জসিমউদ্দীন (জন্ম ১৯০৩); 'মরাল' (১৯৩৪) রচয়িতা কাদের নওয়াজ (জন্ম ১৯০২) ; 'দীপান্বিতা' (১৯২৮) ও 'তীর্থপথে' (১৯৩২) রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী (জন্ম ১৯০৪) ; 'কুটীরের গান' (১৯৩৪) ইত্যাদি রচয়িতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৫) ; 'ময়নামতীর চর' (১৯৩২) ও 'অনুরাগ' (১৯৩২) কবিতাগ্রন্থের ও 'ঘূর্ণিহাওয়া' (১৯৩০), 'অস্তাচল' (১৯৩৩) প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক বন্দে আলী মিয়া (জন্ম ১৯০৭) ; 'দীপায়ন' (১৯৩২), 'মধুচ্ছন্দা' (১৯৩৪) ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯০৪); 'পদ্মরাগ' (১৯৩০) ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; 'সবহারাদের গান' (দ্বি-স ১৯৩০) ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৮) ; 'ব্যথার পরাগ' (১৯৩০) রচয়িতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে ; 'লীলায়িতা' (১৯৩৪), 'প্রাক্তনী' (১৯৪১) ইত্যাদি রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে (জন্ম ১৮৮৯) ; 'মোহানা' (১৯৩২) রচয়িতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু (জন্ম ১৮৯৭) ; 'মন্দিরের চাবি' (১৯৩১) ইত্যাদি রচয়িতা শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৯৩) ; 'পথচারী' (১৯৩৬), 'ছন্দবীণা' (১৯৩৭), 'খেয়াপারে' (১৯৩৮) ইত্যাদি রচয়িতা (প্রসিদ্ধ সাঁতারু) শ্রীযুক্ত শান্তি পাল (জন্ম ১৮৯৫)[২] ; 'হিঙ্গুল নদীর কূলে' (১৯৩৫) ও 'কাশবনের কন্যা' (১৯৩৮) রচয়িতা শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৫) ; 'তিন্তিড়ী'

[১] ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে ইঁহার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল ('গাড়োয়ান'—"সত্যঘটনা অবলম্বনে")। এখানে ইঁহার পুরা নাম ছিল—হুমায়ুন জহিরুদ্দিন আমির-ই-কবীর।

[২] শান্তিবাবু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পথ অবলম্বন করিয়া ছড়ার ষ্টাইলে কবিতারচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার কবিতায় গ্রাম্যশব্দের সংকলন প্রচুর ও লক্ষণীয়।

প্রভৃতি রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪) ; 'দক্ষিণ হাওয়া' (১৩৩৪) ও 'অসি ও মসী' (১৩৪৭) ইত্যাদি রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাত-কিরণ বসু (জন্ম ১৯০৮) ; ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

৯

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী (জন্ম ১৯০১) আবাল্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত। স্কুল-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যে অধিকারপ্রাপ্ত এবং গোড়া থেকেই কবিতা-রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'দেয়ালি' ১৩৩০ সালের শেষের দিকে বাহির হইয়াছিল। রচনায় প্রৌঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৩৩৮-৩৯ হইতে। অতঃপর 'বসন্তসেনা' (১৯২৭), 'প্রাচীন আসামী হইতে' (১৯৩৪), 'বিদ্যা-সুন্দর' (১৯৩৫), 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' (১৯৩৭), 'হংসমিথুন' (১৯৫১), 'অকুন্তলা' (১৩৫৩), 'যুক্তবেণী' (১৯৪৮) ও 'উত্তরমেঘ' (১৯৫৩)।

প্রমথবাবুর কবিতায় দেশী-বিদেশী ঐতিহ্য অস্বীকৃতির কোন চেষ্টা নাই। প্রেম ও প্রকৃতি কবিচিত্তে যে ছায়াপাত করিতেছে তাহারই আলিম্পন আঁকা হইয়াছে। গোড়ার দিকে সনেটগুলির মধ্যে অনেক চমৎকার পংক্তি আছে। যেমন,

মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবস-শর্ব্বরী,
দেখা না দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।[১]

যতটুকু দেখি নাই আছে ততখানি
দ্বিতীয়ার চন্দ্র বলে পূর্ণিমার বাণী![২]

মাঠ-শালিখেরা কাঁদে ধূসর-ডানায়
দধি-পাণ্ডু শশী দোলে আকাশের কোল—
স্বপ্নে পাওয়া বায়ু ফেরে শাল-বনে হায়
প্রবালের রসে ভেজা পূবের অঞ্চল।
নিজ মনে ভয়, তাই এমন নিশীথে
তোমারে বলিতে নারি নিকটে আসিতে।[৩]

'প্রাচীন আসামী হইতে'র দুই একটি কবিতায় (যেমন ৪৪, ৫২) যেন অক্ষয়কুমার বড়ালের ধ্বনি শোনা যায়।

'বিদ্যা-সুন্দর' আগেকার রচনা (১৩৩৬)। লেখক তখনো মাইকেলের মুদ্রাদোষ (নামধাতু ও "আহা" ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

[১] 'প্রাচীন আসামী হইতে' [২] ঐ ৩৫। [৩] ঐ ৪১।

শেষের দিকের কবিতাগুলি দীর্ঘতর। রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছে। একটু উদাহরণ দিই।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সন্নদ্ধ হবে তোমার মূর্তি,
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী উষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল জননান্তর-সৌহৃদানি-জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ায়
বিভ্রান্ত কৃষ্ণসার চন্দ্রকলার মতো
হঠাৎ প্রবেশ করবে তুমি পুরূরবার অগম্য আমার মনের গহন অরণ্যে,
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।[১]

১০

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০৫) এখন গল্প-রচনাতেই—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সীদের জন্য গল্প-রচনাতে—নিরত। একদা ইঁহার নিষ্ঠা ছিল অ-লঘু কবিতা রচনায়। তাহার পরিচয় রহিয়াছে একসঙ্গে প্রকাশিত (১৯২৯) দুইখানি সুমুদ্রিত বইয়ে—'মানুষ' ও 'চুম্বন'। এ কবিতাগুলি ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ মধ্যে লেখা এবং ভারতী ভারতবর্ষ উত্তরা আত্মশক্তি নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

কবিতাগুলিকে আদর্শ সাময়িক কবিতা বলিয়া লইতে হয়। মানুষের কয়েকটি কবিতায় শ্রমিকের ও দরিদ্র-বঞ্চিতের বেদনার প্রকাশ, চুম্বনে কামরতির জয়োচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথের একধরণের কবিতারীতির অনুকরণ ঘনিষ্ঠ ও স্পষ্ট। রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

মানুষের প্রারম্ভ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বপক্ষ পরিকল্পিত।

কে যেন ডাকিল—"ওরে যাত্রী,
পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, এল নবীন প্রভাত!"
শুনিয়া জাগিনু অকস্মাৎ।

১ 'ভাঙা পেয়ালা' ('উত্তরমেঘ')।

জাগিয়া উঠিয়া কবি বুঝিলেন,

এ শুধু নূতন পাতা খুলিয়াছে প্রাচীন পঞ্জিকা!

আরো বুঝিলেন,

কালও গেছে এইরূপ, আজিকার নবীন প্রভাত
আনে নাই একটু তফাৎ।

মানুষের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিধাতার চেয়ে বড়ো'।

—মানুষ যখন পথ চলে
তার মনে, জীবনে, সৃজনে, চিত্ততলে—
দুঃখে-সুখে, শোকে-প্রেমে, আসক্তি-আঘাতে,
ব্যর্থতা-ব্যাঘাতে,
বিধাতা, দাঁড়ায়ে রহে ব্যগ্র কুতূহলে,
প্রাণে প্রাণে কহে তার হাত রাখি হাতে—
"এই পথ-সমাপ্তি-উৎসবে
আমি পূর্ণ হবো, বন্ধু, তুমি পূর্ণ হবে।
এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও মোর চেয়ে।"

চুম্বনের একটি বিশিষ্ট কবিতা 'আমি যে তোমারে ভালবাসি'। পৃথিবীর সর্বত্র সুন্দরী রমণীর মধ্যে কবি ক্ষণে ক্ষণে চকিতে জীবনের সার্থকতার আভাস দেখিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও জানেন যে এ আলোকলতা কখনো জীবনে ধরা দিবে না, তবুও তাহারি জন্য আকুল আকিঞ্চন। কবি যখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবেন

—তখনো সে আসিবে সুন্দর
তার লাগি রেখে গেনু মোর কণ্ঠস্বর
আমার এ কবিতার সনে।...
সেদিন সে যেন নাহি মনে করে
অরূপ-সুন্দর তরে আমার এ গান!—
যে-অরূপ বন্দী হোলো সুন্দর তনুতে
তারে আমি বেসেছিনু, চেয়েছিনু ছুঁতে,
চুমিতে চেয়েছি,

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব-কবিতাকেও উড়াইয়া দেওয়া হইল।

বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে;—
নাই তার প্রয়োজন অমর্ত্য-জগতে!

১১

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (জন্ম ১৯০৩) কয়েকটি কবিতা ১৩২৮-২৯ সালের প্রবাসীতে বাহির হয়।[১] সেগুলিতে রচয়িতার স্বাক্ষর ছিল "শ্রীনীহারিকা দেবী"। (নারী-শিক্ষা-প্রগতির সমর্থক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রিকায় নূতন লেখকের অপেক্ষা নূতন লেখিকার রচনা প্রকাশ অনেক সহজসাধ্য ছিল।) অচিন্ত্যবাবুর স্বনামে একটি কবিতা ('প্রতিপদের চাঁদ') ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। কাঁচা লেখা হইলেও এই গোড়ার রচনার কোন কোনটিতে লেখকের পরবর্তী কালের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আছে।

ঘরের কোণে দুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস্ নারী,
পরিস্[২] কেন যুগল-পায়ে অধীনতার শিকল ভারী ?
স্যাঁৎসেতে তোর ঘরের মেঝে হাঁপিয়ে-তোলা ধোঁয়ায় কালো
দাসত্বেরই পঙ্কিলতা—সেই কি তোমার লাগ্‌বে ভালো ?…
অত্যাচারে বিক্ষত যে সুধায়-উছল তোমার বুক,
ঘোমটা খুলি দেখাও তোমার অশ্রু-সজল মলিন মুখ !
যুদ্ধ সায়র শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী,
পশ্চাতে আজ থাক্‌বে কেন—এই কথাটা দাঁড়াও ভাবি' ![৩]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব আরও কিছুদিন ছিল। এই প্রভাব শুধু ছন্দে আর চলিত শব্দের দ্বারা চিত্র-অঙ্কনেই ক্ষান্ত নয়, চলিত শব্দের রূপ ও অর্থ-পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া লেখক সত্যেন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা অচিন্ত্যবাবুর গদ্য লেখাতে বেশি পাওয়া যায়। তাঁহার রচনার এক দুর্বলতাও এইখানে।

বাদল-প্রিয়া, মেঘলা মেয়ে,
শাঙন-সাকী, আয়লো আয়,
কাজল-দেশের স্বপন-সখী
আয়লো মৃদুল দোদুল পায় !
হাতছানি দেয় ঝাউয়ের শাখা
চাতক মেলে তাতল পাখা,
মাছরাঙারা কাতর-চোখে
আকাশ পানে ঝিমিয়ে চায়,
আয়লো বাদল, ঘুম-কিশোরী,
আয়লো শীতল আদুল গায় ![৪]

[১] যেমন, 'প্রভাতে' (আশ্বিন ১৩২৮), 'বাংলা মেয়ে' (বৈশাখ ১৩২৯), 'তরুণী' (ভাদ্র ঐ) 'দুঃখসুখ' (মাঘ ঐ)।

[২] পাঠ 'পড়িস্'। [৩] 'বাংলা মেয়ে' ("মহিলা মজলিস" অংশে প্রকাশিত)।

[৪] 'বাদল-প্রিয়া' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১)।

এইসঙ্গে চলিয়াছে রবীন্দ্র-অনুসরণ।[১]

কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে অচিন্ত্যবাবু পত্রিকাটির এক মুখ্য লেখক হইয়াছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতা 'অমাবস্যা' ১৯৩০ সালে (দ্বি-স ১৯৪১, ত্রি-স ১৯৫৩) পুস্তিকাকারে বাহির হয়। প্রেমের কবিতা, বিচিত্র রসের মিশ্রণে স্বাদু এবং প্রেমের উত্তাপে কবোষ্ণতা। সেকালের নবীন কবিদের প্রিয় বিশ অক্ষরের ছন্দ একটানা, ভাঙ্গা ছত্রের যতি নিয়মিত। সুরও ছন্দের অনুসারী, মৃদুগুঞ্জিত করুণ অনুযোগের—বিরহের—কখনো বর্তমান বেদনার, কখনো অতীত সুখস্মৃতির, কখনো খিন্ন বিতৃষ্ণার, কখনো লুব্ধ ঈর্ষ্যার। কবির ভাব কিন্তু মেঘদূতের যক্ষের মত নয়। বাদল দিন ভালোই লাগিতেছে স্মৃতিরোমন্থনে।

> আজ দিনটিতে কোন কাজ নাই, বসে' আছি নিরালায়,
> বাদলের বেলা থেমে থেমে চলে, যেন ধিমে তেতালায়।
> অন্তরো মন্থর,
> বলিতে কি পারো এ দিন কাটিলে কি করি অতঃপর।

ক্ষণলব্ধ, প্রবঞ্চিত প্রেমের চরিতার্থতা মিলিল কবিতায়।

> গৃহ নাই, গৃহদীপ নহ তুমি, অবকাশরঞ্জিনী ;
> বাহুবন্ধনে নহ গো, ছন্দে করিলাম বন্দিনী।[২]
> লভিলে অমর কায়া,
> এই কবিতার প্রতিটি আখরে পড়েছে তোমার ছায়া।

গোড়ার দিকে নজরুলের (এবং যতীন্দ্রনাথের) একটু প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন,

> বেবাক্ বুকেতে কাদা পড়িয়াছে, পড়েছে চাকার দাগ,
> কামনার কূপে বন্দী মাগিছে সুন্দর অনুরাগ !
> লইয়ো অধরে তুলি'
> হৃদয় ত আর ভালো লাগিল না, মরিলে মাথার খুলি।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমরা' (১৯৩৩), তৃতীয় 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬)। দুইটিই ছোট বই। মোট সতেরোটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝোঁক স্পষ্টতর। রোমান্টিকতা গাঢ়তর। রচনা সুষম ও স্বচ্ছন্দ। যেমন,

> অকস্মাৎ কোথা হতে একদিন আসে যে সময়
> শ্মশানের কূল হ'তে সদ্যোজাত ফুলের আঘ্রাণ :

[১] যেমন 'রাত্রি' (বিজলী, ২৪ মাঘ ১৩৩১)।

[২] তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, "চিরসুন্দরে কর গো তোমার রেখাবন্ধনে বন্দী"।

আকাশে দেখিনা সীমা, তারস্বরে তারারা কী কয়
বুঝিনা তাহারো ভাষা, তবু দেহ গীতদীপ্যমান।
সৃষ্টির উড্ডীন পক্ষে আমি আছি,—আমি এক তিল,
একদিন,—তার পরে দিন নাই দিনের মিছিল।[১]

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ' (১৩৫৬)। কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য।

সমসাময়িকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার মুখ্য কবি,—এই অর্থে যে তাঁহার কবিতা-কর্ম স্বভাবসিদ্ধ, সুভগসুন্দর এবং তাঁহার কবিতায় কোন রকম তাৎপর্য বা মোচড় দিবার চেষ্টা নাই॥

১২

একদা "আধুনিক কবি" বলিতে যে তিনজনকে বুঝাইত তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪)। গদ্যে ও পদ্যে সমান স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় বহন করিয়া ইঁহার রচনা বাহির হইতে থাকে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' বাহির হয় ১৯৩২ সালে, তবে ইহার বিশিষ্ট কবিতাগুলি সবই প্রায় ১৯২৪-২৮ সালের মধ্যে "আধুনিক" সাহিত্যের পরিবেশক সাময়িক-পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] তাহার পর বাহির হইয়াছে 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮) ও 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬)।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সংখ্যায় বেশি নয়। এগুলির গুণ—সরল, মিতভাষী এবং স্পষ্ট। তাঁহার পদ্যের এবং গদ্যের ইহাই সাধারণ গুণ। অন্তরে ভাবাবেগ যথেষ্ট, কিন্তু তাহা বাগ্‌-বাহুল্যে, অথবা বাষ্পোচ্ছ্বাসে পর্যবসিত নয়। কালের গতিকে যতটা না হোক ফ্যাশনের খাতিরে অনেকটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিজীবনের প্রথমে দরিদ্র, নিপীড়িত, শ্রমার্ত, অজ্ঞাত, দুঃস্থদের দিকে নজর দিতে হইয়াছিল। অপরিণত হইলেও সে দৃষ্টিতে একটু স্বতন্ত্রতা আছে। তাহাতে সহবেদনার অনুভূতি, অনুকম্পার নয়। 'জগন্নাথের রথে' সত্যেন্দ্রনাথ ধনীকে দায়ী করিয়াছিলেন, এখন প্রেমেন্দ্রবাবু দরিদ্রকে লইয়া বড়াই করিলেন।

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!

১ একদিন।

২ 'বিজলী', 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'। প্রেমেন্দ্রবাবু কালি-কলমের সম্পাদক ত্রয়ীর অন্যতম ছিলেন।

এই যে হীনতার ও দীনতার পাশে আসিয়া দাঁড়ানো ইহার মধ্যে আতিশয্য অবশ্যই আছে, ঠাট বা পোজ উগ্র নয়। তরুণ কবির অস্ফুট বাসনা জগতে ও জীবনে সর্বত্রগামী ও সর্বভোগী হইবার। তাহারই একটু প্রকাশ ইহাতে।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ;
গৃহ-বেষ্টনে বসি,
কথন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী।

প্রেমেন্দ্রবাবুর বড় গল্পরচনা 'পাঁক' এই সময়েই লেখা হয়। ইহাতে শহরবাসী বস্তিজীবনের চিত্র, মোটা রঙ দিয়া আঁকা। মানবসমাজের ও মানবজীবনের এই যে দীনতা-বেদনার পঙ্ক ইহা—প্রেমেন্দ্রবাবুর মতে—বাহ্যঘটনার সংঘাতমাত্র নহে। আদিমতম জীব প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের উদ্ভব যে পাঁকের মধ্যে সেই "জননী" পঙ্কের আলেপন প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের উত্তরপুরুষেরা আজ অবধি বহন করিয়া আসিতেছে। (ইহাকে বাস্তবতা মনে করিলে ভুল হইবে, ইহা অতি-রোমান্টিক।)

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ।[১]

অভিমানহত কবি সেই পঙ্ক অর্ঘ্যরূপে জীবনবিধাতাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন।

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জ্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রু-বারি ;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবন-যাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমারে অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার।[২]

[১] প্রথমার প্রথম কবিতা। প্রথমপ্রকাশ 'অন্তরের কথা' নামে (বিজলী, ২৫ পৌষ ১৩৩১)।
[২] 'নমস্কার' নামে প্রথমপ্রকাশিত (বিজলী, ২৪ মাঘ ১৩৩১)।

যতীন্দ্রনাথ জীবন-বিধাতাকে উদাসীন নিষ্ঠুর বন্ধু বলিয়া চাপা বিদ্রূপ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে দুঃখমূর্তি দেখিয়াছিলেন।[১] প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবন-বিধাতাকে দুঃখমূর্তি খেলার-বুড়ি রূপে কল্পনা করেন নাই, তিনি রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহাকে দুঃখখেলার খেলুড়িরূপে সঙ্গে লইয়াছেন। তবে এখানে অবশ্যই আতিশয্য একপেশে এবং অত্যন্ত প্রবল।

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।...

বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।

যত কান্না ধরণীতে;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি![২]

সমাজদৃষ্টিতে নবজাগরণের বন্দনা গাহিয়াছেন কবি পথের পাঁচালী রূপে।

পাল্‌কি চড়ে চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,—
আজ ওই নগ্ন সবল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারি হ'ল
পাপের ভারে,—
ওই পুণ্যপথের ধূলায় নামাও সে ভার।
আজ পাঁওদল্‌, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল্‌, চলেছেন মানবের দেবতা।
আজ যদি চোখে জল আসে
সে কি দুর্ব্বলতা?
ওই কালিমাখা শ্রম-কঠোর ঘর্ম্মাক্ত দেহখানি
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হ'তে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা?[৩]

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।
[২] প্রথমপ্রকাশ 'ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে' নামে (বিজলী, ১ ফাল্গুন ১৩৩১)।
[৩] প্রথমপ্রকাশ 'পাঁওদল্‌' নামে (বিজলী, ১ শ্রাবণ ১৩৩২)।

পরবর্তী কালে কবিমানসে সমাজ-জীবনের অন্বীক্ষা কমিয়া গিয়াছে, কবিচিন্তা ব্যক্তিজীবনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। তবে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আগ্রহ কমে নাই। কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায় জীবনপ্রবাহ কবিচিন্তাকে এইভাবনায়ই পরিচালিত করিয়াছে।

হিমালয় নাম মাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা,
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।[১]

ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক কবিতায় যেমন প্রেমেন্দ্রবাবুর কবিতায়ও তেমনি স্রষ্টা, মানুষ ও প্রকৃতির স্থান লইয়াছে যথাক্রমে কবি, নগরের সাধারণ লোক (man in the street) এবং নগরের পথ। তবে স্রষ্টা একেবারে বাদ পড়েন নাই।

নাম তার জানিনাকো;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক,
আছে এক করুণ পথিক,
—যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।…
ইতিহাস নিরুত্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।…

তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হয়ে গেলো যেন পথের কিনারে।…
ম্লান কণ্ঠে শুধায়েছে
ঠিকানা কোন সে বুঝি অখ্যাত গলির;
—সেথায় সে যেতে চায়, জানেনাকো পথ।[২]

১৩

বন্ধুত্রয়ীর[৩] মধ্যে কনিষ্ঠতম শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮) কবিতাকর্মে সর্বাধিক নিষ্ঠিত এবং মনোযোগী। বন্ধুদের মত—এমন কি তাঁহাদের চেয়ে বেশি—গল্প-

১ 'ভৌগোলিক' (ফেরারী ফৌজ)। ২ 'জনৈক' (ঐ)।

৩ অচিন্ত্যবাবু প্রেমেন্দ্রবাবু ও বুদ্ধদেববাবু তিনজনে মিলিয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। পরে দ্রষ্টব্য।

উপন্যাস লিখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের বাড়া—বিবিধ প্রবন্ধ বিশেষ করিয়া সাহিত্য-সমালোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ কোন মাসিকপত্রে প্রকাশিত বুদ্ধদেববাবুর প্রথম কবিতা বোধ করি 'যাত্রী'।[১] রবীন্দ্র-ভাবিত কবিতাটি যে রবীন্দ্র-বিরোধী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কারণ বোধ হয় তখন ঢাকায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অবস্থান। বুদ্ধদেববাবু আগাগোড়া ঢাকার ছাত্র ছিলেন।

বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্যসৃষ্টি রবীন্দ্র-ভাবিত (তবে তাহার মধ্যে ডি এইচ লরেন্সের ও মাইকেল আর্লেনের মত ইংরেজী লেখকের প্রভাব বেশ আছে), এবং রবীন্দ্র-ভাষাশিল্পকে বুদ্ধদেববাবু যতটা ব্যবহার করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কেহই করেন নাই। মনে হয় পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই ইনি (—রবীন্দ্রনাথের বিরোধ করিয়া বলিব না—) রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চাপা অভিমান লইয়া লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। শুধু বুদ্ধদেববাবুর নয় এ অভিমান তাঁহার বন্ধুদের এবং সহযোগীদের অনেকেরই ছিল। সে অভিমানের প্রধান কারণ নিজেদের শক্তির উপর অগাধ আস্থা এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা-বিচিত্রতা-উত্তুঙ্গতার জন্য অস্বস্তি।

তুমি আর আমি

বিধাতার নির্বাচিত দেবকুলবংশোদ্ভূত মোরা—
... মোরা কবি, কাব্য-সরস্বতী
আমাদের চির-প্রিয়তমা। ...
তুমি আর আমি জানি—তার চেয়ে ভালো কেবা জানে?—
রবীন্দ্র ঠাকুর শুধু আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কবি-রূপে রহিবেন কুমারীর প্রথম প্রেমিক,
প্রথম ঈশ্বর বালকের, বৃদ্ধের যৌবন-ঋতু,
সকল শোকের শ্রান্তি, সব আনন্দের সার্থকতা,
শক্তির অশেষ উৎস, জীবনের চিরাবলম্বন।[২]

বুদ্ধদেববাবুর প্রথম কবিতার বই 'মর্মবাণী' (১৯২৫) এখন বিলুপ্ত

১ ১৩২৮ ফাল্গুন সংখ্যা নারায়ণে প্রকাশিত।

২ 'কোনো বন্ধুর প্রতি' (বন্দীর বন্দনা), শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দত্তের সহযোগিতায় সম্পাদিত এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রগতি'তে প্রথম প্রকাশিত।

৩ বইটির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিজলীর (২৭ কার্তিক ১৩৩২) এই সমালোচনায় সীমাবদ্ধ: '"মর্মবাণী" কবিতার বই। কিশোর-কবি বুদ্ধদেব বসু প্রণীত। ২৬নং বাঙ্গলা বাজার, ঢাকা হইতে শ্রীগঙ্গাচরণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। বাঙলা মাসিক সাহিত্যের সাঁ

কবিরূপে বুদ্ধদেবের আসল আত্মপ্রকাশ 'বন্দীর বন্দনা'য় (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৪০)।[১] মোট দশটি কবিতা। একটি ছাড়া সবই "১৯২৬ থেকে '২৯এর মধ্যে লেখা"। দুইটি কবিতা কল্লোলে আর ছয়টি কবিতা প্রগতিতে প্রথম বাহির হইয়াছিল। 'বন্দীর বন্দনা' নামটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বন্দী-বন্দনা'[২] থেকে নেওয়া। বন্দীর-বন্দনায় বিশিষ্ট কয়েকটি কবিতায় যৌবনোন্মেষেচাচিত যৌন-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার অভিব্যক্তি। লরেন্সের সাহিত্য-ভাবনায় যাহা সৃষ্টির মৌলিক আবেগ বলিয়া স্বীকৃত তাহা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় "বিধাতার দেনা" বলিয়া অভিশপ্ত। সে দেনার দায়ে

> ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি, কর্ম-মাঝে, মর্ম-মাঝে মোর,
> প্রতি স্বপ্নে প্রতি জাগরণে,
> প্রতি দিবসের লক্ষ বাসনা-আশায়
> আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
> সৃজন-উষার আদি হ'তে—
> উদাসীন স্রষ্টা মোর![৩]

নারীর ভালোবাসার আলোকে বঞ্চিত কবিমানস শেষ-কৈশোরে আপনার যৌবন-সুন্দর রূপখানি প্রত্যক্ষ করিতে ব্যাকুল। কবিমানস আত্মরত, ভালোবাসে শুধু আপনাকে, এবং সেই আত্মরতিকে উদ্ভাসিত করিতে চায় কামনার প্রিয়ায় আত্মসমর্পণের বহ্নিতে।

> আর কিছু নহে। শুধু তুমি মোরে ভালোবাসো—
> এই কথা ভাবিবার
> অধিকার দাও যদি মোরে!
> কী আছে তোমার মনে করিবো না বৃথা অন্বেষণ।[৪]
>
> আর আমি ভালোবাসি নতুন ননীর মতো তনুলতা তব,
> (ও গো কঙ্কাবতী!)
> আর আমি ভালোবাসি তোমার বাসনা মোরে ভালোবাসিবার,
> (ও গো কঙ্কাবতী!)
> ও গো কঙ্কাবতী!

যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের কাছে বুদ্ধদেববাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। ...তাঁহার হাত বেশ মধুর—ছন্দোজ্ঞানও আছে। —আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে 'অরূপ' 'পরিণতি' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বেশ ভাল লাগিয়াছে।'

[১] নজরুলের কবিতাটি ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

[২] 'বন্দীর বন্দনা' (প্রথমপ্রকাশ কল্লোলে)। 'অমিতার প্রেম'; রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' অতুলনীয়।

[৩] 'অমিতার প্রেম'; রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' অতুলনীয়।

[৪] 'প্রেমিক'।

যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়-গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি' যায় হর্ষের বিজলী,—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,…
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।[১]

'অপর্ণার শত্রু' রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম'এর আধুনিক ব্যাখ্যা। 'অমিতার প্রেম'[২] তাহার প্রস্তাবনা, 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান'[৩] তাহার উপসংহার। 'মোহমুক্ত' কবিতায় মোহিতলাল মজুমদারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুন্দরী,
বিষতৃষ্ণা নিবারিবো তোমাদের তীব্র দেহ-মদ্য পান করি'।

বন্দীর-বন্দনার পর বুদ্ধদেব বসুর কাব্যকলা ভাব জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া নির্মাণশিল্পের দিকে ঝোঁক দিল। তাহার এক পরিচয় 'কঙ্কাবতী' কবিতায়।[৪] কবিতাটির ইঙ্গিত মিলিয়াছিল বোধ করি প্রমথ চৌধুরীর কবিতা হইতে (এবং কঙ্কাবতী নাম ইতিপূর্বে 'প্রেমিক' কবিতায়ও মিলিয়াছে),

মিলনের অহঙ্কারে সালঙ্কারা কঙ্কা,
নূপুরে কঙ্কণে তোলে বীণার ঝঙ্কার,
রশনায় দেয় মুহু বিজয়-টঙ্কার,—[৫]

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় কবিতাপুস্তক 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩)। সবই প্রেমের কবিতা এবং ১৯২৬-২৮ সালের মধ্যে লেখা বলিয়া উল্লিখিত। 'তথাপি বাঁচিয়া র'বে?' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ'এর অনুসরণ স্পষ্ট। এই কবিতার ছন্দোরূপ পরেকার আরও দুই-তিনটি কবিতায় প্রকট। এখনও স্থায়ী কবি-যশের আকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঈক্ষণ এখনো সম্পূর্ণ সরল নয়।

একবিংশ শতাব্দীর কোনো
সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি—পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত
বাতায়ন-তলে;
সতীর্থের হৃদ্-পদ্মে গন্ধ-রূপে ক্ষণিকের স্মৃতি-স্বপ্ন—
জানি, তা-ও ঝুট।[৬]

[১] 'শাপভ্রষ্ট' (কল্লোলে প্রথমপ্রকাশিত)।
[২] প্রগতিতে প্রথমপ্রকাশিত।
[৩] দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথমপ্রকাশিত।
[৪] 'স্বপ্ন-লঙ্কা' (সনেট-পঞ্চাশৎ)।
[৫] 'আর কিছু নাহি সাধ'।
[৬] দ্বিতীয় সংস্করণে পুরা নাম 'কঙ্কাবতী: কাল ও কখনো: ও অন্যান্য কবিতা'।

'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭, দ্বি-স ১৯৪৩) তৃতীয় কবিতার বই। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯-৩৪। কঙ্কাবতী নামটির ঝঙ্কারে গুঞ্জরিত কবিতাগুলিই ('আরশি', 'সেরিনাড' 'কঙ্কাবতী' ও 'শেষের রাত্রি') বিশিষ্ট রচনা।

১৯৩৫ সাল হইতে বুদ্ধদেববাবু কবিতার ভাষায় সাধুভাষার ক্রিয়াপদ এবং যে সব শব্দ ও পদ শুধু কাব্যে প্রচলিত সেসব বাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার কবিতার ভাষা চলিত ভাষার সঙ্গে এক হইল, তবে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বাধা রহিল না। সমকালীন কোন কোন কবির—যেমন জীবনানন্দ দাশের—রচনার প্রভাবও স্বীকৃত হইল। যেমন,

ঝাঁকে-ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনের মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায়-চাকায়।[১]

কয়েকটি কবিতায় পদ ও বাক্যাংশের যে পুনরাবৃত্তি আছে সে টেকনিক সরাসরি ইংরেজী থেকে নেওয়া নয়, জীবনানন্দ দাশের কাছে পাওয়া। যেমন,

ছোটো ঘরখানি মনে কি পড়ে,
সুরঙ্গমা ?
মনে কি পড়ে ? মনে কি পড়ে ?
জানালায় নীল আকাশ ঝরে
সারা দিনরাত হাওয়ায় ঝরে
সাগর-দোলা[২]

দময়ন্তীর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৫-৪২। তবে বইয়ে সঙ্কলনের সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে লেখক কবিতাগুলির বিশিষ্ট রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই ছয়টি নিয়মসূত্র তিনি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন : (১) কথ্যভাষার বাক্‌রীতি উল্লঙ্ঘিত হইবে না; (২) সাধুভাষার ক্রিয়াপদ চলিবে না; (৩) কাব্যে প্রচলিত ক্রিয়াপদ (যেমন "ফুটি", "হতেছে", "চলিছে") যথাসাধ্য বর্জনীয়; (৪) কাব্যে ব্যবহৃত নাম ও অব্যয় পদ (যেমন "মম", "মোদের", "তব", "আঁধার", "পরাণ", "মাঝে" (!), "যবে", "যেথা", "সনে" "সাথে") এবং প্রাচীন পদ (যেমন "দেখিবারে", "দেহ") সর্বথা পরিত্যাজ্য; (৫) চলিত বাঙ্গালা শব্দের তৎসম প্রতিশব্দ (যেমন "হস্ত", "তরু", "পুষ্প", "পবন", "হাত", "গাছ"—"ফুল", "হাওয়া" স্থলে) অচল ধরিতে হইবে; (৬) ঔপভাষিক

১ 'এখন বিকেল' (দময়ন্তী)। ২ 'সাগর-দোলা'।

পদ (যেমন "এনু", "ঘরেতে", "নারি") অচল ; (৭) "অথচ এরই সঙ্গে ভাষা হবে সুগম্ভীর সংস্কৃতিক ; সংস্কৃত শব্দ বেশি করে নিলে রচনায় যে দৃঢ়তা ও সংহতি আসে সেটা ছাড়বো কেন ?" লেখক অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, "তালিকাভুক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা সম্ভব হয় নি। বিচ্যুতি ঘটেছে।"

'দ্রৌপদীর শাড়ি'র (১৯৪৮) কবিতাগুলি ১৯৪৪-৪৭ সালের মধ্যে লেখা। মিলহীন সমাক্ষরিক ছন্দে লেখা নাম-কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পারিজাতগুচ্ছে সঙ্কলিত 'প্রিয়তমার প্রতি' সনেটটির দ্বারা অনুপ্রাণিত। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার শেষ চরণ,

দ্রৌপদীর সাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী।

'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'এর (১৯৫৫) কবিতাগুলি তিন অংশে বিভক্ত। ছড়ার ছন্দ লইয়া বুদ্ধদেববাবু দময়ন্তীতে যে এক্স্‌পেরিমেণ্ট করিয়াছিলেন তাহারই পরিণতি কয়েকটি কবিতায় পাই। যেমন,

আমার পরাণ যা চায় তুমি যে তা-ই, তুমি তা-ই, তোমারে কি
আমি করবো যাচাই
প্রাত্যহিকের বাধ্য-বাঁচায়, বন্দী দেহের ক্ষুদ্র খাঁচায়, করবো বাছাই
মানুষের ভিড়ে ? তাও কি হয় ?
তুমি যে নও
আর কারো মত, সেটা কি জানবো মুখের রেখায়, মুখের কথায়,
চোখের ক্ষণিক দেখায়, কিংবা দেহের অনেক আবশ্যিকের
বদভ্যাসে, মুদ্রাদোষে ?[১]

ইহার সঙ্গে হাপু-গানের ছন্দের পার্থক্য সামান্যই॥

১৪

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনায় মিল আছে এই যে দুইজনেই বিশেষভাবে প্রেমভাবিত। তবে পার্থক্যই বেশি। বুদ্ধদেব আত্মকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব, অচিন্ত্যকুমার তেমন নহেন। বুদ্ধদেব আপনার ভাবনায় নিমগ্ন এবং নিবদ্ধ, অচিন্ত্যকুমার আপনার ভাবনার পাশ কাটাইয়া স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টিত।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রীযুক্ত সমর সেনের সহযোগিতায় ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন (আশ্বিন ১৩৪২)। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে ঢাকায় হরিশ্চন্দ্র মিত্র বাঙ্গালায় কবিতাময় পত্রিকার পথ

১ 'নেপথ্য নাটক' (রচনাকাল ১৯৪৭)।

দেখাইয়াছিলেন, শতাব্দীর শেষের দিকে রাজকৃষ্ণ রায় সে পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে বর্তমান শতাব্দীতে ইহাই প্রথম। উদ্দেশ্য শুধুই যে "আধুনিক" কবিতা প্রকাশ করা তাহাই নয়, সেই সঙ্গে "আধুনিক" কবিতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং "আধুনিক" কবিতালেখকদের পক্ষ সমর্থন করা॥

১৫

বুদ্ধদেববাবুর সতীর্থ এবং 'প্রগতি'-সম্পাদনে সহযোগী শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দত্ত (জন্ম ১৯০৭) গোড়া থেকে গদ্যে পদচারণ করেন নাই। তাঁহার মন মশগুল ছিল কবিতাতেই। কবিতারচনায় স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াসসারল্য অজিতবাবুর কবিতার সাধারণ গুণ। তাঁহার কবিপ্রেরণার পিছনে কোন ফ্যাশনের তাগিদ নাই এবং তাহা কোন তাত্ত্বিক খাতেও পরিবাহিত নয়।

অজিতবাবুর প্রথম কবিতার বই 'কুসুমের মাস' (১৯৩০, দ্বি-স ১৯৪৭)। চল্লিশটি কবিতা আছে। তাহার মধ্যে আঠারোটি আঠারো-অক্ষরাত্মক চতুর্দশপদী কবিতা। কবিতাগুলিতে প্রেমের মৃদু সৌরভ পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাচন স্মরণ করায় (যেমন 'গুরুজনদের মাঝে')। (দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত অজিতবাবুও কুসুমপ্রিয়।) প্রেমতন্ময়তার উজ্জ্বল প্রকাশ 'বার্তা'য়।

> তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।
>
> এ-কথা কহিবো আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
> এ-কথা ছড়ায়ে দিবো আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
> বাতাসে ভাসাবো আমি এই সত্য সমস্ত ধরায়;
> এ-কথা পাঠাবো দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে,
> পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সবে যেন জানে
> যে-কথা নিভৃতে বসি' তোমারে বলিতে প্রাণ চায়।

'মালতী ঘুমায়' ও 'মালতী' অজিতবাবুর সবচেয়ে পরিচিত কবিতা। অজিতবাবুর নায়িকার নাম মালতী, যেমন বুদ্ধদেববাবুর কঙ্কাবতী আর জীবনানন্দের বনলতা সেন। মালতী রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আধুনিক সংস্করণ বটে তবে উলটা পিঠ। বিশ্ব তাহাকে কামনা করে কি করে না সে কথা অবান্তর, বিশ্বকে সে অশান্তচিত্তে কামনা করিতেছে—কতকটা যেন পুরাণের উর্বশীর মত, অনেকটা যেন আধুনিক রূপোপজীবিনীর মত।

সৌন্দর্য-কামনা যার, তারি তরে রূপসী মালতী
আপনার দেহ-গেহে সব রূপ করেছে আহ্বান.
যোড়শ-বসন্তে য'দি নাই নামে পূর্ণিমার জ্যোতি,
আজি রাত্রে তনু-সুরা নিঃশেষে করিতে হবে পান।
রূপসী মালতী আজ আপনারে করিবে প্রদান
রূপহীন পুরুষেরে ;—আজি রাত্রে তথাপি—তথাপি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রূপ ব্যর্থতায় নাহি হবে ম্লান :[১]

দ্বিতীয় বই 'পাতালকন্যা' (১৯৩৮)। সবশুদ্ধ ছাব্বিশটি কবিতা, তিনটি অনুবাদ। নাম-কবিতায় মালতীর আর একদিক,—রূপকথার রাজকন্যা পাতাল-পুরীতে বন্দিনী, নাগবেষ্টিত, বিষমূর্ছিত। দুর্লভতম সে।

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলী,
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে দুলি',···
কুমারের উদাসীন মন
সে-দেশে গিয়েছে উড়ে ; তাহারে ফিরাবে কোন জন ?[২]

দু'একটি কবিতা হালকা ভাবের। একটিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা মনে পড়ায়।

পুরুষের ভাগ্যলিপি জানিতে পারেনা দেবতায় ;—
তুমি সাহিত্যিক হবে সৃষ্টিকর্ত্তা তা' যদি জানিতো,
তাহলে বস্তুত কিছু বস্তু দিতো তোমার মাথায়,···
প্রাচীন লেখকদের আধুনিক হে হুঁকো বর্দ্দার,
তুমিও বিখ্যাত হলে সেই দুঃখে লিখিনা কবিতা।[৩]

তৃতীয় বই 'নষ্টচাঁদ'এর (১৯৪৫) কবিতাগুলি মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা। কবিতাসংখ্যা একুশ। কয়েকটি হালকা ছাঁদের। নষ্টচাঁদের কবিতায় রচনারীতি আরো লঘু ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। প্রেমে বিশ্বস্ততার বদলে সংশয় জাগিয়াছে।

হয়তো তারারা জোনাকির চেয়ে বড়ো নয়,
মনে হয়।
মনে হয়,
হয়তো আকাশ পৃথিবীর চেয়ে বড়ো নয়।[৪]

১ 'মালতী'।
২ 'পাতালকন্যা'।
৩ 'পুরুষস্য ভাগ্যম্'।
৪ 'সংশয়'।

চতুর্থ বই 'পুনর্ণবা' (১৩৫৪)। মোট আটাশটি কবিতা, ১৯৩৪-৪৬ সালের মধ্যে লেখা। কয়েকটি কবিতা আঠারো-অক্ষরের চতুর্দশপদী। অল্প কয়েকটি হালকা রচনা। কবিচিত্তে সংশয় কাটিবার ইশারা আছে কয়েকটি কবিতায়।

> প্রেম যদি সত্য হয়, মানুষের আত্ম যদি থাকে,
> এ-পঙ্কতিলক মুছে অবশ্যই আছে জয়মালা,
> সে-আশ্বাসে রচি কাব্য, লভি আজো জীবনের স্বাদ।[১]

> একদিন এ-জীবনে সত্য ছিলো মিথ্যার বেসাতি—
> স্মৃতির ঐশ্বর্য্য—তবু,বাধা আজ স্বচ্ছন্দ গতির,
> নিঃশঙ্ক গৌরবে তাই ছিন্ন করি পূর্ব অঙ্গীকার।
> প্রাণের স্রোতের সাথে গতি যার সেই শুধু সাথী,
> তুচ্ছ তাই দুঃখ শোক অতীতের সমস্ত ক্ষতির,
> সমুদ্র ডেকেছে যারে সম্মুখই শাশ্বত মাত্র তার।[২]

পঞ্চম বই 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১)। মোট আটাশটি কবিতা। কবিচিত্ত বর্তমানের বিষয়ে নিঃসংশয় ।

> আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
> দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুন্ন পিপাসা
> আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
> নিরন্তর মনে মনে কথা শুনি জীবনের আমন্ত্রণ।[৩]

> ভালো লাগে ভালো লাগে—এই কথা গুনগুন করে'
> আসে মন ভরে'।[৪]

'খাণ্ডব দাহন'এর শেষ কয় ছত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

অজিতবাবু গদ্য লেখা আরম্ভ করিয়াছেন অনেক পরে। 'জনান্তিকে' (১৯৪৯) হালকা ও বিশ্রব্ধ প্রবন্ধের বই। 'মন পবনের নাও' (১৯৫১) 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রথম বাহির হইয়াছিল। লেখক "রৈবত" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। "সাহিত্যাদি নানা বিষয়ে" লেখক তাঁহার "মত সোজাসুজি প্রকাশ" করিয়াছেন॥

১ 'প্রত্যয়' (রচনাকাল সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)।
২ 'পশ্চাতের আমি' (রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৪৬)।
৩ 'পাখী আর তারা'।
৪ 'ভালো লাগে'।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ ও নাট্যরচনা

১

আলোচ্য সময়ে নবীন প্রবন্ধ-লেখকেরা প্রধানত সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্তর্গত অথবা প্রমথ চৌধুরী প্রভাবিত ছিলেন। ইঁহাদের চিন্তায় স্বকীয়তা, রচনায় পরিচ্ছন্নতা এবং বিষয়ের উপস্থাপনে ঋজুতা প্রকট। এমন লেখক যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (জন্ম ১৮৮৪), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত (জন্ম ১৮৮৯), শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯০), শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৪) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বেশি লিখেন নাই, কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন তাহার স্থায়ী মূল্য আছে। ইঁহার 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় (১৯২৮)[১] ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের জটিল সিদ্ধান্ত আধুনিক কালের পাঠকের উপযোগী করিয়া সহজ ও সরল ভাবে উপস্থাপিত। ছোট বই 'নদীপথে' (১৯৩৭) কয়েকটি পত্রের সঙ্কলন। ইহাতে সুন্দরবন দিয়া আসাম পর্যন্ত নদীপথ ভ্রমণের শান্ত ও সুন্দর বর্ণনা আছে।

সাহিত্য ও শিল্প চিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধ-রচনায় নলিনীকান্ত মুখ্যস্থানের অধিকারী। ইঁহার প্রবন্ধে বহুশ্রুততার ও মনীষার পরিচয় সহজলভ্য। সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ইনি অন্যতম প্রথম পথপ্রদর্শক। নলিনীকান্তের রচনা গাঢ়বদ্ধ সেইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু গুরুপাক। শেষের দিকের কোন কোন রচনায় অরবিন্দের অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব প্রস্ফুট। নলিনীকান্তের প্রবন্ধপুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— 'সাহিত্যিকা' (১৯২০), 'রূপ ও রস' (১৯২৮), 'শিক্ষা ও দীক্ষা' (১৯২৮), 'আধুনিকী (১৯৩২), 'শিল্পকথা' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯০) ভাষাবিজ্ঞানী ও ভারততত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিশ্ববিশ্রুত। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে "ভাষাচার্য" বলিয়া

১ প্রথমপ্রকাশ সবুজপত্রে।

অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার 'ভাষা-পরিচয়' উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখক হিসাবে সুনীতিবাবুকে দুই গুরুর শিষ্য বলিয়া ধরিতে পারি,—বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতায় প্রমথ চৌধুরীর। তবে ষ্টাইল ইঁহার নিজস্ব। মানুষের বিষয়ে সুনীতিবাবুর গভীর এবং সার্বভৌম আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। গ্রীক দর্শন হইতে নিগ্রো আর্ট এবং নৃতত্ত্ব হইতে তানসেন সঙ্গীত—সর্বত্র ইঁহার কৌতূহল সদা জাগ্রত। ইঁহার অকপট জীবন-রস-পিপাসার পরিচয় সব চেয়ে প্রকট হইয়াছে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে—'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০), 'ইউরোপ ১৯৩৮' দুই খণ্ড (১৯৪৫) ইত্যাদিতে। সুনীতিবাবুর ভ্রমণকাহিনী পড়িলে একসঙ্গে পথ পথ্য পাথেয় এবং পথিকসঙ্গসুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। সুনীতিবাবু বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশ সঙ্কলিত হয় নাই। সঙ্কলিত প্রবন্ধ-পুস্তক—'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৩৮) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গল্প এবং উপন্যাসও লিখিয়াছেন। ইঁহার উপন্যাসে প্রবন্ধোচিত মননশীলতার পরিচয় আছে। 'রিয়লিষ্ট' (১৯৩৩) গল্পের বই। ষ্টাইলে প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণ স্পষ্ট। ইহার সব চেয়ে বিশিষ্ট রচনা উপন্যাস-ত্রয়ী—'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত্ত' (১৯৩৭) ও 'মোহানা' (১৯৪৩)।[১] পোলিটিকাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসার ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত। বাঙ্গালা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও নূতন বটে। 'আমরা ও তাঁহারা' (১৯৩১), 'চিন্তয়সি' (১৯৩৩) এবং 'কথা ও সুর' (১৯৩৮) প্রবন্ধের বই।

সবুজপত্রের কয়েকজন তরুণ লেখক গল্পের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আগে বলিয়াছি। ইনি গল্প ছাড়া কবিতাও লিখিয়াছিলেন। কিরণশঙ্কর রায়ের (মৃত্যু ১৯৫০) ছোটগল্পের সঙ্কলন 'সপ্তপর্ণ' ॥

২

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) রবীন্দ্র-সাহিত্যসমালোচনার পথপ্রদর্শক। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির অভিযোগ ছিল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য মায়িক এবং কল্পনাসর্বস্ব।[২] এই অভিযোগের জবাবে অজিতকুমার যে দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহাই 'রবীন্দ্রনাথ'এ

[১] মোহানার প্রথমপ্রকাশ পরিচয়ে (১৩৪৮-৪৯)।

[২] ১৩১৮ সালের চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৯১২) ও 'কাব্য পরিক্রমা'য় (১৯১২) সঙ্কলিত। এই প্রবন্ধগুলির রচনায় লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পাইয়াছিলেন। অজিতকুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী লিখিয়াছিলেন। অপর প্রবন্ধপুস্তক —'বাতায়ন'। 'খৃষ্ট' যীশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধে বালক-পাঠ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (জন্ম ১৮৮০) স্বদেশী যুগে মানিকতলা বোমার মামলায় নির্বাসনদণ্ডভোগীদের অন্যতম। মনোমোহন, অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার—তিন ভাইই মাতামহের সাহিত্যপ্রীতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মনোমোহন অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় ইংরেজী কবিতা লিখিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অরবিন্দের ইংরেজী কবিতা ও অন্যান্য রচনা সুবিদিত। বারীন্দ্রকুমার অল্পবয়সেই বাঙ্গালা রচনায় মন দিয়াছিলেন। আন্দামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বারীন্দ্রকুমার আবার বাঙ্গালা লেখায় মন দেন। কিছুকাল ইনি পাক্ষিক 'বিজলী' সম্পাদন করিয়াছিলেন।[১]

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন মনস্বী সেখানে যোগদান করেন। কিছু কাল পরে যাঁহারা পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় (জন্ম ১৮৯৭) একজন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র এবং তাঁহার সুকণ্ঠ ও সাহিত্য-সঙ্গীতপ্রীতির উত্তরাধিকারী দিলীপকুমার অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-গুরুদের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পিতার প্রবর্তিত ভারতবর্ষ পত্রিকায় দিলীপ-কুমারের লেখকরূপে আবির্ভাব। ইনি কবিতা গান গল্প-উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি প্রচুর লিখিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থাবলী—'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা' (১৩৩৩), 'মনের পরশ' (১৯২৬), 'বহুবল্লভ' ও 'দুধারা' (১৯২৭), 'অনামী' (১৯৩৩, প্রধানত কবিতা), 'রঙের পরশ' (১৯৩৪), 'তীর্থঙ্কর', 'দোলা' (১৯৩৫), 'সূর্যমুখী' (১৯৩৬, কবিতা), 'আবার ভ্রাম্যমাণ' (১৯৪৪) ইত্যাদি ইত্যাদি॥

৩

গল্প-উপন্যাসের তুলনায় নাটকে লেখকেরা তেমন বৈচিত্র্য অথবা শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। এটা বাঙ্গালা সাহিত্যেরই বিশেষত্ব নয়, প্রায় সব আধুনিক সাহিত্যেই

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

দেখা গিয়াছে। সাহিত্যের একটি প্রধান ফর্ম হিসাবে নাটক গল্প-উপন্যাসের চেয়ে অনেক প্রাচীন, এমন কি কাব্যের চেয়েও প্রাচীন বলা যায়। নাটক অর্থাৎ নাট্যাভিনয় বহুলোকের একসঙ্গে চিত্তবিনোদন করে। ছাপা বইয়ের প্রচলন হইবার পরে এবং পাঠ্য গল্প-উপন্যাস চালু হইবার ফলে শ্রব্য রচনার অপেক্ষা পাঠ্য রচনার প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িয়াছে। সুতরাং সাহিত্যরস-যোগানিয়া হিসাবে নাটকের আদর ও কদর কমিয়াছে। তাহার উপর সিনেমা আসিয়া পড়ায় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এইসব কারণে নাটক-রচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহ নাই।

বর্তমান শতাব্দের প্রথম দশ বছরে প্রধানত গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই (১৮৪৮-১৯১১) প্রভাব চলিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব নাটকে এবং নাট্যাভিনয়ে বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মির কাশিম' (১৯০৬) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক নাট্যামোদী জন-সাধারণের চিত্তে দেশপ্রেমের যত না হোক ইংরেজ-বিদ্বেষের ঢেউ তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকশিল্প গিরিশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে নাই, তবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাভূষণকে (১৮৬৩-১৯২৭) করিয়াছিল। দ্বিতীয় দশকের নাট্যকারদের মধ্যে ইনি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই (১৮৬৯-১৯১৩) প্রধান। ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশ-চন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছিলেন প্রধানত পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক নাটক-বস্তুতে। দেশপ্রেমবাহী ঐতিহাসিক নাটক-বস্তুতে অনুসরণকারী ছিলেন অনেকে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিশিকান্ত বসু রায়।[১] ইনি পৌরাণিক বস্তুকে কিঞ্চিৎ নূতনতার সহিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করিয়া সাফল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) বাঙ্গালা নাটকের পুরানো ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য লেখক।[২] ইঁহার 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৩৮) বহু প্রহসন লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'কেলোর কীর্তি' (১৯২১), 'পেলারামের স্বাদেশিকতা' (১৯২২), 'ডারবি টিকিট' (১৯২৭) ইত্যাদি বই সাধারণ

[১] রচনা—'বাপ্পারাও' (১৯১৫), 'দেবলা দেবী' (১৯১৮), 'বঙ্গে বর্গী' (১৯২২), 'পথের শেষে' (১৯২৮) ইত্যাদি।

[২] ইনি বহু নাটক লিখিয়াছিলেন। যথা, 'আহুতি' (১৯১৪), 'রাখী বন্ধন' (১৯২০), 'অযোধ্যার বেগম' (১৯২১), 'বিদ্রোহিণী' (১৯৩২) ইত্যাদি।

রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হইয়াছিল। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তও অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'মিসরকুমারী' (১৯১৯) জনপ্রিয় হইয়াছিল॥

৪

সঙ্গীত-সমাজে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তাঁহার ও অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের অভিনয় (উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে) বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষীয় অভিনয়-শিল্পে দিক্‌দর্শন করিয়াছিল। ইহার প্রভাব সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয় নাই। তবে কলেজীয় ছাত্রদলের অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রযোজনা যে নূতনত্ব দেখাইয়াছিল তাহাতে সঙ্গীত-সমাজের অভিনয়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই ছাত্রদলের মুখ্য অভিনেতা দুইজনকে পরবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে পাইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র আর একজন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী (জন্ম ১৮৮৯)। তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে যে নবীনতা প্রবর্তিত হইল তাহা প্রধানত শিশিরকুমারেরই কৃতিত্ব। কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রযোজক-অভিনেতা রূপে দেখা দিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর (১৮৮৯-১৯৪১) 'সীতা' নাটক লইয়া ১৯২৪ সালে। এই নাটকের প্রযোজনায় তিনি তাঁহার যে কয়জন বন্ধুর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফাল্গুনীর অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই অভিনয় আমাদের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই অভিনয় হইতে শিশিরকুমার তাঁহার প্রযোজনার সূত্র পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতির অভিনয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব স্মরণীয়। বাঙ্গালা সিনেমা চিত্রের ব্যাপারেও শিশিরকুমার অগ্রণী হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় করিবার মূলে শিশিরবাবুর প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্বন্ধেও তাই।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আরও কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—'দিগ্বিজয়ী' (১৯২৮), 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৩১), 'বাংলার মেয়ে' (১৯৩৪), 'পথের সাথী' (১৯৩৫), 'মাকড়সার জাল' (১৯৩৯), 'মহামায়ার চর' (১৯৪০) ইত্যাদি। কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসকে ইনি নাট্যরূপ দিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালের নাট্যকারদের মধ্যে তিনজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৯২), শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় (জন্ম ১৮৯৯) এবং শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৬)। শচীন্দ্রনাথের নাটকে সমসাময়িক পোলিটিকাল ও সামাজিক অবস্থার স্বীকৃতি আছে।[১] মন্মথ রায় প্রথমে যে নাটক লিখিয়াছেন তাহাতে সমসাময়িক পোলিটিকাল অবস্থা স্মরণ করিয়াই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বিত।[২] পরে ইনি অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন।[৩] শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় কতকটা যোগেশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথের অনুসারী।[৪]

অতঃপর যাঁহাদের নাটক অল্পবিস্তর সমাদৃত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে দুইজন উল্লেখযোগ্য,—'মাটির ঘর' (১৯৩৯) ইত্যাদির লেখক শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১০) এবং 'চক্রধারী' (১৯৩৮), 'কঙ্কাবতীর ঘাট' (১৯৪১), 'টিপু সুলতান' (১৯৪৪) ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত (জন্ম ১৯১০)॥

৫

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১) প্রায়-সমসাময়িক কালের মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী-নাটকের রীতি প্রবর্তন করিয়াছে।

প্রহসনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৯৩২) এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৬), 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৩৮), 'পরিহাস বিজল্পিতম্ (১৯৪০) ইত্যাদি।

সমসামযিক রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত

[১] স্বামী-স্ত্রী' (১৯২৭), 'রক্তকমল' (১৯২৯), 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০), 'ঝড়ের রাতে' (১৯৩১) ইত্যাদি। ইঁহার সম্পাদকতায় নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক পাক্ষিক পত্র 'নটরাজ' বাহির হইয়াছিল (১৯২৬)। ইহার দুই বৎসর আগে সাপ্তাহিক 'নাচঘর' বাহির হইয়াছিল।

[২] যেমন 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০), 'অশোক' (১৯৩৪) ইত্যাদি।

[৩] যেমন 'একাঙ্কিকা' (১৯৩১)।

[৪] 'অহিংসা' (১৯২৭), 'সত্যের সন্ধানে' (১৯২৮), 'প্রাণের দাবী' (১৯২৯), 'রাঙা রাখী' (১৯৩০), 'শক্তির মন্ত্র' (১৯৩৩), 'রীতিমত নাটক' (১৯৩৫ ; অভিনয়ে লেখক নামিয়াছিলেন শিশিরকুমারের সঙ্গে), 'আত্মাহুতি' (১৯৩৫), 'পি-ডবলিউ-ডি' (১৯৪০), 'হাউস ফুল' (১৯৪১), 'কণ্ট্রোলের শাড়ি' (১৯৪৫), 'লেডিজ ওনলি' (১৯৪৬), 'অসবর্ণা', 'চাঁদের কণা', 'প্রাণের দাবী', 'মন্দির প্রবেশ' ইত্যাদি। ইঁহার উপন্যাসও আছে। যেমন, 'পরের বৌ'।

বিজন ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯০৬) যে নাটক রচনা করিয়াছেন যেমন,—'নবান্ন' (১৯৪৪) ও 'জনপদ' (১৯৪৫)—তাহা নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে নূতন পথ দেখাইয়াছে।[১]

অন্যান্য নাট্যকাহিনী-লেখক—শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৬),[২] শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র রাহা (জন্ম ১৮৯৬),[৩] শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র,[৪] শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত বক্সী (জন্ম ১৯০১),[৫] শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,[৬] শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মজুমদার (জন্ম ১৮৯৯),[৭] শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯),[৮] শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু (জন্ম ১৯০৮)[৯] ইত্যাদি॥

১ শ্রীযুক্ত তুলসীদাস লাহিড়ীর 'মায়ের দাবী' (১৯৪১) ইংরেজী সিনেমা চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত উল্লেখযোগ্য রচনা। পরবর্তী কালে ইঁহার 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭) ও 'ছেঁড়া তার' (১৯৫২) বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে।

২ 'অহল্যাবাই' (১৯১৪), 'তান্তিয়া মহারাজ' (১৯১৬), 'জাহাঙ্গীর' (১৯২৯), 'স্বয়ংসিদ্ধা' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

৩ 'সমুদ্রগুপ্ত' (১৩৩৬), 'মারাঠা মোগল' (১৩৪১), 'শিবার্জ্জুন' (১৩৪২), 'সর্বহারা' (১৩৪৩), 'মোগল মসনদ' (১৩৪৪), 'গোলকুণ্ডা' (১৩৫৬), 'যৌবনশ্রী' (১৩৫৯) ইত্যাদি। প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক।

৪ রঙ্গ নাট্য—'ঝঞ্ঝা' (১৩৪১), 'বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট' (১৩৫৬) ইত্যাদি।

৫ 'ডাক্তার মিস কুমুদ' (১৯৩৭), 'অভিসারিকা' (১৯৩৮), 'রিহার্সাল' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৬ 'তরঙ্গ' (১৩৪৩), 'গোলটেবিল' ইত্যাদি।

৭ 'শুভযাত্রা' (১৯৩৩) ও 'জন্মতিথি' (১৯৩৫)। দুইটি বইই নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

৮ 'বন্ধু' (১৯৩৭), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪১) ইত্যাদি।

৯ 'অতিথি' (১৯৩২), 'কলেবর' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গল্প-উপন্যাস

১

গল্প-উপন্যাসের বিষয়ে "বাস্তবতা" অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের সম্পর্কে দৃষ্টিপ্রসার ভারতীর আসরে প্রথম দেখা দিয়াছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী—ইত্যাদি লেখকের গল্পে এই প্রসার পরিলক্ষিত। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবির্ভূত হইয়া সাধারণ পাঠকের মনে এক-শ্রেণীর নিন্দিতা ও পতিতার প্রতি সমবেদনা জাগাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে উদীয়মান বাস্তবতার কাঁটাটুকু নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভারতীর আসর ভাঙ্গিয়া যাইবার আগেই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৮২), অধুনা প্রখ্যাত ব্যবহারাজীব, গল্প-উপন্যাসে নূতনতর বাস্তবতার পথ খুলিয়া দিলেন। ইঁহার প্রথম গল্প 'ঠানদিদি' নারায়ণে বাহির হইয়াছিল (১৯১৮)।[১] গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের প্রভাব আছে, এবং রচনা জোরালো। 'শুভা' (১৯২০) ও 'শাস্তি' (১৯২১) উপন্যাস দুইটিতে নরেশচন্দ্র সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আরও সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল 'পাপের ছাপ'এ (১৯২২)।[২] যৌন-ভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তির চিত্রণ বাঙ্গালা উপন্যাসে এই প্রথম। নরেশ-চন্দ্রের পিছনে যে ভাঙ্গিয়া-পড়া ভারতী দলের সমর্থন ছিল তাহা শুভার ও পাপের-ছাপের অকুণ্ঠ প্রশংসা হইতে বোঝা যায়।[৩]

নরেশচন্দ্র বহু সুপাঠ্য গল্প এবং উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি—'অগ্নি-সংস্কার' (১৯২০), 'দত্তগিন্নী', 'কাঁটার ফুল',[৪] 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'পিতাপুত্র', 'রাজগী', 'ব্যবধান', 'মিলন পূর্ণিমা', 'দূরের আলো' ইত্যাদি। কয়েকখানি নাটকও ইনি লিখিয়াছেন। যেমন, 'আনন্দ মন্দির' (১৯২৩), 'ঋষির মেয়ে' (১৯২৬) ও 'নারায়ণী' (১৯২৯)।

[১] 'দ্বিতীয় পক্ষ'এ সঙ্কলিত। [২] ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'মেঘনাদ' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কার্তিক ১৩২৭ হইতে। [৩] ভারতী জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ ১৩২৯ দ্রষ্টব্য।
[৪] ভারতী বৈশাখ ১৩৩০ হইতে।

আইনে ডক্টর উপাধিধারী নরেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের প্রধান অধ্যাপকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন, সে কথা আগে বলিয়াছি। ঢাকায় থাকিবার সময় নরেশচন্দ্র কয়েকটি কাহিনী লিখিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গে নিম্ন-শ্রেণীর লোকের জীবনচিত্র দিয়া। (পরে এই ধরণের অনেক গল্প শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন।) নরেশচন্দ্রের এই ধরণের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রূপের অভিশাপ' (১৯৩০)। এটি একটি মুসলমান তরুণীর জীবনের ব্যর্থতার জীবন্ত নিষ্ঠুর কাহিনী॥

২

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা' ছোটগল্পের শিল্পে একটা নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিল এবং খানিকটা নূতন ফ্যাশনেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও প্রভাব বিস্তার করিল রবীন্দ্রনাথের লিপিকার কথিকাগুলি। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের মাধ্যমে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশেষ আমদানি হ্যাভলক্ এলিস, ক্রাফ্ট্ এবিং প্রভৃতি পণ্ডিতের যৌন-মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থ পঠিত হইতে লাগিল।[১] এদিকে জীবনে জটিলতা বাড়িতেছে। নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির সঙ্গে তাহার সামাজিক জীবনে সঙ্কট উপস্থিত এবং পারিবারিক জীবনেও ফাট ধরিতেছে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র ক্রমশই ক্ষীণতর হইতেছে। তাই এখন নানাদিকে পলায়নী মনোবৃত্তির ঝোঁক। এখন কবি-ভাবনা বসন্ত-প্রকৃতির কল্পনা ছাড়িয়া পাশের গলির অতি সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের প্রতি ধাবিত। জীবনের আদর্শের স্থানে দেখা দিতে লাগিল সাধারণ লোকের নিতান্ত সাধারণ কামনা। অবশ্য এ ব্যাপার ধীরে ধীরে শুরু হইয়াছে এবং তাহাও ব্যাপক ভাবে নহে। পরবর্তী দশকে এ প্রবণতা স্পষ্টতর॥

[১] তুলনীয় সন্দীপের উক্তি, "আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলনরীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।"

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পের নায়কেরা বলেন, "কিন্তু তখন আমার মনোজগতে নীট্সে সোপেনহাওয়ারের যুগ, হ্যাভলক্ এলিস্ পড়ে মেজাজ গরম রয়েছে।" ('অরুণ' ১৯১৯)। "আমার যুবক বন্ধুরা জানেন আমি এক নীরব কবি, এক সাহিত্যরসজ্ঞ পণ্ডিত, খুব উপন্যাস পড়ি, শুধু অর্থাভাবে প্রতিভা বিকশিত হইল না। বেদ হইতে নীট্সে, কালিদাস হোমর হইতে শেলী গতিয়ে, বাৎস্যায়ন হইতে ফ্রয়েড, সবই আমি পড়িয়াছি। ...কিছুদিন পূর্ব্বেই বার্টনের একাধিক সহস্র রজনী তৃতীয়বার পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।" ('ভূতের গল্প' ১৯২১)।

৩

দুইজন অতরুণ লেখক এইসময়ে দেখা দিলেন সরস গল্পরচনায় পরিপূর্ণ দক্ষতার সহিত, ভারতবর্ষ পত্রিকায়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন ও ব্যবহার লইয়া সরল ও সরস উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। ইনি অল্প বয়সেই কলম ধরিয়াছিলেন তবে তাহা নিয়মিত ভাবে নয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' প্রবন্ধের সঙ্গে ইঁহারও একটি চিঠি-প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল (১৮৮৫)। তাহার অনেককাল পরে ইঁহার দ্বিতীয় রচনা ও প্রথম ছাপা বইয়ের সাক্ষাৎ পাই 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫), পদ্যে লেখা। লেখকের নাম ছিল "নন্দী শর্ম্মা"। নামেই বোঝা যায় যে ইহাতে কাশীর ও কাশীবাসীর পরিচয় আছে।

ইহার পরে দীর্ঘকাল তাঁহার কোন রচনার সন্ধান নাই। অবশেষে সরকারি চাকরি হইতে পেনসন লইয়া কেদারনাথ লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। উত্তরা ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁহার গল্প ও উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল। তাহার পূর্ব হইতেই কাশী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'উত্তরা'র বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। অনেক বিষয়ে উত্তরা ছিল কল্লোলের সহযোগী। সেই সূত্রে কল্লোলেও কেদারনাথের গল্প বাহির হইয়াছিল। কেদারনাথের উপন্যাসে সরস সংলাপের অতিরিক্ত বেশি কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার ছোটগল্প সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। 'আমরা কি ও কে' (১৯২৭), 'কবলুতি' (১৯২৮), 'পাথেয়' (১৯৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২) ইত্যাদির গল্পগুলি উপভোগ্য। উপন্যাসের মধ্যে 'শেষ খেয়া' (১৯২৫), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩২) ও 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫) উল্লেখযোগ্য। 'চীনযাত্রী' (১৯২৫) ভ্রমণ-কাহিনী।

কর্মসূত্রে কেদারনাথ উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। এই দেশাভিজ্ঞতা তাঁহার অঙ্কিত প্রবাসী বাঙ্গালী চরিত্রে সমধিক পরিস্ফুট। কাশীতে তিনি বেশিদিন কাটাইয়াছিলেন তাই কাশীর দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। তিনি আদিতে কলিকাতার উত্তর অঞ্চলের লোক। এই অঞ্চলের কথার ভঙ্গি (*patois*) তঁহার রচনারীতিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে॥

৪

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (জন্ম ১৮৮০) বিজ্ঞানে পণ্ডিত, এবং কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক

শিল্পশালার পরিচালক। পিতা চন্দ্রশেখর বসু বিগত শতাব্দে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বসুর পুত্রেরা সবাই কৃতী। জ্যেষ্ঠ শশিশেখর সাংবাদিক রূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংরেজী লেখায় ইঁহার দক্ষতা ছিল। কনিষ্ঠ গিরীন্দ্রশেখর এদেশে মনস্তত্ত্বের গবেষণার পথপ্রদর্শক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহারও বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতা ছিল।

লেখকরূপে রাজশেখর বাবুর প্রথম আবির্ভাব ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় (১৯২২) 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প লইয়া। এই সরস ব্যঙ্গ গল্পটি প্রকাশিত হইবামাত্রই সর্ববিধ পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল। তাহার পর এই ধরণের গল্প রাজশেখরবাবু অনেক লিখিয়াছেন এবং এখনও লিখিতেছেন। সে-সব রচনার ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রথম রচনার গৌরব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ-রকম কৃতিত্ব খুব কম লেখক দেখাইতে পারিয়াছেন। অধিকাংশ লেখকই প্রথম রচনার উজ্জ্বলতা পরবর্তী রচনাতে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। রাজশেখরবাবুর গল্পগ্রন্থ—'গড্ডলিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৭), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

গোড়া হইতেই একটি বিশেষ অলঙ্কার রাজশেখরবাবুর গল্পের রস গাঢ়তর করিয়াছিল। তাহা হইতেছে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের রেখাচিত্র। আসলে যতীন্দ্রকুমারের (এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) ব্যঙ্গচিত্র হইতেই প্রধানত রাজশেখর বাবু তাঁহার সরস ব্যঙ্গ-গল্প রচনার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রকুমারের ব্যঙ্গচিত্র 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে বাহির হইত। তাহা ছাড়া রাজশেখরবাবুর রচনার মূলে আরও দুইজনের কমবেশি প্রভাব আছে। কম প্রভাব প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, বেশি প্রভাব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। বিরিঞ্চি বাবার সঙ্গে প্রভাতকুমারের নবীন-সন্ন্যাসীর এক সন্ন্যাসীর বাহ্যিক মিল নাই কিন্তু একটি চরিত্র অপর চরিত্রকে অবশ্যই স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায় 'দক্ষিণরায়'এর মত গল্পে। এ গল্পের সঙ্গে ডমরু-চরিতের ছালছাড়ানো বাঘের গল্পের মূলগত মিল আছে।

রাজশেখরবাবুর ষ্টাইল সহজ সরল স্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী। চরিত্রসৃষ্টির দ্বারাই প্রধানত সরসতার সৃষ্টি। কথায় মন ভোলাইবার প্রয়াস নাই। প্রবন্ধ-রচনাতেও রাজশেখরবাবুর অনন্যতা পরিস্ফুট। এ অনন্যতা শুধু রচনারীতিতে

নয় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় ও স্বচ্ছতায়ও। লেখকের মিতভাষিতা প্রবন্ধগুলির আকর্ষণ বাড়াইয়াছে। ইঁহার প্রবন্ধ-গ্রন্থ—'লঘুগুরু' (১৯৩৯) ও 'বিচিন্তা' (১৯৫৫)। রাজশেখরবাবু বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছেন, মেঘদূতেরও অনুবাদ করিয়াছেন। এগুলিও পাঠকের অকুণ্ঠ সমাদর পাইয়াছে।

এই সঙ্গে চারুচন্দ্র দত্তের (১৮৭৬-১৯৫২) প্রসঙ্গ আসে। চারুচন্দ্র আই-সি-এস ছিলেন। অবসর লইয়া অনেকদিন পরে তবে লিখিতে আরম্ভ করেন। 'পরিচয়'এর ইনি বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। সেই পত্রিকাতেই ইঁহার উপভোগ্য আত্মকাহিনী 'পুরানো কথা' (১৩৪৩) প্রথম বাহির হইয়াছিল। চারুচন্দ্রের রচনারীতি তাঁহার নিজস্ব—সরল, সহজ, সরস ও সংযত। প্রধানতঃ লেখার গুণেই ইঁহার গল্প ও অন্যান্য রচনা সুখপাঠ্য। গল্পের বই—'কৃষ্ণরাও' (১৯৩৩), 'দুনিয়াদারী' (১৯৩৪) ও 'দেবারু'। 'মায়া'য় আছে একটি বড় গল্প ও একটি নাট্যরচনা॥

তৃতীয় দশক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা প্রায় আনুষ্ঠানিক ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে "আধুনিকতা"র পত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। গোকুলচন্দ্র আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন। দৃশ্যচিত্র আঁকায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তবে কোর্স্ শেষ করেন নাই। নিউ মার্কেটে তাঁহার ফুলের ষ্টল ছিল।[১] এই যে সৌন্দর্য-শিক্ষা ও সৌন্দর্য-প্রিয়তা ইহা তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৩৩০ সালে গোকুলচন্দ্র দীনেশরঞ্জন দাশের (১৮৮৮-১৯৪১) সহযোগী হইয়া 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করেন। সাত বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি "আধুনিক" সাহিত্যের ঘাঁটি আগলাইয়া ছিল। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পত্রিকার ভার দীনেশরঞ্জনের উপরেই পড়ে। কল্লোলের অগ্রদূত রূপে ১৯২২ সালে 'ঝড়ের দোলা' বাহির হয়। প্রকাশক "Four Arts Club", অর্থাৎ ঝড়ের-দোলার চারিটি গল্পের লেখক চারিজন—গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু।

গোকুলচন্দ্রের প্রথম রচনা ছোট ছোট গল্প বা কথিকা। এগুলি প্রথমে প্রবাসী[২],

[১] গোকুলচন্দ্রের ও কল্লোলের দলের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরীর প্রবন্ধ 'কল্লোলের দিন' (শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' প্রথম বর্ষ) মূল্যবান্ ও উপাদেয় উপাদান যোগাইয়াছে।

[২] যেমন 'শিশির' (আষাঢ় ১৩২৬), 'বাতায়ন' (মাঘ ঐ), 'দুই সন্ধ্যা' (চৈত্র ঐ)।

ভারতী, ভারতবর্ষ ও নব্যভারত প্রভৃতিতে বাহির হইয়াছিল, পরে 'রূপরেখা'য় (১৯২২) সঙ্কলিত হয়। ছোটগল্প লেখায় গোকুলচন্দ্রের ছিল অনায়াস দক্ষতা। বর্ণনায় একটু স্বপ্নালসতা আছে, কিন্তু সে সময়ের গুণে বা দোষে। কিন্তু রচনার মধ্যে জড়তা নাই, অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। গোকুলবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার ছোটগল্পগুলি (সব নহে) সঙ্কলিত হইয়াছে 'মায়া-মুকুল' নামে (১৯২৭)। গোকুলচন্দ্র কবি-মন লইয়া গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

গোকুলচন্দ্রের মুখ্য রচনা 'পথিক' (১৯২৫)।[১] উপন্যাসটিতে পথিক-লেখকের দৃষ্টিতে যেন জীবনের চলচ্চিত্র ধরা পড়িয়াছে। সাধারণ উপন্যাসের সংহতি নাই, কিন্তু ভূমিকাগুলির উজ্জ্বলতায় এবং সংসারচিত্রের বাস্তবতায় কাহিনীর সে ত্রুটি ধরাই পড়ে না। 'পথিক' "আধুনিক" উপন্যাসে পথিকৃৎ।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে ইণ্ডো-ব্রিটিশ কোম্পানি ও পরে (১৯২২) শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে দমদমায় তাজমহল ফিল্‌ম্ কোম্পানি খাড়া হয়। তাহার পর বেহালায় ফটো প্লে সিণ্ডিকেট নামে তৃতীয় কোম্পানি গড়া হয়। এই কোম্পানি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে 'বাঁদীর প্রাণ' নামে যে ঐতিহাসিক ছবি করা হয় তাহাতে গোকুলচন্দ্র নাগ রাহু সেনের ভূমিকা লইয়াছিলেন।

কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশও (১৮৮৮-১৯৪১) ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি গল্প ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।[২] পাঁচটি গল্প লইয়া ইহার 'মাটির নেশা' (১৯১৮) সঙ্কলিত। বইটি "পথিক বন্ধু" গোকুলচন্দ্রকে উপহৃত। 'ভূঁই চাঁপা'য় (১৯২৫) সাতটি গল্প আছে। 'উতঙ্ক' (১৯২১) নাটক ছেলেদের জন্য। ইঁহার 'দীপক' উপন্যাস কল্লোলে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (১৩৩৪), গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই। 'রাতের মিছিল'ও কল্লোলে (১৩৩৬) বাহির হইয়াছিল। তবে ইহা শেষ হয় নাই।

দীনেশরঞ্জনেরও নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। কল্লোল সম্পাদনার শেষের দিকে দীনেশরঞ্জন সাপ্তাহিক 'বিজলী'রও সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সে কাজ ছাড়িয়া দেন এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানীতে সিনারিও লিখিতে থাকেন। এই কোম্পানির প্রথম ছবি 'ক্লেমস্

[১] কল্লোলে (প্রথম সংখ্যা হইতে) প্রথমপ্রকাশিত।

[২] 'রামগতি' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০), 'পার্ব্বতী (ফাল্গুন ঐ)।

অব দি ফ্লেশ্'এ একটি ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্লোল উঠিয়া গেলে (১৯৩০) তিনি সিনেমার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন ॥

৬

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর (জন্ম ১৮৯৭) গল্পে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্ তরুণের লোভনীয় কলিকাতার ধনী ফ্যাশনেব্ল suburbia সমাজের রোমান্টিক কল্পনা প্রতিভাত। ইঁহার 'রমলা' (১৩৩০)[১] নবীন রোমান্টিক লেখকদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই বইটির প্রভাব কোন কোন "আধুনিক" লেখকের রচনায় পড়িয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর গল্পে প্রথম হইতেই তাঁহার নিজস্বতার পরিচয় প্রকট।[২] লেখক যে অচির-ভবিষ্যতে বাস্তবপন্থা ছাড়িয়া রোমান্সপন্থার পথিক হইবেন তাহাও বোঝা যায়।

> বীণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বল্লে—বল্লে আমাকে তার চাই। আমি বল্লুম, "বীণা, মুস্কিলে ফেললে।" এক তরুণী তার যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপতে চায়,—আমি বীর, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম। আমার কথা শুনে সে এক শ্যাওলা-ঘেরা পাথরে বসে পড়লো।[৩]

মুমূর্ষু নায়কনায়িকা লইয়া ইঁহার কয়েকটি গল্পের প্যাথলজিকাল বা মৃত্যুশঙ্কিত পরিবেশ রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'মাসি' এই-ধরণের গল্পের মূল আদর্শ। মণীন্দ্রবাবুর মর্বিড গল্প অনেকেই অনুসরণ করিয়াছেন; গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুই মণীন্দ্রবাবুর এই ধরণের গল্পকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিল। দুই-একটি গল্পে[৪] ভৌতিক বা অতিলৌকিক পরিবেশ চমৎকার জমিয়াছে।

ইঁহার গল্পের সঙ্কলন হইতেছে 'মায়াপুরী (১৯২৩), 'রক্তকমল' (১৯২৪), 'সোনার হরিণ' (১৯২৪), 'কল্পলতা' (১৯৩৫), 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট উপন্যাস 'জীবনায়ন'এ (১৯৩৬) যৌবনোন্মেষের মনোবৃত্তি অত্যন্ত নিপুণতা ও অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্লিষ্ট এবং বিবৃত। অপর উপন্যাস— 'অজয়কুমার' (১৯৩২) ও 'সহযাত্রিণী' (১৯৪১)।

মণীন্দ্রলালবাবুর গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা সুন্দরী ও শিক্ষিত এবং ধীর, ছেলে-মানুষ ও অপাপবিদ্ধ। নায়কেরাও স্মার্ট, শহরিয়া, ড্রইংরুম-বিলাসী, দার্জিলিং-পুরী-

১ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী (১৩২৯)।

২ প্রথম গল্পগুলিও প্রধানত প্রবাসীতে (১৩২৭-৩০) প্রথম বাহির হইয়াছিল।

৩ 'অরুণ'। ৪ যেমন 'ভূতের গল্প', প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮; 'রেবতী' নামে সংক্ষিপ্তভাবে 'রক্তকমল'এ সঙ্কলিত।

নিবাসী ; কন্টিনেন্টাল উপন্যাস এবং ফারসী কবিতা দুইই তাহাদের উপভোগের বস্তু ; তাহারা পিয়ানোয় বীটোফেনের মুনলাইট সোনাটা অনর্গল বাজাইতে পারে, চমৎকার বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারে, ছবি আঁকাও বেশ আসে ; তাহারা অত্যন্ত ভাববিলাসী ও প্রণয়কাতর। মোটকথা তাহা মূর্তিমান্ কলেজ-বয় রোমান্স।

লেখায় নৈপুণ্যে ও চরিত্রাঙ্কণে সহৃদয়তায় মণীন্দ্রবাবুর গল্প-উপন্যাস বেশী সুখপাঠ্য ॥

৭

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর রচনার সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) রচনার স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্য আছে। দুইজনেই সমান ভাবুক এবং অন্তর্মুখী। দুইজনের গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রী যেন একই জগতের জীব। তফাৎ এই, মণীন্দ্রবাবুর পাত্রপাত্রী শহরবাসী ধনী ও সংস্কৃতিমান্, আর বিভূতিবাবুর পাত্রপাত্রী পল্লীবাসী দরিদ্র ও সাধারণ শিক্ষা (বা অশিক্ষা) প্রাপ্ত। মণীন্দ্রবাবুর নায়কের ঠিক বিপরীত বিভূতিবাবুর নায়কেরা। তাহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লাজুক ছেলে, গাঁয়ের ইস্কুলেই তাহাদের শিক্ষা ; পোড়ো ভিটার জঙ্গলে ঢাকা কুটীর-বাসী সর্বংসহ নারীহৃদয়ের ব্যাকুলতা তাহাদের হৃদয়কে টানে। তবে দুই জনেই উদ্‌ভিদ্‌ভক্ত। মণীন্দ্রলালবাবুর রচনায় সহরের ভিলায় সযত্নরোপিত মূল্যবান্ বিলাতি লতাগুল্ম মৌসুমী ফুলের বাহার, আর বিভূতিবাবুর রচনায় পাড়াগাঁয়ের পল্লীপথের বাঁকে নাম-না-জানা গাছ-আগাছার ভিড়। মণীন্দ্রলালের নায়ক ভাবে,

> তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বিগোনিয়া ফুলের মত রাঙা মুখ ঘেরিয়া কালো কেশের রাশি ; তাহার উপর ফিউসিয়া ফুলগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে পিটুনিয়া ফুলের রং-এর এক জামার ওপর এষ্টার ফুলের রং-এর একখানি সাড়ি। মোজাবিহীন পায়ে ক্যাক্‌টাসের মত লাল ভেলভেটের চটিজুতো।[১]

বিভূতিভূষণের নায়ক দেখে,

> পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু কালকাসন্দা ধুতুরা কুঁচকাঁটা আর ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ঝোপ-মত তৈরী করেছে। শীতল হেমন্ত-অপরাহ্ণের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে। এমন একটা মিষ্ট নির্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে

১ 'দার্জ্জিলিং'এ, প্রথমপ্রকাশ ভারতবর্ষ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮। সোনার-হরিণে সঙ্কলিত।

উঠেছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চলপ্রান্তের মত।[১]

ছোটগল্পগুলিতে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের পূর্ণ-পরিচয় নিহিত।[২] মণীন্দ্রলালবাবুর প্রভাব সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' সার্থক রচনা। 'পুঁই-মাচা' গল্পটিতে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস পথের-পাঁচালীর বীজ নিহিত। এই গল্পে এবং পথের-পাঁচালীতে বিভূতিবাবুর রসকল্পনার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার ধ্বংসপথবাহী পল্লীজীবনের অরণ্যাক্রান্ত পরিবেশে দারিদ্রজর্জর মুমূর্ষু নরনারীর ক্রমবর্ধমান অভিভব। হিংস্র আরণ্য লতাগুল্মের বেড়াজালে পড়িয়া মানব জীবন যেন শুখাইয়া আসিতেছে। বোধ হয় যেন জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো ভিটার নিঃসঙ্গ বিভীষিকা মরণের ছায়া ফেলিয়া শনৈঃশনৈ অগ্রসর হইতেছে বাকি বসতিগুলি দখল করিতে। এই ধ্বংসপথযাত্রার ছবি বিভূতিবাবুর রচনায় রোমান্টিক দূরত্বের প্রজেক্টরের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অভিজ্ঞতাবদ্ধ হইলেও বাস্তব নয়, রোমান্টিক। সে দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানবজীবনের খেলাঘর অথবা পটভূমিকা নয়, মানবজীবনই প্রকৃতির খেলাঘর অথবা পটভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী'র মত বৃক্ষলতাগুল্মের ছায়াঢাকা-কুটীরবাসিনী পল্লী-বধূ —"নিখুঁত মেয়েলি ধরণের মেয়ে"—বিভূতিবাবুর কবিদৃষ্টি অধিকার করিয়া ছিল; "আমার ভারি ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাটচে···—পাড়া-গাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।"[৩]

'পথের-পাঁচালী' (১৯২৯)[৪] লেখকের বাল্যস্মৃতিমূলক উপন্যাস-চিত্র। বিভূতিবাবু প্রগাঢ় অনুভূতি ও ভাবুকতা বইটির আখ্যায়িকাগুলিকে রমণীয় করিয়াছে। 'অপরাজিত' (১৯৩২)[৫] পথের-পাঁচালীরই অনুবৃত্তি। ইহাতে

১ 'উপেক্ষিতা' (মেঘ-মল্লার)।

২ 'উপেক্ষিতা' (প্রবাসী মাঘ ১৩২৮), 'উমারাণী' (শ্রাবণ ১৩২৯), 'মৌরীফুল' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০) ও 'পুঁই মাচা' (মাঘ ১৩৩১)। 'নব-বৃন্দাবন'এ (মেঘ-মল্লার) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে।

৩ যাত্রাবদল (১৩৪১)।

৪ প্রথমপ্রকাশ বিচিত্রা ১৩৩৫-৩৬।

৫ প্রথমপ্রকাশ প্রবাসী ১৩৩৬-৩৮।

কৈশোর-যৌবনের মধ্য দিয়া নায়কের ভাবজীবনের অনুসরণ চলিয়াছে। বিভূতিভূষণের খ্যাতি পথের-পাঁচালীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরে ইনি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেগুলির রচনা অনাড়ম্বর ও সুপাঠ্য, তবে বাঙ্গালা উপন্যাসের কোন বিশেষ পরিণতির বা নূতন রূপের ইঙ্গিত তাহাতে নাই।

বিভূতিভূষণ আরও অনেক বই লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইগুলি—'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৩৪২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'বিপিনের সংসার' (১৩৪৮), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'দেবযান' (১৩৫১), 'অনুবর্ত্তন' (১৩৫৩), 'ইছামতী' (১৩৫৬) ইত্যাদি। গল্পের বই—'মেঘমল্লার' (১৩৩৮), 'মৌরী ফুল' (১৩৩৯), 'যাত্রা বদল' (১৩৪১), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৩৪৪), 'কিন্নর দল' (১৩৪৫), 'বিধু মাষ্টার' (১৩৫২), 'অসাধারণ' (১৩৫৩) ইত্যাদি। 'তৃণাঙ্কুর' (১৩৫০) আত্মজীবনীমূলক।

বিভূতিভূষণ পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস তাঁহার কোন কোন রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে॥

৮

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০০) গোড়ার দিকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ ভাবুক রোমান্টিক লেখকদের অনুসরণে গল্প লিখিতেন। এই লেখাগুলি প্রধানত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাতে বাহির হইয়াছিল সতীর্থ কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সঙ্গে (১৩২৮)।[১] এই গল্পগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল 'আমের মঞ্জরি'তে (১৩৩০ ?)। আমের-মঞ্জরির দুইটি গল্পে মুসলমান ঘরের ছবি আছে। এটুকুই নূতনত্ব। অন্যথা কাঁচা লেখা। পরিপক্কতা লইয়া শৈলজানন্দের গল্প বাহির হইল ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে, 'রেজিং রিপোর্ট'।[২] রাণীগঞ্জ-উখড়া-ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাখাদের সাঁওতাল-বাউড়ী কুলি-কামিনদের অজ্ঞাত জীবন লইয়া শৈলজানন্দ যে গল্পস্রোত বহাইয়া দিয়া সাহিত্যজগৎ প্রায় চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত এই গল্পে এবং 'বলিদান'এ।[৩] অনেকগুলি গল্প বাহির হইল কল্লোলে (১৩৩০-৩১) ও কালি-কলমে (১৩৩৩-৩৪)।[৪] প্রবাসীতে ও কল্লোলে গল্প বাহির হইবার সময় লেখক

[১] একটি—'ভিখারী (কথিকা)'—তুর্গেনিয়েভের রচনার অনুবাদ (মাঘ)।

[২] 'বিচার' নামে 'দিন-মজুর'এ সঙ্কলিত (১৯৩২)।

[৩] প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩০।

[৪] প্রথম বছরে শৈলজানন্দ কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। আরও দুই জন সম্পাদক ছিলেন, শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসু ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র।

নামের "আনন্দ" অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়। তখনকার দিনে প্রবাসীতে ও অন্য ভালো সাময়িক-পত্রে নারীর রচনা প্রকাশ করা সহজসাধ্য ছিল। লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিবার পর "শৈলজা" নাম লইয়া লেখককে নিশ্চয়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং আবার "আনন্দ" সংযোগ হইল (১৩৩১)।

বড় গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে প্রথম রচনা হইতেছে 'মাটির ঘর' (১৩৩১)। এটি 'বাঙ্গালী ভাইয়া' নামে 'সংহতি' পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল (১৩৩০)। রচনাকাল ১৩২৬ সাল। বইটির মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃতি আছে। কাহিনীতে জাতীয় সংগঠন চেষ্টার সমর্থন আছে। 'হাসি' ও 'লক্ষ্মী' ১৩৩০ সালের মাঝামাঝি কল্লোল পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীর কাহিনীতে লেখকের অভিজ্ঞতা উপাদান যোগাইয়াছে। কিছু কিছু কবিতা উদ্ধৃতি আছে, তাহার "কতক্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এবং কতক্ আমার বাল্যসখা প্রিয়তম কাজী নজরুল ইস্‌লামের।" পরে শৈলজানন্দ আরও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেগুলি আসলে বড় গল্প, এবং সেগুলিতে লেখকের শিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয় নাই। ছোটগল্পগুলিতেই শৈলজানন্দের নিজস্ব পরিচয় নিহিত।

শৈলজানন্দের গল্প "বাস্তব" (রিয়ালিষ্টিক) বলিতে যাহা বুঝায় শুধু তাহাই নয়, "বাস্তবিক"ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া নিতান্ত সাধারণ মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। শৈলজানন্দের গল্পে কাহিনী আপনার বেগেই পথ কাটিয়া চলিয়াছে। লেখক সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছেন, কখনও তিনি নিজের হৃদয়াংশ অথবা বুদ্ধি যোগ করিয়া গল্পে গভীরতা অথবা দীপ্তি আনিতে চেষ্টা করেন নাই। স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে "লোক্যাল কালার", তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন।

শৈলজানন্দের বড় গল্প (বা উপন্যাস) সাধারণ পরিচিত সংসার লইয়াই লেখা। ছোটগল্পগুলিও দুই ভাগে পড়ে, সাঁওতালি ও সাধারণ। সাঁওতালি গল্পগুলির দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়-পরিধি প্রসারিত হইল।

কয়লাকুঠী-গল্পধারার প্রথম দিকের রচনা 'নারীর মন'[১] আর শেষ দিকের রচনা 'জোহানের বিহা'[২] এই-ধরণের গল্পের দুইটি টাইপ ধরা যাইতে পারে। নারীর-মনে ভালোবাসার অপমান, প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতা, ভগিনীর সপত্নীভাব, নারীর স্বাভাবিক অভিমান,—নারীচিত্তের মৌলিক বাম্য ও বক্রতা সমস্ত ছাপাইয়া জয়ী হইয়াছে উৎসারিত হইয়াছে তাহার পাথর-চাপা ভগিনীস্নেহ। বোন টুর্‌নী ভুলির স্বামী পীরু-মাঝিকে ভুলাইয়াছে। বাধা দিতে গিয়া ভুলি স্বামীর কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছে, মারও খাইয়াছে। ভোলাকে সে পীরুর বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে, কিন্তু পীরুর কাছে ভোলার পরাজয়ে তাহার দুঃখ হয় নাই। এমন সময় তাহার কানে গেল যে আড়কাটি টুর্‌নীকে খুঁজিতেছে।

> ভুলি তাড়াতাড়ি আড়্‌কাঠির নিকট গিয়া বলিল,—কাথে খুঁজ্‌ছিস্ হে ? লোকটা তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল,—টুর্‌নী মেঝেন্‌কে। কোথায় আছে বল্‌তে পারিস্ ?
>
> ভুলি তাহার হাত ধরিয়া আর একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল,—টুর্‌নী আমারই বোন্, সে যাবেক্ নাই। চল্ আমি যাব।
>
> লোকটা বলিল,—বাঃ তাকে যে পঁচিশ টাকা দিয়েছি।
> —আমাকেও ত দিথিস্ ? আমি লিব নাই, চল্।...
>
> ট্রেনখানা আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে! সে ত আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।
>
> ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুর্‌নী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।
>
> ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল,—কাঁদছিস্ কেনে ?
> ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দ্যুৎ কাঁদ্‌ব কেনে লো ?

জোহানের-বিহার সুখী নারীর-মনের ভুলির মত নয়। খোঁড়া জোহানের সঙ্গে তাহার বিবাহ সামাজিক প্রয়োজনে। বিবাহের মর্যাদা সে রাখিয়া চলে নাই। জোহানের অপমৃত্যুতে তাহার শোক সাধারণ যুক্তিসঙ্গত না হইলেও

[১] প্রথমপ্রকাশ কল্লোল জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০; 'বিজয়িনী' নামে দিন-মজুরে সঙ্কলিত।

[২] প্রথমপ্রকাশ কালি-কলম বৈশাখ ১৩৩৩; 'সাঁওতালি' নামে পুস্তিকাকারে (১৯৩১); 'বিবাহ' নামে সংক্ষিপ্ত আকারে দিন-মজুরে। সংক্ষেপ করায় গল্পটি উন্নত হয় নাই। পাত্রপাত্রীর নাম-পরিবর্তনও সুসঙ্গত হয় নাই। বর্তমান আলোচনায় গল্পটির আদি রূপই গৃহীত হইয়াছে।

তাহার নারীপ্রকৃতিকে, তাহার নিগূঢ় মানবতাকে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

সাঁওতালি গল্পগুলিই শৈলজানন্দবাবুকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়াছিল। তাহার ফল খুব ভালো হয় নাই। অন্য গল্পগুলির প্রায় উপেক্ষিত হইয়াছে।

'অতসী'র প্রথম গল্পটি[১] প্রেমেন্দ্র বাবুর 'পাঁক' ও অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'র সমকালীন ও সমপর্যায়ের অথচ শিল্পরূপে অনেকটাই পৃথক। শৈলজানন্দ বাবুর গল্পটির সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব অপর দুইটি রচনায় নাই। 'নারীমেধ'এর (১৩৩৫) গল্প তিনটিতে পরিচিত সমাজ-সংসারের পাথর-চাপা বঞ্চিত নারীহৃদয়ের মর্মান্তিক শোচনীয়তা পরিপূর্ণ বাস্তবতায় ও নিরতিশয় তীব্রতায় প্রকাশিত। প্রথম গল্প 'নারীমেধ'এর অনতিশয়িত নিষ্ঠুর বাস্তবিকতা আমাদের সাহিত্যে অভিনব। দ্বিতীয় গল্প 'যখের ধন' বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে একটি।

আর একটি বিশিষ্ট গল্প 'বধূবরণ'।[২] কাহিনীর পরিকল্পনায় এবং নারীবিদ্বেষী ননীমাধবের মনোবৃত্তির অনুসরণে লেখকের অভিজ্ঞতার সচেতনতার ও সহৃদয়তার পরিচয় নিহিত। তাহার স্বার্থপর খামখেয়াল ও নিষ্ঠুরতার পিছনে যে নিগূঢ় ও নিরুদ্ধ মানবিকতা ক্রিয়াশীল ছিল তাহা অনাবৃত হইয়াছে উপসংহারে। গৌরীর অনুক্ত ট্রাজেডি গল্পের শেষ দৃশ্যে নির্মমভাবে অকস্মাৎ প্রকাশিত।

> স্বল্পালোকিত সেই নির্জন কক্ষের বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া ননীমাধব একবার ষ্টেশনের দিকে তাকাইল। কেরোসিন-বাতির একটুখানি আলো গৌরীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সের উপর সবুজ রঙের শালখানি গায়ে দিয়া তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া। স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল একাগ্র দৃষ্টি তাহার তখনও নিবদ্ধ।
>
> এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরীর—এবং শুধু এই কিশোরীর কেন, সমগ্র নারীজাতির নিষ্ঠা ও ভালবাসার উপর আস্থা তাহার অনেকদিন হইতেই নাই। আজও তাই সে তাহার দৈনন্দিন ঘটনার মতই অত্যন্ত সহজভাবে গৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নীরবে গহনার বাক্সটি কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এমনি মজা, মুখখানি তাহার চোখের সুমুখ হইতে যতই ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, ননীমাধবও জানালার বাহিরে তত বেশি করিয়া তাহার গলা বাহির করিয়া দেয়।
>
> কিন্তু সে আর কতক্ষণ!
>
> গাড়ীর বেগ ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। ননীমাধবের চোখের সুমুখ হইতে গৌরীর সেই একাগ্র উন্মুখ দুটি চক্ষু অদৃশ্য হইল, মুখখানি অদৃশ্য হইল, দেহ অদৃশ্য হইল,

১ 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' (প্রবাসী কার্তিক ১৩৩১)।

২ 'বধূবরণ'এ সঙ্কলিত।

সবুজরঙের শাল, শালের নীচে গৌরীর দুটি অলক্তকরঞ্জিত সুকোমল শুভ্র পা, টিনের তোরঙ্গ, কেরোসিনের আলো—দেখিতে দেখিতে পশ্চাতের অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

শৈলজানন্দের উপন্যাস বা বড়-গল্পগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও সৌষ্ঠব নাই। তবে যেগুলি রোমান্স নহে সংসার অথবা সমাজ-চিত্র সেগুলি উপভোগ্য। এই-ধরণের বোধ করি শ্রেষ্ঠ রচনা 'ষোল আনা'।[১] ইহাতে উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের জীবনচিত্র নিজস্ব পরিবেশে ও নিখুঁত সংলাপে লেখকের অভিজ্ঞা-সহৃদয়তা-সংযমের আলোকপাতে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। কাহিনীক্ষীণ গল্পটিতে যেন প্রতিদিনের গ্রাম্যজীবনের শোভাযাত্রা চলিয়াছে।

শৈলজানন্দবাবুর গ্রন্থসংখ্যা পৌনে শতাবধি। প্রধান প্রধান গল্প-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। বড় গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে এইগুলির নাম করিতে পারি—'ঝড়ো হাওয়া' (১৩৩০), 'রাঙা শাড়ী', 'বাংলার মেয়ে' (১৩৩২), 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৩৩৩), 'জোয়ার ভাঁটা' (১৩৩৩), 'পূর্ণচ্ছেদ' (১৩৩৬), 'অনাহূত' (১৩৩৯), 'অনিবার্য্য' (১৩৩৯), 'নহ প্রণাম' (১৩৩৯), 'খরস্রোতা' (১৩৩৯), 'অপরাধী' (১৩৪০), 'অরুণোদয়' (১৩৪০), 'রূপবতী' (১৩৪০), 'গঙ্গা-যমুনা' (১৩৪০), 'আকাশ কুসুম' (১৩৪১), 'উদয়াস্ত' (১৩৪১), 'হোমানল' (১৩৪২), 'কাঁকনতলার মেয়ে' (১৩৪২), 'শুভদিন' (১৩৪২), 'বন্ধুপ্রিয়া' (১৩৪৫), 'শোভাযাত্রা' (১৩৪৬), 'বিজয়া' (১৩৪৯) ইত্যাদি ইত্যাদি॥

৯

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) শৈলজানন্দের মতই জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী, এবং ইঁহার গল্পেও প্রকৃতিকতাই[২] পরিস্ফুট। ভাবিকতা শৈলজানন্দের গল্পে কিছু আছে। জগদীশচন্দ্রের গল্পে তাহার মাত্রা খুবই কম, বড় গল্পে হয়ত একটু আধটু আছে। জগদীশচন্দ্রের ভাবিকতার প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার কবিতায়[৩] জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ-ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম

[১] প্রথমপ্রকাশ বিজলী, ফাল্গুন ১৩৩১-বৈশাখ ১৩৩২।

[২] রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজম্ বুঝাইতে এই দুইটি কথা রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যবহার করিয়াছিলেন (পরিচয় বৈশাখ ১৩৪০)।

[৩] কৈশোরে তিনি গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনুসরণে প্রেমের কবিতা লিখিতেন। কবিতা লেখা জগদীশচন্দ্র কখনও ছাড়েন নাই। 'অক্ষরা' (১৯৩২) তাঁহার কবিতার বই।

বিনোদিনীর প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা

(দীনেশরঞ্জন দাশ অঙ্কিত)

নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে,—ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক "আধুনিক" লেখকদের মত সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই, শৈলজানন্দের মত নির্লিপ্তভাবে ছবি আঁকিয়াই যান নাই, তিনি কিছুকে ও কাহাকে দায়ী না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ শক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন। শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে দলপতি নহেন। তাঁহার রচনায় "আধুনিক" সাহিত্যিকের ভীরুতা নাই, যাঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,

> এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দ একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই রিয়ল্। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটিই পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচকপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তাহলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরোয়া রীতি, অর্থাৎ কন্‌ভেন্‌শন্, নীচতাকেই কৌলীন্যের একমাত্র মর্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধারাস্তার আধুনিকতাগিরি।[১]

জগদীশচন্দ্রের প্রথম গল্প 'পেয়িং গেষ্ট' বাহির হয় বিজলীতে।[২] এ গল্পটি কাঁচা হাতের। তবে পরের গল্পটিতে দেখি হাত পাকিয়াছে। এটিও বিজলীতে প্রথমপ্রকাশিত।[৩] প্রথম বর্ষের কালি-কলমে (১৩৩৩) ইহার নয়টি গল্প বাহির হয়, তাহার মধ্যে দুইটি ইংরেজীর অনুসরণে। পরে কল্লোলে ও বঙ্গবাণীতে ইহার অনেকগুলি গল্প বাহির হইয়াছিল। নয়টি গল্প লইয়া বাহির হইল প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী' (পৌষ ১৩৩৪)। বইখানির আকৃতি সাধারণ গল্পের বইয়ের মত নয়, এবং গল্পগুলিতে যেরূপ রস পরিবেশিত হইল তাহাও অভিনব। সাধারণ সুস্থ মানুষের অবচেতনায়ও পাগলামির বীজ লুক্কায়িত থাকিতে পারে।

[১] পরিচয় বৈশাখ ১৩৪০ পৃ ৬২৪-৬২৫। [২] ২৯ ফাল্গুন ১৩৩১। ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'মির্জার স্বপ্নদর্শন' (অনুবাদ) ইহার প্রথম গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়।

[৩] 'পল্লী-শ্মশান' (২০ কার্তিক ১৩৩২)।

তাহা ঘটনার ও পারিপার্শ্বিকের চাপে কখনো কখনো চেতনার উপরতলাতে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার কর্মচিন্তার উপর বুদ্ধির ব্রেক কাজ করে না। এমনি মনোবিকৃতির (abnormality) কাহিনী জগদীশচন্দ্রের বিশিষ্ট গল্পগুলির অসাধারণ বিশেষত্ব। পরবর্তী গল্পগুলিতেও জগদীশচন্দ্রের শিল্পদক্ষতা অক্ষুণ্ণ আছে।

জগদীশচন্দ্রের বড় গল্প বা উপন্যাসের প্লট কতকটা উদ্দেশ্যমূলক, এবং বেশ উপন্যাসোচিত নয়। 'দুলালের দোলা'র (১৯৩১) ভূমিকায় লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

> উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই। "রোমন্থন" লেখাটিতে তিনটি ব্যক্তির এবং এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখান হইয়াছে। ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে উহা দেখাইতে হইয়াছে। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্‌ আর নাই থাক্‌, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।
>
> উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।

জগদীশচন্দ্রের অপর গল্পের বই—'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমতী' (১৯৩০) ইত্যাদি; বড়গল্প বা উপন্যাস—'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯), ইত্যাদি॥

১০

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প তাঁহার কবিতার মতই উগ্রতাবর্জিত এবং কমনীয়। ইঁহার রচনায় সেই কাব্যরসবাহী রোমান্টিক গল্পধারারই এক পরিণতি যাহা লিপিকার দ্বারা প্রভাবিত। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জিতিতে পারিতেছে না তাহাদের ব্যর্থতাকে প্রেমেন্দ্রবাবু দীপ্তিমান্‌ করিয়াছেন গল্পে, অথচ কোন আড়ম্বর বা ভাবুকতা নাই। ভাব গভীর এবং অচঞ্চল, ভাষা সহজ এবং ধীরগতি। প্রেমেন্দ্রবাবুর ছোটগল্পের মর্মকথা তাঁহার গল্পের বই 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০)[১] নামটিতে উহ্য এবং 'প্রথমা'র একটি কবিতায় অভিব্যক্ত।

[১] প্রথম বছরে (১৩৩৩) "বেনামী বন্দর" শীর্ষকে দুইটি গল্প বাহির হইয়াছিল, 'দিদিমণি' (বৈশাখ) ও 'শুঁটকি ও থুপি' (ভাদ্র)। লেখকের নাম ছিল "লেখ্‌রাজ সামন্ত"।

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রথম কথিকা ও গল্পগুলি ১৩৩০-১৩৩১ সালের প্রবাসীতে[১] ও বিজলীতে বাহির হইয়াছিল। কালি-কলমের প্রথম দুই বছরে প্রেমেন্দ্রবাবু অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক গল্প বাহির হইয়াছিল।

প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রথম কাহিনী 'পাঁক' (১৯২৬)[২] তাঁহাকে "আধুনিক" সাহিত্যিকদের উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া দিয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর হীন ও কুৎসিত সংসারযাত্রার চিত্রাবলী এই উপন্যাস। 'মিছিল' (১৯৩৩)[৩] নারীনির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও বাস্তব কাহিনী।

প্রেমেন্দ্রবাবুর গল্পের বই—'পঞ্চশর' (১৩৩৬), 'বেনামী বন্দর' (১৩৩৭), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৩৩৯), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২), 'অফুরন্ত' (১৩৪২) ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস 'বাঁকা লেখা' (১৩৩৪), 'উপনায়ন', 'আগামী কাল' (১৩৪১), 'প্রতিশোধ' (১৩৪৮) ইত্যাদি ॥

১১

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও (জন্ম ১৯০৩) গদ্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথিকার অনুকরণ করিয়া। তাঁহার এই ধরণের রচনা কয়েকটি ১৩৩০ সালের শেষের দিকে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গদ্যরচনা বাহুল্যে ইনি সমগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথম গদ্য রচনা নরওয়ের ঔপন্যাসিক হাম্‌সুনের 'প্যান'এর অনুবাদ (১৯৩০)। ইঁহার প্রথম মৌলিক গল্প 'বেদে'[৪] ও

১ 'শুধু কেরাণী' (প্রবাসী চৈত্র ১৩৩০), 'গোপন-চারিণী' (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩১), 'বাড়ী বদল' (বিজলী ৪ পৌষ ১৩৩১) ইত্যাদি।

২ প্রথম পর্ব বিজলীতে (১৮ বৈশাখ হইতে ১২ ভাদ্র ১৩৩২), দ্বিতীয় পর্ব কালি-কলমে (১৩৩৩) প্রথমপ্রকাশিত।

৩ প্রথমপ্রকাশ কল্লোলে (১৩৩৫-৩৬)।

৪ চতুর্থ বর্ষ কল্লোলে (১৩৩৩) প্রথমপ্রকাশিত, পুস্তকাকারে ১৩৩৫।

২০

এই বিদেশী লেখকের প্রভাবচিহ্নিত। অচিন্ত্যকুমারের লেখায় "আধুনিকতা" অত্যন্ত প্রবল এবং প্রায় কন্‌ভেন্‌শনের মত। গোড়ার দিকের রচনায় যৌন বিষয়ে যে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব দেখা যায় তাহা এই কন্‌ভেন্‌শনেরই দায়ে। এ বিষয়ে ইঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুও অনুৎসাহী ছিলেন না। অচিন্ত্যকুমারের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' (১৯৩১) ও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩৩) উপন্যাস দুইটি এবং বুদ্ধদেবের গল্পের বই 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে' (১৯৩২) অশ্লীলতার ইঙ্গিতবহ বলিয়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল (১৯৩৩)। "আধুনিক" সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনা অনুপেক্ষণীয় নয়। অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব শক্তিশালী লেখক, তাই সহজেই ইঁহারা সাহিত্যের এই শক্‌-ট্রিটমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অচিন্ত্যবাবুর প্রথম গল্পের বই 'টুটা-ফুটা'র (১৯২৮) গল্পগুলি চারি পাঁচ বছর আগে লেখা এবং কল্লোল প্রবাসী ও উত্তরা পত্রিকায় প্রথমপ্রকাশিত। দ্বিতীয় গল্পের বই 'ইতি'তে (১৯৩২) রচনায় কিছু পাক ধরিয়াছে। ছোটগল্পে ইঁহার যে দক্ষতা পরে প্রকাশিত তাহার পরিচয় ইহাতে আছে। পরবর্তী কালে অচিন্ত্যবাবু দুঃখবিলাসের মোহ ত্যাগ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন। হাকিমী কর্মসূত্রে ইঁহাকে বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে এবং অনেক পাঁচপাঁচি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় মিলিয়াছে। সেগুলিকে ইনি সার্থকভাবে গল্পে রূপ দিয়াছেন। ইঁহার অপর গল্পের বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অকাল বসন্ত' (১৩৩৯), 'অধিবাস' (১৩৩৯), 'ডবল ডেকার' (১৩৪৫), 'পলায়ন' (১৩৪৭), 'যতনবিবি' (১৩৫১), 'সারেঙ' (১৩৫৪), 'হাড়ি মুচি ডোম' (১৩৫৫) ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে এইগুলিও উল্লেখযোগ্য—'আকস্মিক' (১৯৩০)[১] 'কাকজ্যোৎস্না' (১৩৩৮), 'ইন্দ্রাণী' (১৩৪০), 'উর্ণনাভ' (১৩৪০), 'নবনীতা' (১৩৪৩) ইত্যাদি।

একদিক দিয়া অচিন্ত্যকুমার সহগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে একক। ইনি গোড়া থেকেই ভাষার দিকে অতিমাত্রায় নজর দিয়া আসিয়াছেন। তাহার ফলে অচিন্ত্যকুমারের ভাষা দুর্বল এবং কখনো কখনো উৎকট হইয়াছে। পাঠকের চিত্ত চমৎকৃত করিবার জন্য অচিন্ত্যকুমার যেন নানা উপায় ধরিয়াছেন। কবিওয়ালাদের মত অনুপ্রাসের বুকনি, চলিতভাষায় সিদ্ধ বাক্যরীতির বিপর্যয় এবং অযথা ও অনুচিত শব্দসৃষ্টি—এই সব এবং সর্বোপরি অতিভাষণ অচিন্ত্যকুমারের লেখনীর

[১] প্রথমপ্রকাশ প্রগতিতে (১৩৩৫-৩৬)।

মুদ্রাদোষ। ইংরেজীর অনুবাদ এবং চলিতভাষার বিকৃতিও লক্ষণীয়। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

> …কপালে রসকলি আঁকিয়া, খোঁপায় জুঁইফুল গুঁজিয়া ও হাতে তান্‌পুরা নিয়া যে সব বৈষ্ণবী বাউরি হয় তাহাদের চরিত্র …[১]
>
> ঝড় আসিবে বলিয়া সন্ধ্যাসন্ধিতেই সবাই বাড়ি গিয়াছে,—[২]
>
> ঘরের উত্তপ্ত নিঃশব্দতার উপর সে যেন একটা ভিজে কম্বল ছুঁড়ে দিলো।[৩]
>
> আশ্চর্য, তুমি এখনো কিনা কাব্যের রোদে দিব্যি পিঠ পেতে আছো![৪]
>
> গাড়িটা তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল।[৫]
>
> গায়ের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরহরি উঠে বসল ঘাই মেরে। …বুড়ো বয়সের নামলা ছেলে ভোলানাথের।[৬]

১২

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু "আধুনিক" সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিয়া এবং 'কবিতা' পত্রিকা চালাইয়া ইনি আধুনিক সাহিত্যকে পরিচিত ও প্রচারিত করিতে বরাবর প্রচেষ্টিত। ইঁহার তিন প্রধান সহযোগী—গদ্য রচনায় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং 'কবিতা' সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত। বসু, মিত্র ও সেনগুপ্ত তিনজনে মিলিয়া দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—'বিসর্পিল' (১৩৪১) ও 'বনশ্রী'। ইংরেজী সাহিত্যের রসপিপাসু বুদ্ধদেব পাঠ্যাবস্থা হইতে। কোন একটি বইয়ের সমালোচনায় বুদ্ধদেববাবু লিখিয়াছিলেন, "আমি ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের প্রসাদবঞ্চিত"।[৭] একথা খুবই সত্য। তবে ভারতীয় সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির অভাবে ইঁহার প্রথম অবস্থার রচনা যে উৎকট বিজাতীয়তার কণ্টকে আকীর্ণ ছিল তাহা পরে লুপ্ত হইয়াছে রবীন্দ্র-অনুগতির মাধ্যমে।

বুদ্ধদেববাবু গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন অজস্র, বোধকরি অচিন্ত্যকুমারের চেয়েও বেশি। এই গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্যসাধনার গতি অনুসরণ করা যায়, এবং এরকম সমসাময়িক আর কোন লেখকের সম্বন্ধে

১ আকস্মিক পৃ ৪। সাধারণ পাঠক "বাউরি" ব্রজবুলি শব্দ বলিয়া লইবেন।
২ ঐ পৃ ২৫। "সন্ধ্যাসন্ধি" বেলাবেলির সাদৃশ্যে।
৩ নবনীতা (সিগনেট সংস্করণ, ১৯৪৫) পৃ ১৭। =threw a damp blanket.
৪ ঐ পৃ ৪১। ৫ 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৪) পৃ ১৪৫। =took a sharp turn.
৬ ঐ পৃ ১৪৯। ৭ কবিতা কার্তিক ১৩৪৮ পৃ ৩২।

নিশ্চিন্তভাবে করা যায় না। বুদ্ধদেব রূপে এবং রসে গল্প-উপন্যাসে নূতনত্ব আনিয়াছেন। ইঁহার গল্পবস্তু বহির্ঘটনাসাপেক্ষ নয়, প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের যে সাধারণ ও সামান্য ব্যপার তাহারই ভূমিকায় লেখকের (নায়কের) মন যে কামনা-ভাবনার সাদা-কালো নক্শা বুনিয়া চলিয়াছে তাহাই কাহিনীতে রূপ পাইয়াছে। তবে এধরণের রচনার বহুলতা ঘটিলে যাহা হয় বুদ্ধদেবের অনেক রচনায় তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ বস্তুভারের অভাবে কাহিনী রূপে স্পষ্টতা পায় নাই। বুদ্ধদেবের তাবৎ গল্প-উপন্যাসে তাঁহার নিজেরই যেন আত্মবিস্তার। অধিকাংশ রচনা আত্মস্মৃতিমূলক, অথবা তেমনই মনে হয়। লেখকের অভিজ্ঞতার বারো আনাই আত্মচিন্তানির্ভর কল্পনা, এবং সে বারো আনার পরিধি মধ্যে যেসব নরনারীর আনাগোনা তাঁহারা লেখকেরই সমান স্তরের অথবা উচ্চস্তরের লোক; নিম্নস্তরের লোক—পাড়াগাঁয়ের লোকের কথা দূরে থাক্, শহরের বাড়ির দাসদাসীও সে পরিধির মধ্যে দেখা দেয় নাই। সুতরাং বুদ্ধদেববাবুর রচনায় লোকের ভিড় নাই, মানুষের বৈচিত্র্যও নাই। আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই ধরণের নরনারী যাঁহারা কোন না কোন সময়ে লেখকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন অথবা লেখকের কল্পনায় উদিত হইয়াছিলেন। আর প্রায় সব গল্পেরই নায়ক লেখক নিজেই, তবে বিভিন্ন বয়সে অবস্থায় ও মেজাজে। প্রধানত এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যই বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের রস কিছু ফিকা লাগে।

নবীন লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেববাবু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পক্ষে একটু নূতনতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ভূমিকা হইতেছে প্রবলবেগে আত্মসমর্থনের। বুদ্ধদেববাবু নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যেন গোড়া থেকেই সংশয়হীন। এই সংশয়হীনতা তাঁহার পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাতেই পরিস্ফুট। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মলাটের পিছনে 'অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' বইটির সম্বন্ধে যে মন্তব্য আছে তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য।

> এই বইয়ের অন্তর্গত বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ল্যাণ্ডমার্ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে যে লেখকগোষ্ঠী ঝুড়ি ঝুড়ি রঙিন স্বপ্ন বেচতে আরম্ভ করেন; এবং মণীন্দ্রলাল বসুর রচনায় যে ভাববিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন—বুদ্ধদেব বসু সেই লেখকদের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থী। এই গল্পগুলি সেই ভাববিলাসিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। বঙ্কিম থেকে আরম্ভ করে' মণীন্দ্রলাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে রোম্যাণ্টিসিজম্-এর ভরা জোয়ার গেলো, এতদিন বোধহয় রিয়ালিজম্-এর দিন এসেছে। এই নতুন দিন যাঁরা আনবেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু একজন; এবং এ-বইয়ে তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন।

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যে কতটা প্রভাবিত তাহা তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম হইতেও বোঝা যায়। 'হে বিজয়ী বীর' (১৩৪০), 'রডোড্রেন্ডনগুচ্ছ' (১৩৩৯), 'ধূসর গোধূলি' (১৩৪০), 'যেদিন ফুটল কমল' (১৩৪০), 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৩৪২), 'তিথিডোর' (১৩৪৯), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১), 'অন্য কোনখানে' (১৩৫৭), 'অমি চঞ্চল হে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৩৪২), 'মন দেয়া নেয়া' (১৩৩৯), 'সব পেয়েছির দেশে', 'কালের পুতুল'।[১] 'কালের পুতুল' নামটির জন্য রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতা দ্রষ্টব্য।

'সাড়া' (১৯৩০), 'আমার বন্ধু' (১৯৩৩), 'সূর্য্যমুখী' (১৯৩৪), 'পরস্পর' (১৯৩৪), এই চারিটি উপন্যাস যেন লেখকের আত্মভাবনা-সূত্রে গাঁথা। বুদ্ধদেব বাবুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'য় তাঁহার উপন্যাস রচনার বিশেষত্ব দোষগুণ লইয়া পরিস্ফুট। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৭) পরিবর্জনের ফলে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের ক্ষীণ ভাবানুস্মৃতিটুকু মুছিয়া গিয়াছে। 'অকর্মণ্য' বা 'একটি বাঙালী রুডিন' (১৯৩১) 'সাড়া'র সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হইয়াছিল।

বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তাহার মধ্যে 'সাড়া' ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'যেদিন ফুটল কমল' (১৯৩৩), 'ধূসর গোধূলি' (১৯৩৩), 'লাল মেঘ' (১৯৩৪), 'তিথিডোর' (১৯৪৯), 'কালো হাওয়া' (১৯৪২), 'নির্জন স্বাক্ষর' (১৯৫১), 'মৌলিনাথ' (১৯৫২) ইত্যাদি।

গল্পের বই প্রায় বছরে একখানি করিয়া বাহির হইত। যেমন, 'অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১), 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' (১৯৩২), 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪), 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪), 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৯৩৫), 'নতুন লেখা' (১৯৩৬), 'ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪১), 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) ইত্যাদি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সময় হইতে যাহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি তাহার ব্যতিক্রম শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুতেও পাই না। অর্থাৎ যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস দুই-ই লিখিয়াছেন তাঁহাদের গল্প-রচনাতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বৈচিত্র্য ও নিপুণতা দেখা দিয়াছে।

বুদ্ধদেববাবু দুইখানি নাটকও রচনা করিয়াছেন। যেমন, 'অসামান্য মেয়ে'

[১] 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'আমি চঞ্চল হে' এবং 'সব পেয়েছির দেশে' ভ্রমণ ও আত্ম-কথামূলক, 'কালের পুতুল' প্রবন্ধ। বাকিগুলি গল্প-উপন্যাস।

(১৯৩৪) ও 'মায়া মালঞ্চ' (১৯৪৪)। 'মায়া মালঞ্চ' লেখকের 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের বস্তু লইয়া লেখা। 'অনেক রকম' (১৯৩৩, সংক্ষিপ্ত তৃ-স ১৯৪৮) রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার-সভার মত নাট্যোপন্যাস।

প্রবন্ধ রচনায় এবং সাহিত্য-সমালোচনায় বুদ্ধদেববাবুর নিপুণতা ও প্রবীণতা পরিস্ফুট। আত্মকথামূলক ভ্রমণকথা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫), 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৬), 'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭) ও 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১) উপভোগ্য। 'উত্তর তিরিশ' (১৯৪৫) প্রবন্ধের বই, 'কালের পুতুল' (১৯৪৬), 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' (১৯৫৪) ও 'সাহিত্য চর্চা' (১৯৫৪) সাহিত্য সমালোচনার।

বুদ্ধদেববাবুর গদ্যরচনা সযত্ন, স্থমিত ও পরিচ্ছন্ন। তবে গোড়ার দিকে ইহার ষ্টাইল ইংরেজীর অনুবাদে ও অনুসরণে কণ্টকিত ছিল। (সাধুভাষায় লেখা 'সাড়া' এ দোষ হইতে অনেকটা নির্মুক্ত।) যেমন,

> অবিশ্যি কবিতা সে ছোঁয় না—বাদে কোল্‌রিজ্‌।[১]
>
> নিচু ইঞ্জিচেয়ারের গভীরতা থেকে বাবা মুখ তুলে তাকালেন; তাঁর ভ্রূ জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত হ'লো।[২]
>
> সে দূরে সরে' রইলো—ঠাণ্ডা, সাদা বিচ্ছিন্নতায়।[৩]

১৩

কল্লোলের গল্পলেখকদের মধ্যে এমন কয়জন ছিলেন যাঁহারা পরে আর গল্প লিখেন নাই এবং এমনও কয়েকজন ছিলেন যাঁহারা বেশ কিছুকাল ফাঁক দিয়া পরে সাহিত্যকর্মে আবার নিবিষ্ট হন। প্রথম দলে দুইটি লেখকের নাম কর্তব্য—"যুবনাশ্ব" ও শ্রীযুক্ত জগৎ (বন্ধু) মিত্র।

"যুবনাশ্ব" শ্রীযুক্ত মণীশ ঘটকের ছদ্মনাম। কল্লোলে প্রকাশিত ইহার 'গোষ্পদ', 'পটলডাঙার পাঁচালী' ইত্যাদি "বাস্তব" গল্প-চিত্র দীর্ঘকাল পরে 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামে বাহির হইয়াছে (১৯৫৬)। এ রচনাগুলি প্রেমেন্দ্রবাবুর পাঁকের মত।

[১] অকর্মণ্য পৃ ৩২। "বাদে"=except। [২] পরস্পর পৃ ২৪। "নিচু⋯থেকে"=from the depth of, "জিজ্ঞাসায়"=in interrogation। [৩] সূর্যমুখী পৃ ২২। "ঠাণ্ডা, সাদা বিচ্ছিন্নতায়"=in cold, blank separation.

শ্রীযুক্ত জগৎ মিত্র গোকুলচন্দ্র নাগের ভাগিনেয়। কল্লোলে ইঁহার গল্প, প্রবন্ধ[১] এবং কবিতা কিছু বাহির হইয়াছিল। ইঁহার দুইখানি বই আছে। প্রথম বই 'আঠারো বছর' (১৩৩৪) বড়মামা শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে উৎসর্গিত। ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে। তাহার মধ্যে কেবল একটি ('স্বপ্নের বিড়ম্বনা') কল্লোলে ছাপা হইয়াছিল। বাকিগুলি প্রবাসী ভারতবর্ষ বিচিত্রা ও বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় বই 'এরা শুধু মানুষ' (১৩৪২) উপন্যাস, ছোটমামার নামে উৎসর্গিত। কাহিনী নারী ও যৌন সমস্যাঘটিত। রচনা ভালো।

জগৎবাবু গল্প-রচনায় ছোট মাতুলের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার "বাস্তবতা" ঢের বেশি। শরৎচন্দ্রের প্রভাবও বেশ আছে। বই দুইটিতে লেখকের ক্ষমতার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা অনুশীলিত হইলে ভালো হইত।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে নাম করিতে পারি—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় (জন্ম ১৮৯৫)[২], শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়[৩], শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (জন্ম ১৯০৬) ইত্যাদির ॥

১৪

প্রথম হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক গল্পখোর। অবশ্য সব দেশের সাহিত্যেই গল্পপাঠকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু বাঙ্গালায় পাঠক স্বেচ্ছায় গল্প ছাড়া আর কিছু পড়িতে চায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখাইলেন যে মনের মত গল্প-উপন্যাস লিখিলে শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভদ্রভাবে সংসার চালানো সম্ভব। এই হইতে বাঙ্গালা গল্প-উপন্যাসের ব্যাপক উৎপাদনের—ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের—শুরু। এইজন্য আলোচ্য সময়ে (অর্থাৎ তৃতীয় দশকে ও চতুর্থ দশকের গোড়ায়) যত লেখক দেখা দিয়াছেন ও যত গল্প-উপন্যাস লেখা হইয়াছে তাহার সংখ্যা যেমন প্রচুর শক্তির ও বৈচিত্র্যের পরিচয় সে অনুপাতে অত্যন্ত অপ্রচুর। ব্যাপক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে খরিদ্দারের চাহিদার উপর। গল্প-উপন্যাসের বাঙ্গালী খরিদ্দারের রুচি ইতিমধ্যে বেশি বদলায় নাই, কেবল সাধারণ

[১] 'শরৎসাহিত্যে প্রেম' ১৩৩৪ সালে বাহির হইয়াছিল।

[২] 'অপৌরুষেয়' (১৯৩৯) ভূতের গল্পের বই ; 'অনুচ্চারিত' ও 'অতীশ দি গ্রেট' উপন্যাস (?) ; 'পাঁচমিশেলী' (১৯৩১) স্মৃতিকথা। [৩] 'ভোরের আলো' (১৩৩৮), 'অপরূপ' (১৩৩৯), 'তমুতীর্থ' (১৩৪২), 'মদনভস্মের পর' (১৩৪৫), 'মিলন লগ্ন' (১৩৪৬) ইত্যাদি উপন্যাস।

জীবনের প্রতি তাহার ঔৎসুক্য কিছু বাড়িয়াছে। সেইজন্য অপঠিত অথবা বিস্মৃত গল্প-উপন্যাসের কাহিনীকে একটু-আধটু কালোপযোগী রঙচঙ দিয়া নূতনভাবে উপস্থাপিত করা অলাভের হইল না। সুতরাং এই সময়ে নূতন লেখকদের অনেক নূতন লেখা আসলে রঙ-ফেরানো পুরানো শিল্প। বাঙ্গালীর জীবনের প্রসার বাড়ে নাই সুতরাং বিষয়ে বৈচিত্র্য আনয়ন সাধারণ লেখকের ক্ষমতাতীত। আর একটা কথা স্মরণীয়। খবরের কাগজেও সাহিত্য পরিবেশন চলিয়াছে। (এ কাজ আগে মাসিকপত্রের একচেটিয়া ছিল।) সেইজন্য রচনায় বাক্‌বাহুল্য এবং বিষয়ে একঘেয়েমি প্রশ্রয় পাইয়াছে।

সত্যকার যাঁহারা নূতন লেখার লেখক তাঁহারা রোমান্‌সের দৃষ্টি যথাসম্ভব খাটো করিয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তির জীবন (যাহা কালের গতিকে ক্রমশ নজরে পড়িতেছে) সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন। এ কৌতূহল অবশ্যই নিঃস্পৃহ শিল্পীর অথবা বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুর নয়। ইহার মধ্যে সমবেদনা আছে, কিঞ্চিৎ অনুকম্পাও আছে। এই দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা চিত্র-গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের (১৮৯৬-১৯৩৫) নাম। নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনের প্রথমেই ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়া উত্তরবঙ্গে সাধারণ লোকের মধ্যে সাঁওতাল মজুরদের মধ্যে উন্নয়ন কার্যে ব্রতী হন এবং আমরণ তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পথে ঘাটে অখ্যাত অজ্ঞাত জনস্রোতের "শেহলি"র বিচিত্র অবস্থার ক্ষণোদ্‌ভাসিত রূপ আঁকিয়াছিলেন ইনি গল্পচিত্রে। রোমান্‌স-রসহীন এই গল্পচিত্রগুলিতে "মাটির কাছাকাছি" থাকে যে মানুষ তাহার বাস্তবিকতা ধরা পড়িয়াছে।

ইঁহার উপভোগ্য প্রহসন 'মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল'এর (১৩৩৯) উল্লেখ আগে করিয়াছি। প্রথমে ইনিও কবিতা লিখিতেন। তাহার সাক্ষ্য 'সিন্ধুসরিৎ' (১৩৩৩)। ইঁহার গল্প-চিত্রের বই—'থার্ড ক্লাস' (১৩৩৫), 'বাস্তবিকা' (১৯৩২), 'দিবাকরী' (১৩৩৮), 'উদাসীর মাঠ' (১৩৩৮), 'পরাজয়', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৪৭), 'নিরঞ্জন' (১৯৪৮) ইত্যাদি॥

১৫

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের (জন্ম ১৯০৭) একটি গল্প প্রথম বর্ষের কল্লোলে

বাহির হইয়াছিল।[১] এই প্রথম রচনাটিতেই বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছে। প্রবোধকুমার গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী স্মৃতিকথা সবই লিখিয়াছেন। দুইটি-একটি চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ চিত্রণের অপেক্ষা বহু চরিত্রের ক্ষণিক নিরূপণে ও ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনাতেই ইঁহার দক্ষতার বিশেষ পরিচয়। অর্থাৎ ইঁহার দৃষ্টি পথিকের। এইজন্য ভ্রমণকাহিনীতে ইঁহার লেখনীর সর্বাধিক স্বচ্ছন্দগতি। প্রথম গ্রন্থ কয়েকটির নামেও এই দৃষ্টির ছাপ আছে,—'যাযাবর', 'কলরব' ইত্যাদি। পরিচয়ে চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও'এর সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রবোধকুমারের রচনার ন্যায্য প্রশংসা।[২] "প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়; কোনোটাই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে-পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের। লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত্ত।"

প্রবোধকুমার প্রায় সত্তরখানি বই লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পের বই 'অঙ্গরাগ' (১৯৩৭), 'চেনা ও অচেনা' (১৯৩১), 'নিশিপদ্ম' (১৯৩২), 'অবিকল' (১৩৪০), 'দিবাস্বপ্ন' (১৩৪৩), 'কয়েক ঘণ্টা মাত্র' (১৩৪৬) ইত্যাদি। বড় গল্প-উপন্যাস—'যাযাবর' (১৩৩৫), 'দুই আর দুয়ে চার' (১৯৩১), 'কাজললতা' (১৯৩২), 'কলরব' (১৯৩২), 'প্রিয়বান্ধবী' (১৯৩৩), 'আলো আর আগুন' (১৩৪৪), 'আঁকাবাঁকা' (১৩৪৫), 'নদ ও নদী' (১৩৪৭) ইত্যাদি। প্রথম ভ্রমণ-গল্প 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৩৪৪) প্রবোধবাবুর সব চেয়ে সমাদৃত বই ॥

১৬

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৯৮) প্রথম গল্প 'রসকলি' চতুর্থ বর্ষ কল্লোলে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩] সে সময়ে ইনি কবিতাও লিখিতেন।[৪] সাহিত্য-কর্মে এই প্রথম ঝোঁক কিছুদিন পরে মন্দীভূত হইয়া যায়। তাহার পরে ১৯৪০ সালের দিকে তারাশঙ্করবাবু বঙ্গশ্রী ও প্রবাসী পত্রিকায় গল্পরচনায় প্রবীণতার পরিচয় লইয়া দেখা দেন। সেই হইতে তাঁহার লেখনী অস্তব্ধ গতিতে প্রথমে গল্প এবং পরে গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনা করিয়া চলিয়াছে। তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের অনুসরণ-

[১] 'মার্জনা' (মাঘ ১৩৩০)।
[২] বৈশাখ ১৩৪০।
[৩] ফাল্গুন ১৩৩৪।
[৪] কবিতার বই 'ত্রিপত্র' (১৩৩৩) ইঁহার প্রথম গ্রন্থ।

কারী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লা-কুঠীর সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন—পুরানো জমিদার ঘর হইতে মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত। অনতিপ্রাচীন স্থানীয় ঐতিহ্য গল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী তিনি ভালো করিয়াই কাজে লাগাইয়াছেন। এবং এইখানেই তারাশঙ্করবাবুর রচনার প্রধান বিশেষত্ব। তারাশঙ্করের দৃষ্টি শৈলজানন্দের মত উদাসীন ও নিরাবিল নয়। সে দৃষ্টিতে হৃদয়াংশ বেশ খানিকটা আছে। সাধারণ পাঠকের মনস্তুষ্টির চেষ্টাও আছে। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তুর বা আধেয়ের সমৃদ্ধি। আধার অর্থাৎ ষ্টাইল শ্লথ ও প্রগল্‌ভ। প্রধানত এই কারণেই তারাশঙ্করের কলমে গল্প যেমন জমিয়াছে উপন্যাস তেমন উৎরায় নাই।

তারাশঙ্করবাবুর গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। গল্পের বই এইগুলি—'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'বেদেনী' (১৯৪০), 'যাদুকরী' (১৯৪৩) ইত্যাদি। 'রাইকমল' (১৯৩৫) বড় গল্প। এটিও ভালো গল্প, ভিখারী বৈষ্ণবদের জীবন। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী'তে এ জীবনের ইঙ্গিত এবং শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'এ ও 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে এ জীবনের রোমান্টিক চিত্র। তবে তারাশঙ্করের চিত্র বাস্তবতর।

প্রথমদিকের উপন্যাসগুলি বড় গল্প ছাড়া আর কিছু নয়,—'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৪), 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৩৫), 'আগুন' (১৩৪৪)। 'ধাত্রীদেবতা' ইঁহার প্রথম পাকা উপন্যাস, অবশ্য রাইকমলের কথা বাদ দিলে। 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) ইত্যাদিতে উপন্যাস-লেখকরূপে তারাশঙ্করবাবুর যশ পাঠকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। মনে করিয়া দিই, তারাশঙ্করের এই পাকা রচনাগুলির কাহিনীর মূল তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে প্রায়ই লভ্য এবং এসব কাহিনী লেখকের পরিচিত স্থান-কাল-পাত্র-ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত। বিষয়ের পরিকল্পনায় তারাশঙ্করবাবুর দৈন্য নাই, কাহিনীর নির্বাচনে ও গঠনে নূতনত্ব আমদানির চেষ্টা নাই, এবং ঘটনার গতি পাঠকের অনপেক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত নয়। হৃদয়াবেগের প্রত্যাখ্যান নাই এবং অতিভাষণও বর্জিত নয়। এইসব কারণে তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অত্যধিক।

তারাশঙ্করবাবু তাঁহার কয়েকটি গল্পকাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র নাটকও রচনা করিয়াছেন। এগুলির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হইয়াছে। ইঁহার নাট্যরচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'কালিন্দী' (১৩৪৮), 'দুই পুরুষ' (১৩৪৯), 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০), 'বিংশ শতাব্দী' (১৩৫১), 'যুগবিপ্লব' (১৩৫৮), 'কবি' (১৩৪৮) ইত্যাদি॥

১৭

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী (জন্ম ১৯০২) কতকটা তারাশঙ্করবাবুর সমানধর্মা। ইঁহারও এক-আধটি গল্প কল্লোলে বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাস-কাহিনীর ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর রচনার মানচিত্র ইহারই সংলগ্নভূমি পশ্চিম মুর্শিদাবাদ। তবে সরোজবাবুর কাহিনী অতটা মুখ্যভাবে "রিজিওন্যাল" নয় যতটা তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী। রোমান্স-প্রখরতা এবং বহুভাষণও সরোজবাবুর লেখায় কম।

সরোজবাবুর উপন্যাস—'বন্ধনী' (১৩৩৮), 'অভিশাপ' (১৯৩৮), 'শৃঙ্খল' (১৩৩৯), 'আকাশ ও মৃত্তিকা' (১৩৪০), 'পান্থনিবাস' (১৩৪২) ; 'ময়ূরাক্ষী' (১৩৪৩), 'গৃহকপোতী' (১৯৪৪) ও 'সোমলতা' (১৯৪৫) ;[১] 'হংসবলাকা' (১৩৪৪), 'শতাব্দীর অভিশাপ' (১৩৪৮), 'কালো ঘোড়া' (১৩৫৩) ইত্যাদি। গল্পের বই—'দেহযমুনা' (১৩৪৩), 'মনের গহনে' (১৩৪৩), 'ক্ষণবসন্ত' (১৩৪৪), 'ক্ষুধা' (১৩৫১) ইত্যাদি। নাটক—'হালদার সাহেব' (১৩৫৪)॥

১৮

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯) তাঁহার "বনফুল" এই সাহিত্যিক ছদ্মনামেই সমধিক পরিচিত। রীতিমত গল্প-উপন্যাস লিখিবার অনেককাল আগে হইতে ইঁহার এই ছদ্মনামে লেখা কবিতা ও কথিকা প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইত।[২] 'শনিবারের চিঠি'র দলে যোগ দিবার পর হইতে ইনি ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি লিখিতে থাকেন। সে রচনায় স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় আছে। বলাইবাবু মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট। ইঁহার ডাক্তারি-ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে

১ এই তিনটি উপন্যাস "ট্রিলজি", অর্থাৎ একই কাহিনীর অনুবৃত্তি, নাম 'নতুন ফসল'।

২ যেমন, ১৯২৯ সালের প্রবাসীতে 'পাখী' (ভাদ্র), 'চোখ গেল' (আশ্বিন), 'আত্মপর' (পৌষ) ইত্যাদি।

লেখা 'তৃণখণ্ড' (১৩৪২) ও 'বৈতরণীর তীরে' (১৩৪৩) গল্প-রচনায় নূতন পথের ইঙ্গিত আনিয়াছিল। আগে হইতেই বলাইবাবু কতকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় ছোটগল্প লিখিতেছিলেন, যাহাকে বলে ইংরেজীতে five minute shortstory আর আমেরিকান সাহিত্যিক শ্ল্যাঙে shortshort। এগুলিও নূতন জিনিস। গল্প ও উপন্যাসে বলাইবাবুর বিশেষত্ব—অপ্রগল্‌ভতা ও প্রযত্ন। লেখায় শৈথিল্য নাই, চরিত্রচিত্রণে ভাবাবেগ-তীব্রতা নাই। বিষয়ের জন্য ইনি পরিচিত সমাজ-সংসারের বাহিরে যান নাই। অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন যথেষ্ট।

বলাইবাবু অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা সবই এক ছাঁচে ঢালা নয়। উপন্যাসের টেকনিকে ইনি নানাভাবে পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটিতে ইঁহার কৃতকার্যতা স্বীকর্তব্য তাহা হইতেছে উপন্যাসের সঙ্গে কাব্যের ও নাট্যের শৈলী মেশানো। যেমন, 'মৃগয়া' (১৯৪০, দ্বি-স ১৯৪২, তৃ-স ১৯৪৫)। বিজ্ঞানকে উপন্যাসের ও কাব্যের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন 'ডানা'য় (১৯৪৮)। 'স্থাবর'এ (১৯৫১) আদিম মানবের মনস্তত্ত্ব অনুশীলিত।

বলাইবাবুর গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। কবিতার বই—'বনফুলের কবিতা' (১৩৪২), 'অঙ্গারপর্ণী' (১৩৪৭), 'চতুর্দশী' (১৩৪৭), 'আহবনীয়' (১৩৫০) ইত্যাদি। গল্পের বই—'বৈতরণী-তীরে' (১৩৪৩), 'বনফুলের গল্প' (১৩৪৩), 'বনফুলের আরো গল্প' (১৩৪৫), 'বাহুল্য' (১৩৫০), 'বিন্দুবিসর্গ' (১৩৫১), 'অদৃশ্য-লোকে' ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস—'তৃণখণ্ড' (১৩৪২), 'দ্বৈরথ' (১৩৪৪), 'কিছুক্ষণ' (১৩৪৫), 'নির্মোক' (১৩৪৭), 'রাত্রি' (১৩৪৮, দ্বি-স ১৩৫১), 'জঙ্গম' (১৩৫০), 'ডানা' (১৩৫৫), 'মানদণ্ড' (১৩৫৫, দ্বি-স ১৩৫৭), 'স্থাবর' (১৩৫৮), 'পঞ্চপর্ব' (১৩৬১) ইত্যাদি।

বলাইবাবুর দুইখানি জীবনী-নাটকের কথা আগে বলিয়াছি। 'শ্রীমধুসূদন' (১৩৪৬) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৩৪৮) নাট্যরচনায় নূতন পথ দেখাইয়াছে। ইঁহার অপর নাট্যগ্রন্থ—'রূপান্তর' (১৩৪৪), 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৩৪৫), 'মধ্যবিত্ত' (দ্বি-স ১৩৬৩), 'কঞ্চি' (১৩৫২), 'বন্ধনমোচন' (১৩৫৫) ইত্যাদি॥

১৯

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের (জন্ম ১৯০৪) কবিতার কথা পরে বলিতেছি। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রবন্ধের বই—'তারুণ্য' (১৯২৮, দ্বি-স ১৯৪৭)। তাহার পর এই ধরণের বই—'আমরা' (১৯৩৭, দ্বি-স ১৯৪৭), 'জীবনশিল্পী' (১৯৪১, দ্বি-স

১৯৪৯), 'ইশারা' (১৯৪৩, দ্বি-স ১৯৫৪), 'বিনুর বই' (১৯৪৪, দ্বি-স ১৯৫২), 'জীয়নকাটি' (১৯৪৯), 'দেশকালপাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১), 'নতুন করে বাঁচা' (১৯৫৩), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। বিচিত্রায় প্রথম প্রকাশিত ইউরোপ-ভ্রমণকাহিনী 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১, দ্বি-স ১৯৫৩) গদ্যশিল্পী রূপে অন্নদাশঙ্করবাবুকে প্রতিষ্ঠিত করে।[১] ইঁহার ছোটগল্পগুলিও বিশিষ্ট রচনা। ছোটগল্পের বই—'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩৪, দ্বি-স ১৯৪৭), 'মন পবন' (১৯৪৬), 'যৌবনজ্বালা' (১৯৫০), 'কামিনীকাঞ্চন' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্করবাবু উপন্যাস-রচনাতেই অধিক মনোযোগী। উপন্যাসের মধ্যে ইনি নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'সত্যাসত্য' শীর্ষক উপন্যাস ষট্‌ক—'যার যেথা দেশ' (১৯৩২, তৃ-স ?), 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৫৩), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪, তৃ-স ১৯৫৩), 'দুঃখমোচন' (১৯৩৬, তৃ-স ১৯৫৩), 'মর্ত্যের স্বর্গ' (১৯৪০, দ্বি-স ?) ও 'অপসরণ' (১৯৪২, তৃ-স ১৯৫৩)। নায়ক বাদলের মনের খেয়াল ও ভাবনার জটিলতা এবং সেই সঙ্গে নায়িকা উজ্জয়িনীর অসহায় নির্ভরতা কাহিনীর মূল সূত্র। পাত্রপাত্রী খুব বেশী নয়। কাহিনীর স্থান ভারতবর্ষ ও ইউরোপ। নায়িকা ও ছোটখাট ভূমিকাগুলি উজ্জ্বল। নায়ক অত্যন্ত ধোঁয়াটে, পাগল বলিলেও হয়। নায়কের অভিভাবকস্থানীয় পার্শ্বচর সুধীর ভূমিকায় লেখকের ভাবাদর্শ খানিকটা রূপ পাইয়াছে।

অন্নদাশঙ্করবাবুর অপর উপন্যাস—'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০, চ-স ১৯৫১), 'অসমাপিকা' (১৯৩৯, তৃ-স ১৯৫৪), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩, তৃ-স ১৯৪৯), 'না' (১৯৫১, দ্বি-স ১৯৫২), 'কন্যা' (১৯৫৩, দ্বি-স ১৯৫৪) ইত্যাদি॥

২০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮[২]-১৯৫৬) আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সে নাম একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইঁহার প্রথম রচনা 'অতসী মামী' গল্প ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় বাহির হইয়াছিল। তখন হইতেই এই ছদ্মনাম। লেখকরূপে মাণিকবাবুর রীতিমত আবির্ভাব 'বঙ্গশ্রী'

১ ছেলেদের জন্য লেখা, 'মৌচাক'এ প্রথমপ্রকাশিত 'ইউরোপের চিঠি' (১৯৪৩) এবং লেখকের ছোটবেলার কাহিনী 'পাহাড়ী'ও (১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য।

২ মতান্তরে ১৯১০।

পত্রিকায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' এই পত্রিকায়ই প্রথম বাহির হইয়াছিল (১৩৪১)। মাণিকবাবুর রচনার সমস্ত দোষগুণের ইঙ্গিত তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসটিতে লভ্য।

মাণিকবাবুর বইয়ের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। গল্পের বই—'অতসী মামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদপোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮), 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওলা' (১৯৫৩) ইত্যাদি। বড় গল্প ও উপন্যাস—'জননী' (১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), দুইপর্ব 'সহরতলী' (প্রথম পর্ব ১৯৪০), 'সহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬, দ্বি-স ১৯৫৩), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'অহিংসা' (১৯৪৮), দুইখণ্ড 'সোনার চেয়ে দামী' (প্রথম খণ্ড 'বেকার' ১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড 'আপোষ' ১৯৫২), 'হরফ' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

মাণিকবাবুর গল্প-উপন্যাসে যে দৃষ্টিকোণ নেওয়া হইয়াছে তাহা নূতন ও নিজস্ব। প্রথম হইতেই ঝোঁক্ সেক্সের দিকে, পরে ফ্রয়েডীয় ভাবনায় পরিণত। ক্ষুধা এবং রিরংসা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। তাহার মধ্যে, ফ্রয়েডের মতে, রিরংসাই প্রগাঢ়তর। মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যৌনপ্রবৃত্তির ভিয়ানেই সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তি-মানুষের অনবরুদ্ধ মনঃপ্রবণতা যাহা তাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড তাহারই উপর তাহার জীবনের সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং সফলতা ও বিফলতা নির্ভরশীল। মাণিকবাবু এই দিকেই জীবনের বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদেশদর্শিতা অবশ্যই আছে তবে সেটা কৃত্রিম মতবাদ-আশ্রিত নয়। বাল্যকাল হইতেই মাণিকবাবুর জীবন সমস্যাসঙ্কুল ছিল এবং তথাকথিত "ছোটলোক"দের সঙ্গে তাঁহার খোলাখুলি মেশামিশি ছিল। এই সহজাত সিম্প্যাথির সঙ্গে তাঁহার সংসার-সমাজ আইডিয়ার সংঘর্ষ হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে তাঁহার বিশিষ্ট মানসিকতা, তাঁহার বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি উদ্ভূত। কমিউনিজমের দিকে তাঁহার ঢলিয়া পড়া এইসূত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছিল। দরিদ্রের ক্ষুধা এবং দরিদ্র-অদরিদ্রের অবচেতন যৌনবিকার তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের নিয়তি। প্রথমটি পরিহার্য, অপরটি অপরিহার্য। যৌনবিকার পাড়াগাঁয়ের সংসার-সমাজে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, সহরের সংসার-সমাজে

'সহরবাসের ইতিকথা'য়, সাধুর আশ্রমে 'অহিংসা'য়। বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকের নিরাসক্ত অথচ প্রাণস্পন্দিত দৃষ্টি মাণিকবাবু সর্বত্র রাখিতে পারেন নাই। সেখানে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতা। যেমন 'চতুষ্কোণ'।

মাণিকবাবুর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ভালো লেখা তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। ইহার মধ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা আছে রোমান্স-রসের আমেজও আছে। ছোটগল্পগুলিতেই শিল্পী মাণিকবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে॥

২১

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর কবিতার ও নাটকের আলোচনা আগে করিয়াছি। প্রমথবাবুর গদ্যগ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। গল্প-উপন্যাস ও সরস প্রবন্ধ রচনায় ইনি অক্লান্ত এবং জনপ্রিয়। জর্জ বার্নাড শএর অনুকরণে ইনি একদা "প্র-না-বি" ছদ্মনাম আশ্রয় করিয়াছিলেন। এখন সংবাদপত্রের রচনায় নিজেকে "কমলাকান্ত" বলিতেছেন। ইঁহার গল্প ও উপন্যাসের বই—'পদ্মা' (১৩৪২), 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৩৫২), 'চলনবিল' (১৩৫৬), 'ডাকিনী' (১৩৫২), 'অশরীরী', 'গল্পের মত' (১৩৫২), 'গালি ও গল্প' (১৩৫২), 'ধনে পাতা', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' (১৩৫৪), 'ব্রহ্মার হাসি' (১৩৫৫) ইত্যাদি। আত্মস্মৃতিমূলক 'শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪) অত্যন্ত উপাদেয় রচনা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯) প্রধানত গল্পই লিখিয়াছেন। ইঁহার গল্পে যে নূতন সুরটুকু পাওয়া যায় তাহা বাৎসল্যের এবং ঘরোয়া হালকা পরিবেশের ও হাসিঠাট্টার। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ইঁহার লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ। বিভূতিবাবুর গল্পের বই সংখ্যায় তিরিশের কাছাকাছি—'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৩৪৪), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৩৪৫), 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৩৪৭), 'রাণুর কথামালা' (১৩৪৮), 'অতঃকিম্' (১৩৫০), 'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার' (১৩৫৪), 'বরযাত্রী' (১৩৫৯) ইত্যাদি। উপন্যাসও পাঁচ-সাতখানি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪২) সর্বাধিক পরিচিত। নাট্যরচনা—'বিশেষ রজনী' (১৩৫১), 'গণ্শার বিয়ে' (১৩৫৯)।

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী (জন্ম ১৮৯৯) কিছুকাল 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার চাতুর্য ছোট ছোট সরস কৌতুকপূর্ণ গল্পচিত্র ও নাট্য রচনায়। পরিমলবাবুর রচনাবলী—'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ট্রামের সেই লোকটি'

(১৯৪৪, দ্বি-স ১৯৪৬), 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৩৫২), 'মারকে লেঙ্গে' (১৩৫৭) ইত্যাদি। নাট্যরচনা—'দুষ্মন্তের বিচার' (১৯৪৩, দ্বি-স ১৯৪৪) ও 'ঘুঘু' (১৯৪৪)।

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য-লেখকদের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। একদা কবিতাও লিখিতেন। তাহার নিদর্শন 'যৌবনস্মৃতি' (১৯২২)। ইতিহাস হইতে কাহিনী এবং সাধারণ জীবন লইয়া শরদিন্দুবাবু কয়েকটি ভালো ছোটগল্প লিখিয়াছেন। ভূতের গল্প ডিটেক্‌টিভ গল্প এবং নাট্য চিত্র লেখায়ও ইনি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। শরদিন্দুবাবুর গল্পের বই—'জাতিস্মর' (১৯৩৩), 'ডিটেক্‌টিভ' (১৯৭৭), 'চুয়াচন্দন' (১৯৪২), 'কাঁচামিঠে' (১৯৪২), 'কালকূট' (১৩৫১), 'গোপন কথা' (১৩৫২), 'দন্তরুচি' (১৩৫২), 'পঞ্চভূত' (১৩৫২), 'ছায়া পথিক' (১৩৫৬), 'কানু কহে রাই' (১৯৫৪) ইত্যাদি। নাট্যরচনা—'বন্ধু' (১৯৩৭), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪১), 'কালিদাস' (১৯৪৩), 'বিজয়লক্ষ্মী' (১৯৪৭), 'কানামাছি' (১৯৫২) ইত্যাদি। কোনান ডয়েলের গল্পের ছায়াবহ হইলেও 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি ডিটেক্‌টিভ গল্প উপভোগ্য।

শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮২) অনেক গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন এবং ইঁহার রচনা একদা সাধারণ পাঠকের রুচিকর ছিল।[১]

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর (জন্ম ১৯০১) রচনা সংখ্যায় প্রচুর। ইঁহার তাবৎ রচনার মধ্যে গল্পই শ্রেষ্ঠ ॥[২]

২২

অপর গল্প-উপন্যাস ও বিবিধ গদ্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু[৩], শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত[৪], রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৬-৪৬)[৫],

[১] ইঁহার বই ; গল্প—'স্ত্রী' (১৩৩৩), 'জমা খরচ' (১৩৩৫), 'ধাঁধার উত্তর' (১৩৩৯), 'সকলি গরল ভেল' (১৩৪১), 'মিস্ মায়া বোর্ডিং হাউস' (১৩৪৮) ইত্যাদি ; উপন্যাস—'পথের স্মৃতি' (১৩৩৭), 'মাটির স্বর্গ' (১৩৩৮), 'প্রিয়তমাসু' (১৩৪৪) ইত্যাদি ; নাটক—'দিগদারি' (১৩৪০)।

[২] ইঁহার গল্পের বই—'বনমর্ম্মর' (১৯৩২), 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৪), 'পৃথিবী কাদের', 'কুঙ্কুম' (১৩৫৯) ইত্যাদি।

[৩] গল্প—'বিগত বসন্ত' (১৩৪৭), 'গল্পলতা' (১৯৫৪) ; উপন্যাস—'নবমেঘদূত' (১৩৩৮), 'মানবের শত্রু নারী' (১৩৪১), 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' (১৩৪৬), 'পাখীর বাসা' (১৩৫৫) ইত্যাদি। ইঁহার নাট্য রচনার উল্লেখ আগে করিয়াছি।

[৪] গল্প—'ইহাই নিয়ম' (১৯৩২), 'বন্দিনী সুভদ্রা' (১৯৩৭), 'নবনব রূপে' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

[৫] উপন্যাস—'বিস্ময়' (১৯৩৫), 'কলঙ্কিনীর খাল' (১৯৪১) ; গল্প—'সবিনয় নিবেদন' (১৯৪১), 'বেদিয়া ছন্দ' (১৯৪৫)।

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস (জন্ম ১৯১০)[১], শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯)[২], "অমলা দেবী" (আসলে শ্রীযুক্ত ললিতানন্দ গুপ্ত; জন্ম ১৯০২)[৩], শ্রীমতী আশালতা দেবী,[৪] শ্রীমতী আশালতা সিংহ (জন্ম ১৯১১)[৫], শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার (জন্ম ১৯০২)[৬], শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬)[৭], শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী[৮], শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা (জন্ম ১৯০১)[৯], শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য[১০], শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৫)[১১], শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী (জন্ম ১৯০৮)[১২], শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী,[১৩] প্রফুল্লকুমার সরকার (১৮৮৩-১৯৪৪)[১৪],

১ গল্প—'ছিন্ন পাপড়ি' (১৯৩৩), 'অসমাপ্ত' (১৯৩৮) ইত্যাদি; উপন্যাস—'চলতি পথের বাঁশী' (১৩৪১), 'সাগর দোলায় ঢেউ' (১৩৪২), 'নিঃসহ যৌবন' (১৩৫২) ইত্যাদি।

২ গল্প—'অম্লমধুর' (১৯৩১), 'আবর্ত্ত' (১৩৪৪), 'আলেখ্য' (১৩৪৯), 'মুহূর্ত্তের মূল্য' (১৩৫৪) ইত্যাদি, উপন্যাস—'রতন দীঘির জমিদার বধূ' (১৩৪৬), 'মজানদীর কথা' (১৩৪৮), 'মহানগরী' (১৩৫২), 'শাশ্বত পিপাসা', 'অনির্বাণ' (১৩৬১) ইত্যাদি।

৩ উপন্যাস—'সুধার প্রেম' (১৩৪৭), 'সরোজিনী' (১৩৪৯), 'চাওয়া ও পাওয়া' (১৩৫২), 'কল্যাণ সঙ্ঘ' (১৩৫৯), 'ছায়াছবি' (১৩৬০) ইত্যাদি, গল্প—'সমাপ্তি' (১৩৫৬), 'স্বাধীনতা দিবস' (১৩৫৭) ইত্যাদি।

৪ গল্প—'অন্তর্যামী' (১৯৩৫), উপন্যাস—'অমিতার প্রেম' (১৯৩৪), 'দুরন্ত যৌবন' (১৩৪৬), ইত্যাদি।

৫ গল্প—'অভিমান' (১৯৩৪); উপন্যাস—'দুই নারী' (১৯৩৪), 'কলেজের মেয়ে' (১৩৪৬), 'বিয়ের পরে' (১৩৪২), 'সমর্পণ' (১৩৪২), 'সহরের মোহ' (১৩৪৩), 'সমী ও দীপ্তি' (১৩৪৬), 'একাকী' (১৩৪৭), 'ক্রন্দসী' (১৩৪৭), 'ভুলের ফসল' (১৩৫২) ইত্যাদি; নাটক—'সুরের উৎস' (১৩৫৮)।

৬ উপন্যাস—'একদা' (১৩৪৬), 'পঞ্চাশের পথ' (১৩৫১), 'অন্যদিন' (১৩৫৭) ইত্যাদি; গল্প—'ধূলিকণা' (১৩৫৫।

৭ উপন্যাস—'অস্তাচল' (১৩৩৯), 'এগারই ফাল্গুন' (১৩৪১), 'মণিকুন্তলা' (১৩৪৩) ইত্যাদি, গল্প—'মাটির পরশ' (১৩৪৫); নাটক—'পলাশী' (১৩৫০), 'অঙ্গনা' (১৩৫১)।

৮ গল্প—'মেয়েদের মন' (১৯৪০), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৪৫) ইত্যাদি।

৯ উপন্যাস—'যে শাখে ফুল ফোটে না' (১৩৪১). 'যোগিনীর মঠ' (১৩৪৮) ইত্যাদি; গল্প—'তৃষা', 'মাষ্টার' (১৩৫২) ইত্যাদি।

১০ গল্প—'ফসল' (১৩৪৮), 'ঋণ' (১৩৫০), 'নতুন দিনের কাহিনী' (১৩৫৩); উপন্যাস—'মরামাটি' (১৩৪৮), 'বৃত্ত' (১৩৪৯), 'কস্মৈ দেবায়' (১৯৪৪), 'মৌচাক' (১৩৫৫) ইত্যাদি।

১১ উপন্যাস—'তুহুঁ মম জীবন' (১৩৪৬), 'ধরণীর ধূলিকণা' (১৩৫০), 'জলে জাগে ঢেউ' (১৩৫২), 'মেঘমেদুর' (১৩৫৮) ইত্যাদি; গল্প—'নীলালক্তক' (১৩৫২); কবিতা—'হিঙ্গুল নদীর কূলে' (১৩৪২), 'কাশবনের কন্যা' (১৩৪৫)।

১২ গল্প—'জল আর আগুন' (১৩৪৬) ইত্যাদি, উপন্যাস—'অনির্বাণ' (১৩৫২) ইত্যাদি।

১৩ উপন্যাস—'মানুষের ঘর' (১৩৪৮) ইত্যাদি।

১৪ উপন্যাস—'অনাগত' (১৩৩৪), 'বিদ্যুৎলেখা' (১৩৩৭), 'লোকারণ্য' (১৩৩৮), 'বালির বাঁধ' (১৩৪১) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব[১], শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়,[২] শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯১৬)[৩], শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (জন্ম ১৯০২)[৪], শ্রীযুক্ত কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৭)[৫], শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত[৬], শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায় (জন্ম ১৯১১)[৭], শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় (জন্ম ১৮৯০)[৮], ইলা দেবী[৯], শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৯)[১০], শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ (জন্ম ১৯১০)[১১], শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ (জন্ম ১৮৯৬)[১২], শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৯)[১৩], শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৮)[১৪], শ্রীযুক্ত গৌতম সেন[১৫], শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০২)[১৬] 'সম্বুদ্ধ'-ছদ্মনামা শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯১১)[১৭] ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

১ উপন্যাস—'যাদুঘর' (১৩৩৭), 'আকাশকুসুম' (১৩৪০)।

২ অনেক গল্প-উপন্যাসের লেখক।

৩ উপন্যাস—'অদৃশ্য সঙ্কেত' (১৩৪১), 'দু নৌকায়' (১৩৪৩) ইত্যাদি, গল্প—'প্রেম ও পাদুকা' (১৩৪৩), 'মিছে কথা' (১৩৪৬) ইত্যাদি; কবিতা—'সেতু' (১৩৪১), 'জীবনদ্বন্দ্ব' (১৩৫২), নাটক—'মহানির্বাণ' (১৩৫১)।

৪ গল্প—'ঝড়ের পরে' (১৩৩৬), 'সব মেয়েই সমান' (১৩৪০), উপন্যাস—'তচনচ' (১৩৪০)।

৫ গল্প—'শ্মশানে বসন্ত' (১৩৪৫), 'দ্বিতীয়া' (১৩৫০) ইত্যাদি।

৬ উপন্যাস—'বামুন বাগ্দী' (১৩৩২), 'রক্তের টান' (১৩৩৮), 'পিপাসা' (১৩৪৩) ইত্যাদি, গল্প—'কামিখ্যে ঠাকুর' (১৩৪৪)।

৭ গল্প—'পদ্মনাভ' (১৩৪১), 'তমসা' (১৩৫১), 'দৈনন্দিন'; উপন্যাস—'উদয়ের পথে' (১৩৫১), 'অন্যান্য' (১৩৫১) ইত্যাদি; প্রবন্ধ—'দৃষ্টিকোণ' (১৩৪৮)।

৮ উপন্যাস—'মানুষের মন' (১৩৪৪)। ৯ গল্প—'সপ্তক' (১৯৩৪), 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া' (১৯৩৯); উপন্যাস—'যে ঘরে হল না খেলা' (১৯৩৯)।

১০ উপন্যাস—'সূর্যোদয়' (১৩৪৫), 'অন্য নগর' (১৩৫৯) ইত্যাদি; গল্প—'রাহু' (১৩৫১), 'মনে মনে' (১৩৬১) ইত্যাদি; নাটক—'অধিনায়ক' (১৩৪৮); প্রবন্ধ—'মুখর লণ্ডন' (১৩৬১)।

১১ 'ফসিল' (১৩৪৮), 'পরশুরামের কুঠার' (১৩৪৯), 'শুক্লাভিসার' (১৩৫১) ইত্যাদি; উপন্যাস—'তিলাঞ্জলি' (১৩৫১), 'শতভিষা' (১৩৫৩) ইত্যাদি; প্রবন্ধ—'কাগজের নৌকা' (১৩৫৪) ইত্যাদি।

১২ ছদ্মনাম "ভাস্কর"। গল্প—'লেখা' (১৯৪০), 'শুভশ্রী' (১৯৪১), 'মজলিস' (১৯৪১) ইত্যাদি।

১৩ উপন্যাস—'স্বর্গ হইতে বিদায়' (১৩৪৭), 'একাকিনী নায়িকা' (১৩৫২) ইত্যাদি; গল্প—'নির্জন গৃহকোণে' (১৩৪৮), 'যথাপূর্বং' (১৩৫১), 'সেই মেয়েটি' (১৩৫৯) ইত্যাদি।

১৪ প্রবন্ধ—'মনের খেলা' (১৩৩৪), 'ঘরের মায়া' (১৩৪৩), 'অগ্রদূত' (১৩৪৪) ইত্যাদি। কবিতা—'সবহারাদের গান' (১৩৩৬)।

১৫ উপন্যাস—'প্রিয়া ও মানসী' (১৩৪৬), 'ধূসর ধরণী' (১৩৪৮), 'প্রিয়া ও জননী' (১৩৫২) ইত্যাদি; নাটক—'ডাক্তার' (১৩৫২)।

১৬ সরস গল্পচিত্র—'আনন্দবাজার'। ১৭ গল্পের বই—'ডায়ালেক্টিক' (১৯৪১)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ দশক

১

রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বোলশেভিক নীতি আগে কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল দেশে পোলিটিকাল অবস্থার অনিশ্চয়তা বাড়িয়াই চলিল। তাই মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার প্রতি তরুণ লেখকদের কেহ কেহ ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইংরেজের মিত্র হইল, তাই যুদ্ধের সময়ে কমিউনিজম্-প্রিয়তার একটা বাজারদর দাঁড়াইয়া গেল। চতুর্থ দশকের সাহিত্যের আলোচনায় এই কথা প্রথমে স্মর্তব্য।

প্রগতিবাদীদের উগ্রতা প্রায় ক্ষান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন নূতন করিয়া এক কাব্যশিল্প প্রবর্তনের দিকে ঝোঁক পড়িল কয়েকজন ইংরেজীনবীশ লেখকের। ইঁহাদের একজন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'পরিচয়' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯৩১)। উদ্দেশ্য নূতন ইংরেজী কবিতার এবং নূতন ইংরেজীর কবিদের গুরুস্থানীয় ফরাসী কবিদের রচনার পরিচয় দেওয়া এবং নূতন নূতন বিদেশী গ্রন্থের টাটকা টাটকা সংবাদ যোগানো বাঙ্গালী পাঠকের কাছে। (বলা বাহুল্য এই পাঠকের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ।) সেই সঙ্গে নূতন ইংরেজী কবিতার অনুকরণে নূতন বাঙ্গালা কবিতার পরিচয় দেওয়াও এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে পরিচয়ের স্থান সবুজপত্রের পরেই। তবে সবুজপত্রের আদর্শের সঙ্গে পরিচয়ের আদর্শের তফাৎ অনেকখানি। সবুজপত্র চাহিয়াছিল চিন্তাশক্তি জাগাইতে, বাক্‌শিল্পকে পরিমিত ও কার্যোপযুক্ত করিতে, অর্থাৎ যেন দেশীয় সাহিত্যশিল্পকে উন্নত এবং কালোপযুক্ত করিতে। পরিচয় চাহিল বিদেশী চশমা চোখে লাগাইয়া আমাদের ক্ষীণায়মান (—অবশ্য উদ্যোক্তাদের মতে—) সাহিত্যশিল্পদৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে।

পরিচয়ে আর যাই থাক প্রবল প্রোপ্যাগাণ্ডা ছিল না এবং যাহাকে বলে দলাদলি তাহাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হইতে কনিষ্ঠতম লেখক পর্যন্ত সকলেরই জন্য পরিচয়ের পাতা খোলা থাকিত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য পরিচয়ের পরিসর গভীর ও ব্যাপক করিয়াছিল॥

২

পরিচয়ে অনেকগুলি শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা এই প্রথম ধরিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নবীন প্রবীণ দুইই ছিলেন। এমন প্রবীণ নূতন লেখকের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে চারুচন্দ্র দত্তের নাম।[১] পরিচয়ে (১৩৩৮) 'পুরানো কথা' নামে চারুচন্দ্রের স্মৃতিকথা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। চারুচন্দ্র একেবারে মধুসূদনের ভাষায়) pucca fist লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। ছোট গল্প ও বড় গল্পে ইঁহার দক্ষতা প্রধানত রচনার সরল স্বাচ্ছন্দ্যে।

বিশিষ্ট নূতন লেখকদের অনেকেই কবিতার পথ ধরিয়াছিলেন। এ পথ কতকটা নূতন। ইঁহাদের লেখার আলোচনার পূর্বে ইঁহাদের প্রেরণার মূল উৎস যে "আধুনিক" ইংরেজী (ও ফরাসী) কবিতা তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন॥

৩

"আধুনিক" ইংরেজী কবিতা প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের বস্তু। তবে ইহার সূত্রপাত অনেক আগেই হইয়াছিল। বিজ্ঞানচিন্তা ইয়োরোপীয় সভ্য মানুষের যুক্তি-মননের যে পথ নির্দেশ করিল তাহাতে অধ্যাত্মচিন্তার স্থান দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল এবং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল যন্ত্রস্রষ্টা বিজ্ঞানী অথবা সাহিত্যস্রষ্টা মনীষী। পুরানো কবিদের কাছে মানবের (humanity) যে মর্যাদা ছিল আধুনিক কবি-মনীষীর কাছে এখন "ইতর" বা সাধারণ লোক (man in the street) সেই কদর পাইতে লাগিল। আর বিশ্বপ্রকৃতির স্থান লইল শহরের জনাকীর্ণ রাস্তা। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টি-চিন্তা ত্রই ত্রয়ী-বিশ্বে পরিসীমিত —স্বয়ং, "ইতর" লোক এবং জনাকীর্ণ শহরবাজার।

বিজ্ঞানবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাব ছাড়া আরও দুইটি উৎস আছে যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতার মূলে। একটি হইতেছে মনোবিকলন-পন্থার (psycho-analysis-এর) অনির্বিচার গ্রহণ, অপরটি হইতেছে যুদ্ধোত্তর কালে মানুষের জীবনযাত্রায় সঙ্কট ও জীবনভাবনায় বিপর্যয়। মনোবিকলন আশ্রয় করিলে প্রচলিত নীতি-আদর্শে আস্থা রাখা যায় না। সাহিত্যিকও তাই পুঁথিগত আদর্শ ও বাহিরের ঘটনাসংঘর্ষ

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

ছাড়িয়া দিয়া হাত বাড়াইলেন মনের আবর্তে। বুঝিলেন সাহিত্যের পরিচিত সরনি পরিত্যাগ না করিলে এদিকে ঝুঁকিয়া পড়া অসম্ভব। যুদ্ধের পর দেখা গেল অভিজাত-জীবনের ভঙ্গুরতা। ধনীরা ক্ষয়িষ্ণু, মধ্যবিত্তেরা অসচ্ছল ও অস্বচ্ছন্দ। ধর্মের আদর্শ চুরমার, সভ্যতার পালিশ অনুজ্জ্বল। সর্বোপরি রাশিয়ায় বোলশেভিক বিদ্রোহ। এই সব কারণ মিলিয়া ইউরোপীয় শিক্ষিত মানুষের সুদৃঢ় সমাজ-আস্থায় মর্মান্তিক আঘাত হানিল।

আধুনিক ইউরোপীয় কবিতায় সাহিত্যচিন্তার এই যে মৌলিক ছক্‌পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাহা আকস্মিক নয়। ইহার আয়োজন শুরু হইয়াছিল আগে হইতেই। কবি ম্যালার্মেকে (Mallarmé) এই সাহিত্যিকদের আদিগুরু এবং কবি-ঔপন্যাসিক প্রুস্ত্‌কে (Proust) এই সাহিত্যিকদের মহাগুরু বলা হয়। এই দলে ইংরেজ কবি ডি এইচ লরেন্স্‌কেও ধরা যায়। তাহার পর আমেরিকান এজরা পাউণ্ড। সর্বশেষে টি এস্ এলিয়ট, জেম্স্ জয়েস্, উইণ্ডহাম্ লুইস ইত্যাদি।

যুদ্ধোত্তর "নবীন" কবিতার প্রথম বিশিষ্টতম রচনা এলিয়টের *The Waste Land* (১৯২২)। এই কবিতায় এলিয়ট নূতন দৃগ্‌ভঙ্গি লইয়া নূতন টেক্‌নিক অবলম্বন করিলেন। এলিয়টের মতে কাব্যকৃতিতে প্রবৃত্ত হইতে গেলে ঐতিহাসিক অনুভূতি ও স্মৃতি থাকা আবশ্যক। শিক্ষাও যথাসম্ভব গভীর ও ব্যাপক হওয়া চাই। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সাহিত্যকে সমকালীন ও সমভূমিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। এইসব কারণে নূতন কবিতা লেখা সাধারণ শিক্ষিতের এবং তরুণবয়স্কের পক্ষে দুর্ঘট। নূতন কবিতার সমজদার পাঠকেরও এইসব যোগ্যতা থাকা চাই নতুবা সে কবিতার আবেদন ব্যর্থ হইবে। সুতরাং নূতন কবিতার পাঠকের সংখ্যাও সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য।

নূতন কবিতালেখকেরা ধরিয়া লইলেন যে তাঁহাদের কবিতার উদ্দেশ্য কবির ইমোশনের অভিব্যক্তির দ্বারা ততটা নয় যতটা অননুভূতপূর্ব নূতন ইমোশনের অনুরণনের দ্বারা রস সৃষ্টি করা। পরিচিত কবিতার বহু-অনুসৃত সরণিতে নূতন ইমোশনের—যে ইমোশন অননুভূত ও অভাবিত—তাহার উদ্বোধন করা সম্ভব নয়। বহুলালিত কাব্যশিল্পে পুরাতন ব্যঞ্জনার রেশ থাকিয়াই যায়। আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক স্থিতিভূমিহীন আধুনিক সভ্যমানবের কথা ভাবিলে কবির মনে স্বাভাবিক ভাবেই তখন জঞ্জালভূমিতে পরিত্যক্ত খালি টিনের কৌটার কথা মনে আসে। এ নবীন ইমোশন পুরাতন কাব্যের ভাষায় "অন্তঃসারশূন্য, শূন্যগর্ভ" বলিলে জাগিবে না।

তাই কবি বলিলেন—"ফাঁপা মানুষ" (The Hollow Men)। অর্থাৎ, ভিতরে ধারকতা নাই, বাহিরের চাকচিক্য ঠিক আছে এবং আঘাত করিলে বাজেও। নূতন কবি চাহিলেন কাব্যশিল্পে এমন বাক্‌রীতি এমন অলঙ্কার ব্যবহার করিতে যাহার নিজস্ব অর্থ ও রূপ গ্রহণীয় নয় কিন্তু যাহা আলজেব্রার অক্ষর-সংখ্যার মত কবির উদ্দিষ্ট বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়া বিশেষ ও অত্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ইমোশন নির্ব্যক্তিকভাবে জাগানো। এলিয়টের মতে নূতন কবিতা ইমোশনের ঝরনা খুলিয়া দেয় না ইমোশন হইতে তফাৎ রাখে, নূতন কবিতায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নাই, আছে ব্যক্তিত্ব হইতে অপসরণ।

নূতন কবিতার এক বিশেষ টেকনিক হইল কবিতায় বিভিন্ন ভাবরূপচিত্র (image) অখণ্ড একটি চিত্রে মিলাইয়া না দিয়া তাহা অসংশ্লিষ্টভাবে জুড়িয়া দেওয়া। এইজন্য এই ধরণের কবিদের বলা হয় 'ইমেজিষ্ট'। অসংশ্লিষ্ট ভাবরূপগুলি পাঠকের মনে পর্যায়বদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া অথবা বিশ্লিষ্ট থাকিয়াই, ইউরোপীয় সঙ্গীতের সিম্‌ফনির মত, অনির্বচনীয় অখণ্ড রস সৃষ্টি করিবে। স্থূল উপমা দিয়া বলিতে গেলে ইমেজিস্‌ট কবি সেই ময়রার মত যে ছানা চিনি ভিয়ান না করিয়া ছানা ও চিনি অমিশ্রিত রাখিয়া কাঁচাগোল্লা বলিয়া জোগান দেয়। ভোক্তার রসনায় তাহার স্বাদ নিশ্চয়ই ভিয়ান করা সন্দেশ হইতে স্বতন্ত্র। আরও একটি উপমা দিতে পারা যায়। ইমেজিষ্ট কবিতা যেন jigshaw puzzle এবং সে puzzle-এর সমাধান কবির মনে; যদি পাঠক কবির মনে মন মিলাইয়া বুঝিতে পারেন তবেই তিনি কবিতার মর্ম বুঝিবেন।

ইংরেজীতে প্রথম এবং প্রধান ইমেজিষ্ট কবি হইতেছেন (দুইজনেই আসলে আমেরিকান) এজরা পাউণ্ড (Ezra Loomis Pound; জন্ম ১৮৮৫) ও টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot; জন্ম ১৮৮৮)। ইঁহাদের কাব্যশিল্পের মূল সূত্র হইল তিনটি। প্রথমত, কাব্যের বিষয় ও বস্তু যাহাই হউক তাহাকে কবি-মানসের ভাবরসে না জারাইয়া অথবা কন্‌ভেন্‌সনের পোষাক না পরাইয়া সোজাসুজি ব্যক্ত বা প্রতিফলিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কবির অন্তরে যে অবোধপূর্ব জ্ঞাতসারতা তাহা বাহিরের অনুভূতির উত্তেজনায় যে প্রতীক-চিত্ররূপ পায় তাহাই অব্যাপন্নভাবে পাঠকের মনে জাগাইয়া দেওয়াই নূতন কবিতার কাজ। দ্বিতীয়ত, ভাবরূপচিত্রের প্রতিফলন যাহাতে যথাযথ হইতে পারে সেই জন্য শব্দের ব্যবহারে সংযত ও সতর্ক হইতে হইবে। অতএব ইমেজিষ্ট

কবিকে সন্তর্পণে শব্দ বাছিয়া লইতে হইবে মুখের ও লেখার ভাষা হইতে এবং সে শব্দ এমন ভাবে বাছিয়া লইতে হইবে যাহাতে কবি যাহা বলিতে চাহেন তাহার অতিরিক্ত কিছু না বোঝায়। এইজন্য প্রচলিত কাব্যের শব্দ ও প্রয়োগ কবিকে বর্জন করিতে হইবে কেননা যে সব শব্দ ও প্রয়োগ বহু কবির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া অনেক রকম তাৎপর্য (nuance) জড়ো করিয়াছে। ছন্দোমাধুর্যের মোহও এই কারণে পরিত্যাজ্য। আমাদের কান গতানুগতিক ছন্দে অভ্যস্ত বলিয়া সেই ছন্দের রেশ কবির ঈপ্‌সিত অর্থ ক্ষুন্ন করিতে পারে। তৃতীয়ত, সুললিত সুছাঁদ ছন্দ ছাড়িয়া দিয়া অসম বা তালকাটা ছন্দ অবলম্বন করিতে হইবে। ইমেজিষ্ট কবির ছন্দের ইউনিট মাত্রা বা অক্ষর নয়, বাক্যাংশ,—অর্থাৎ তাহা গদ্যের ছন্দের মত হইবে।

অতএব নূতন কবিতা সকলের জন্য নয়, অধিকাংশের জন্যও নয়, অতি অল্পসংখ্যকের জন্য। নূতন কবিরাও বোধ করি তাহাই চান। এ কবিতা টেক্‌নিকাল সুতরাং সে কবিতার বোদ্ধার সংখ্যাও অল্প হইতে বাধ্য। এমন কবিতা-কোডের চাবি যাঁহার কাছে আছে তিনি ছাড়া কেহই মর্মজ্ঞ নন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাবি কবির হাতেই রহিয়া যায়।

নূতন ইংরেজী কবিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্মরণীয়।[১]

> আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও এ'কে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ ক'রে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণী রূপে। দুই একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বল্‌লে অন্যায় হবে।··· তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন, যে-তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ।

১ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা, পরিচয়ে (মাঘ ১৩৪১) প্রকাশিত।

নূতন কবিতায় ক্ষণিকতার লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট। এ কবিতার সমর্থকেরাও ইহাকে transitional poetry বলিয়া স্বীকার করেন॥

৪

নূতন ইংরেজী কবিতার অনুসরণে যাঁহারা বাঙ্গালায় কবিতাকর্ম অবলম্বন করিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। জীবনানন্দের শিক্ষালাভ প্রথমে বরিশালে শেষে কলিকাতায়। ইংরেজীতে এম্-এ পাশ করিয়া জীবনানন্দ কলিকাতার একটি বড় বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২২)। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে তাঁহার কোন কোন কবিতার ভাব সুরুচির গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করায় তাঁহার কর্মচ্যুতি হয় (১৯২৮)। অতঃপর দিল্লীতে এক বছর এবং বরিশালে কয়েক বছর (১৯৩৫-৪৮) অধ্যাপনা করেন। তাহার পর কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এক বছর খড়্গপুর কলেজে (১৯৫১-৫২), কিছুদিন বড়িশা কলেজে (১৯৫৩), তাহার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন।

জীবনানন্দ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মঘরের ছেলে। তাঁহার পিতামাতার প্রভাব তাঁহার জীবনের গতি অনেক অংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মাতা কুসুমকুমারীর কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। তাঁহার কয়েকটি কবিতা কলিকাতার বামাবোধিনী পত্রিকায় এবং বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী'তে বাহির হইয়াছিল। সাহিত্যপ্রীতি এবং *কবিতারচনার প্রেরণা প্রথমত তিনি মায়ের কাছেই পাইয়াছিলেন।* কখন হইতে জীবনানন্দ কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন তাহা জানি না তবে ১৯২৫ হইতে তাঁহার কবিতা প্রবাসী বঙ্গবাণী কল্লোল কালি-কলম বিজলী ধূপছায়া প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইতে থাকে।[১] ১৯২৭ সালে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' বাহির হয়। ইহাতে পঁয়ত্রিশটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঝরা-পালকের অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন প্রয়াস নাই, এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব অনেক কবিতায় অত্যন্ত প্রকট। কিছু উদাহরণ দিই।

[১] মাসিকপত্রে প্রথমপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতা, যেমন 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' (শ্রাবণ ১৩৩২), 'বিবেকানন্দ' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২), 'হিন্দু-মুসলমান' (আষাঢ় ১৩৩৩), 'ভারতবর্ষ' (শ্রাবণ ১৩৩৩), 'রামদাস' (ভাদ্র ১৩৩৩), 'নিবেদন' (কার্তিক ১৩৩৩) ইত্যাদি।

ওরে কিশোর, বেঘোর ঘুমের বেহুঁস হাওয়া ঠেলে'
পাত্‌লা পাখা দিলি রে তোর দূর-দুরাশায় মেলে' !
ফেনার বৌয়ের নোন্‌তা মৌয়ের—মদের গেলাস লুটে'
ভোর সাগরের শরাবখানায়—মুসল্লাতে জুটে'
হিমের ঘুণে বেড়াস্ খুনের আগুনদানা জ্বেলে' ![১]

মরুভূর প্রেত চমকিয়া তার চক্ষের পানে চায়,—
সুরার তালাসে চুমুক দিল কে গরলের পেয়ালায় ![২]
এ কোন্ বাঁশী সার্সি বাজায়
এ কোন হাওয়া ফর্দ্দা
দেয় কাঁপিয়ে পর্দ্দা ![৩]

সে কোন্ ছুড়ির চুড়ি আকাশ-শুড়িখানায় বাজে ![৪]

ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা,—আর্য্যাবর্ত্ত ভাঙি,
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি' !
নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা ![৫]

ঝরা পালকে উপেক্ষিত একটি কবিতায়[৬] (নাম 'পলাতক') দ্বিতীয়-তৃতীয় দশাব্দসুলভ পল্লী-রোমান্‌সের—অর্থাৎ করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন কালিদাস-শরৎচন্দ্র প্রভৃতির অনুশীলিত—ছবি পাই। ইতিহাসের খাতিরে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

পাড়ার মাঝারে সব চেয়ে সেই কুঁদুলী মেয়েটি কই !
কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের,—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
কই কই বালা আজিকে তোমার পাইনা কেন গো টের !

তোমার নখের আঁচড় আজিকে লুকায়ে যায়নি বুকে,
কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে !
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকা-শুকে
তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে !

কই বালা কই !—প্রণাম দিলে না !—মাথায় নিলে না ধূলি !
—বহুদিন পরে এসেছি আবার বনতুলসীর দেশে !
কুটিরের পথে ফুটিয়া রয়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি,—
উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে !

১ 'সাগর-বলাকা'। ২ 'মরীচিকার পিছে'। ৩ 'ছায়া-প্রিয়া'।
৪ 'বনের চাতক—মনের চাতক'। ৫ 'হিন্দু-মুসলমান'।
৬ প্রবাসী মাঘ ১৩৩৪। রচনাকাল জানা নাই।

ঝরা-পালকের কটি কবিতায় জীবনানন্দের বিশিষ্ট ভাবনার আভাস অথবা ঈষৎপ্রকাশ আছে।[১] সে নিজস্বতা পরবর্তী কালের কবিতায় প্রস্ফুট হইয়াছে। এই বিশেষত্বের একটা দিক সুদূর ইতিহাস-অভিসার। নজরুলের মত তাঁহাকেও মিশর-তাতার টানিয়াছে।[২]

দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন যক্ষপ্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন্—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড্-তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে' উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মন-ভুলানিয়া পথচাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না,—ঘোর চোখে অলসনয়নে![৩]

বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে—মিশর-'অসুর' কুয়াশা কালে।[৪]

অস্তচাঁদের মায়ায় কবিকল্পনায় রোমান্সের দেশে অতীত স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরে। অবশেষে যাহার দেখা মেলে সে "সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুখভরা আঁখি" জীবনদেবতা নয়, সে কবিহৃদয়ের হতাশা—মৃত্যুপিশাচী।

মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে,—
তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে' উড়ে'!
মেঘের বুরুজ ভেঙে' অস্তচাঁদ দিয়েছিল উঁকি,
সে কোন বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী!...
সাপিনীর মত বাঁকা আঙ্‌লে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁসা,—হিম স্তন,—হিম রোমকূপ![৫]

কবিতাটির নাম রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র। ভাবে 'সিন্ধুপারে'র প্রতিবাদ। জীবনানন্দের কাছে জীবনের তাৎপর্য রবীন্দ্র-ভাবনার বিপরীত। "রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্য" তাঁহার উদ্যমের এই প্রথম অভিব্যক্তি।[৬]

জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি বিশিষ্ট এবং উদ্ভট উপমা ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার দেখা যায়। যেমন,—প্রেত চাঁদ, বুনো হাঁস, ভিজে মাঠ, কুয়াশা, ঘাসের বুক। ঝরা-পালকের কয়েকটি কবিতায় এই সব উপমার আভাস লক্ষ্য করা যায়।

[১] যেমন, 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'আলেয়া', 'অস্তচাঁদে', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', 'কবি', 'সিন্ধু', 'সেদিন এ ধরণীর', 'সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়' ইত্যাদি। [২] তুলনীয় 'মিশর', 'পিরামিড', 'মরুবালু' ইত্যাদি। [৩] 'অস্তচাঁদে'।
[৪] 'চাঁদিনীতে'। [৫] 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল'।
[৬] 'একদিন খুঁজেছিনু যারে', 'অস্তচাঁদে' ও 'কবি' দ্রষ্টব্য।

জীবনানন্দের কবিতা পরে যে কোন্ বাঁক লইবে তাহারও ইঙ্গিত কয়েকটি কবিতায় লভ্য। যেমন,

একদিন খুঁজেছিনু যারে
বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি-আঁধারে,
মালতীলতার বনে,—কদমের তলে,
নিঝুম ঘুমের ঘাটে,—কেয়াফুল—শেফালীর দলে!
—যাহারে খুঁজিয়াছিনু মাঠে মাঠে শরতের ভোরে
হেমন্তের হিমঘাসে যাহারে খুঁজিয়াছিনু ঝর' ঝর'
কামিনীর ব্যথার শিয়রে,
যার লাগি ছুটে গেছি নির্দ্দয় মহুদ চীনা তাতারের দলে,
আর্ত্ত কোলাহলে
তুলিয়াছি দিকে দিকে ব্যথা বিঘ্ন ভয়,—
আজ মনে হয়
পৃথিবীর সাঁজদীপে তার হাতে কোনো দিন জ্বলে নাই শিখা![1]

—যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোম্‌টা তুলে' প্রেত-চাঁদে সচকিতে ওঠে শিহরিয়া!
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে জন্মে ফিরে' ফিরে' ফিরে'
মাঠে ঘাটে একা একা,—বুনো হাঁস—জোনাকীর ভিড়ে![2]

সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিল্‌মিল্ শিশিরের জলে,...
হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে'
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে'! ...
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায়!
হয়ত দেখেছ তারে ভুতুড়ে দীপের চোখে মাঝ রাতে দেয়ালের পরে
নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়ায় তার সুর যেন ঝরে!...
বালুঘটিটির বুকে ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি গান যবে বাজে
রাতবিরেতের মাঠে হাটে সে যে আলসে,—অকাজে! ...
তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভাসে,
মনের হরিণী তার ঘুরে মরে হাহাকারে বনের বাতাসে![3]

জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম 'ঝরা পালক'এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। মারা বা মরা বুনো হাঁসের ঝরা পালক—অনেকটা বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ক্রৌঞ্চের মতই—জীবনানন্দের কাব্যপ্রেরণায় যেন বিশেষ উদ্দীপনা

১ 'একদিন খুঁজেছিনু যারে'। ২ 'অস্তচাঁদে'। ৩ 'কবি'।

।[১] মারা (বা মরা) হাঁসের (বা বকের) ঝরা পালক জীবনানন্দের কাব্যশিল্পের বোধকরি মুখ্যতম সিম্বল্ (ইহাকে কবিমানবের অব্‌সেশনও বলা যায়)।
ঝরা-পালকের প্রথম কবিতা 'আমি কবি—সেই কবি' ; প্রথমেই পাই

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি !

'সিন্ধু' কবিতায়

মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,—ঝরা পাতা,—পূবালির হাহা !
কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা !

'চাঁদিনীতে'

হয়ত সেদিনও মাণিকজোড়ের মরা পাখিটির ঠিকানা মেগে'
অসীম আকাশে ঘুরেছে পাখিনী ছট্‌ফট্ দুটি পাথার বেগে।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬)[২] একটি কবিতা ('পাখিরা') কল্লোলে, একটি কবিতা ('ক্যাম্পে') পরিচয়ে এবং অনেকগুলি কবিতা প্রগতিতে বাহির হইয়াছিল। ধূসর-পাণ্ডুলিপির কবিতায় জীবনানন্দ স্পষ্টভাবে ইমেজিষ্ট কাব্যশিল্পের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কবিমানসের ব্যর্থতাবোধ (frustration) যেন বেদনাকাতরতায় (morbidity) পরিণত হইতে চলিয়াছে। নিজের মুড্‌কে কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপ ও ভাবরূপ দিয়া এবং এ চিত্র ও ভাবরূপ কবিমানসে যেমন অসংলগ্ন অথচ সমস্থায়ী (coexistent) কবিতায়ও তেমনি অসংপৃক্ত রূপে প্রকটিত। এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনার শব্দকে অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করিয়া কবি আপনার নিগূঢ় অনুভূতিকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্যই ইংরেজীর অনুকরণ আছে, এবং তাহা সর্বদা বিসদৃশ না হইলেও প্রায়ই মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। "নরম জলের গন্ধ" ; "বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ" ; "হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ" ; "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চীল" ; "চারিদিকে পিরামিড্,—কাফনের ঘ্রাণ" ; "শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের" ; "পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ" ; "ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা" ; "সোনালি চীল" (golden eagle) ; ইত্যাদি।

[১] বাল্যকালের কোন ঘটনায় বা দুর্ঘটনায় ইহার জড় থাকিতে পারে।

[২] কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫৭) পনেরটি অপ্রকাশিত কবিতা যুক্ত হইয়াছে।

শব্দের বহু-আম্রেড়িত ব্যবহারও নূতন ইংরেজী কবিতা হইতে গৃহীত কৌশল। যেমন,

> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে—
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল ; আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?[১]

জীবনানন্দের কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা—জীবনের অচরিতার্থতার ব্যর্থতার ক্লান্তির অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ। মরা চাঁদের আলোর, হিমের কুয়াশা রাতের, পৌষের শস্যরিক্ত মাঠের চিত্ররূপ তাই তাহার কবিতায় পুনরাবৃত্ত। ধূসর-পাণ্ডুলিপি নামেও এই ইঙ্গিত।

> পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
> নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
> শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে ;
> নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি
> উড়ে গেল কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
>
> তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?
> অন্ধকারে হাতড়ায়ে ধীরে ধীরে দেশলাই খুঁজি ;
> যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?
> কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
> শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা,
> এ ধূসর পাণ্ডুলিপি এক দিন দেখেছিল, আহা,
> সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।[২]

কোন মিল না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের "ধূসরজীবনের গোধূলিতে" গানটি এখানে মনে পড়ে।

জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্ররূপময় বলিয়াছিলেন। ইহাতেই ধূসর-পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ এবং বিশিষ্ট কবিতাগুলির রস জমিয়াছে। যেমন,

> দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
> হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,[৩]

১ 'আদিম দেবতারা' নামে প্রথমপ্রকাশিত (কবিতা আষাঢ় ১৩৪৪)।

২ 'স্বপ্ন' নামে প্রথমপ্রকাশিত (কবিতা পৌষ-ফাল্গুন ১৩৪৩)।

৩ প্রথমপ্রকাশিত পাঠ 'শুক্‌নো গুঁড়ির পরে চৈত্রের দুপুরে বেজী করিয়াছে খেলা'।

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা,[১]
নির্জন মাছের চোখে ;[২] পুকুরের পারে[৩] হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ[৪]—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,[৫]
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,[৬]
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,[৭]
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ,[৮]

(প্রথম প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে ধূসর-পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তিত কোন কোন পাঠ মিলাইয়া লইলে জীবানন্দের কাব্যকৌশল যে সজ্ঞানভাবে নূতন ইংরেজী কবিতার অনুসরণ করিতেছে তাহা সহজে বোঝা যায়।) সন্ধ্যার ও রাত্রির অন্ধকারে শীতের দিনে নির্জন পল্লী পরিবেশের নিজ্ঝুম অবসন্নতার প্রশান্ত পরিমণ্ডল ফুটিয়া উঠিয়াছে এই চিত্র পরম্পরায়। এই অবসন্নতার মধ্যেও গোপনে প্রাণের চাঞ্চল্য যে একেবারে অনুপস্থিত নয় তাহার দ্যোতনা রহিয়াছে ইঁদুরের খুদচুরিতে আর নোনার রসপরিণামে।

'ক্যাম্পে'[৯] ধূসর-পাণ্ডুলিপির বিশিষ্ট কবিতাগুলির অন্যতম। এটি জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে বোধকরি সব চেয়ে notorious অর্থাৎ বহুনিন্দিত ॥

৬

ধূসর-পাণ্ডুলিপির পর কবির জীবৎকালে আর চারিখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল,—'বনলতা সেন' (পরিবর্ধিত দ্বি-স ১৯৫২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) এবং 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪)। 'বনলতা সেন'এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩২-৪৬। নামকবিতাটি জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম। যুগযুগান্তের পথচারীর

১ ঐ 'চাল-ধোঁয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু'বেলা'।
২ ঐ 'শামুকগুগ্‌লি ভরা'। ৩ ঐ 'পাড়ে'। ৪ ঐ 'শুনেছে ঘরের ডাক'।
৫ ঐ 'দেখেছি ভোরের আলো খেজুর গুঁড়ির পরে দোয়েলেরে ডাকে'।
৬ ঐ 'চড়ুয়ের ডিমগুলো মুখ গুঁজে আছে'। ৭ ঐ 'মাগে'।
৮ প্রথমপ্রকাশ 'মৃত্যুর আগে' নামে (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৩)।
৯ প্রথমপ্রকাশ পরিচয়ে (মাঘ ১৩৩৮)।

শ্রান্তি ক্লান্তি ও ক্ষুধাতৃষ্ণা বিনোদনের নীড়বিধায়িনীর সিম্বল বনলতা সেন আরও একটি ছোট কবিতায় দেখা দিয়াছে ('হাজার বছর শুধু খেলা করে')।[১]

'শঙ্খমালা'য়[২] শ্রীযুক্ত অজিত (কুমার) দত্তের 'পাতালকন্যা'র বিপরীত চিত্র। এখানে নারীই অভিসারিণী, এবং সে প্রেতিনী যেন।

কড়ির মত শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ,
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়।

'আট বছর আগের একদিন'[৩] একটি বিশিষ্ট রচনা। বাহির-জীবনে সুখশান্তি থাকিতে পারে কিন্তু অন্তরে যে অশান্তি অব্যক্ত অতৃপ্তি জাগাইতে থাকে তাহার তাড়না এড়ানো দায়।

অর্থ নয়, কীর্তি নয়—স্বচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;

জীবন শাশ্বত, অলঙ্ঘনীয় এবং উদাসীন। কবিচিত্তের তিক্ততা সেই জন্য।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক্ দু'একটা ইঁদুর এবার—'

'সাতটি তারার তিমির'এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩৫-৫০ সাল। শেষকালের কবিতাগুলিতে ভাষায় খানিকটা মুদ্রাদোষের মত দেখা যায়।

বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেক্‌জান্দ্রিয়ায়
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত ,
তারাও সৈকত।[৪]

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রধানত সঙ্কলন। তবে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা আর কোন বইয়ে সঙ্কলিত হয় নাই।

[১] প্রথমে 'মহাপৃথিবী'তে পরে দ্বিতীয় সংস্করণ 'বনলতা সেনএ সঙ্কলিত'।
[২] প্রথমে 'মহাপৃথিবী'তে পরে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সঙ্কলিত।
[৩] ঐ প্রথমপ্রকাশ কবিতা চৈত্র ১৩৪৪। [৪] 'নাবিক'।

'রূপসী বাংলা' নাম দিয়া কতকগুলি অপ্রকাশিত চতুর্দশপদী কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫৭) কবির ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাস। ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনিই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ আকারে রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।"

রূপসী-বাংলার কবিতাগুলিতে শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে, অক্ষুব্ধ স্তব্ধ জীবনের সঙ্গে কবিহৃদয়ের স্থর মিলিয়া গিয়াছে।

চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ,
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল ;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

নিজ জীবনের বঞ্চনার ক্ষোভ আজ দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া কবিভাবনায় স্নিগ্ধকারুণ্যের আভা দিয়াছে।

কোনো দিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাই নি দিন মাস, বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল।

৭

জীবনানন্দের কাব্যপ্রেরণার মূলে প্রকৃতিপ্রীতি। যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনে কবি শৈশব ও প্রথম যৌবন কাটাইয়াছিলেন তাহার প্রভাব তাঁহার চিত্তে অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রবিষ্ট। গোবিন্দচন্দ্র দাসের পর জীবনানন্দই একমাত্র কবি যাঁহার রচনায় পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের রূপ ও রস পাওয়া যায়। তবে জীবনানন্দের অবলম্বিত বিশিষ্ট শিল্পকৌশলে সে প্রাকৃতিক আবেষ্টন শেষ অবধি কতকগুলি যেন সিম্বলের অন্তর্ভুক্ত। "হিজল", "বেতের ফল", "নোনা", "ঝিরিঝিরি গান করা নদী" শেষে হইল "ধানসিড়ি"।[১] ঝরা পালক ও মরা হাঁসের উল্লেখ আগেই করিয়াছি।

[১] এই নাম বা শব্দটি শেষের দিকের রচনায় বহুব্যবহৃত। উপর আসামে অনেক নদীর নামের শেষাংশ 'সিরি' ('সুবনসিরি' ইত্যাদি)। এই সঙ্গে ধানশ্রী রাগিণীর নাম, 'ধান' ও 'শ্রী' শব্দের ব্যঞ্জনা এবং 'সিঁড়ি' শব্দের উচ্চাবচতা ও বক্রতা—ইত্যাদি মিলাইয়া বোধ করি শব্দটির সৃষ্টি।

ব্যক্তি-নামের (নায়িকার নামের) ব্যবহারও সিম্বলিক প্রয়োগের মধ্যে পড়ে। এ যেন পুরানো সাহিত্যের "রাধা"র স্থানীয়। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "বনলতা সেন"। অল্প আগে লেখা একটি কবিতায় মিলিয়াছিল "অশ্রুকণা সান্ন্যাল"।

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অশ্রুকণা সান্ন্যালের মুখ,[১]
'মনে আছে?' সুধাল সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'[২]

পল্লী-পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াই নহে, পূর্ব হইতেই জীবনানন্দের কবিতা শহরের মানুষ-প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। ইহার তিনটি হেতু। প্রথমত কলিকাতা বাস, দ্বিতীয়ত নূতন ইংরেজী কবিতার দিকে ঝোঁক, তৃতীয়ত রবীন্দ্র-রীতি হইতে অপসরণ প্রচেষ্টা। জীবনানন্দ পরে নিজেই সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রাপসরণ-প্রয়াসের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা' এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবিকাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।[৩]

নিজের এবং অপরের লেখা বাঙ্গালা "নূতন" কবিতার পক্ষে জীবনানন্দের এই সাফাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে সত্য কতখানি এবং প্রোপাগ্যাণ্ডা কতখানি। মনে রাখিতে হইবে, জীবনানন্দের কবিতার প্রথম এবং প্রধান পোষক যে 'প্রগতি' পত্রিকা তাহার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ হইতে আগাইয়া যাওয়া অর্থাৎ রবীন্দ্র-রীতি সবলে অস্বীকার। (আশা করি এখানে ভালোমন্দের প্রশ্ন কেহ তুলিবেন না।)

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব সার্বভৌমিকতা, তাঁহার সময়স্বভাব সার্বকালিকতা। অর্থাৎ জগৎ ও জীবনকে সময়ের দৃষ্টিতে দেখিলেও তাঁহার জগৎ ও জীবন-ভাবনা স্বভাবতই আনন্দের উপলব্ধিতে সার্বভৌমিকতা ও সার্বকালিকতা পাইয়া শিল্পে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ সার্বিকতা সমকালবিচ্ছিন্ন নহে, মানুষের কোন সাধনা, প্রাণের কোন সিদ্ধি সমকালবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু খানিকটা কালবিচ্ছিন্ন না হইলে কোন সিদ্ধি মৌহূর্তিকতা অতিক্রম করে না। জীবনানন্দ বলিয়াছেন,

১ প্রথমপ্রকাশ 'বুনো হাঁস' নামে (কবিতা আষাঢ় ১৩৪৩)।

২ প্রথম প্রকাশ 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' নামে (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৩)।

৩ 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্যে' নামে ব্রজমোহন কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথমপ্রকাশিত এবং 'কবিতার কথা'য় (১৯৫৬) সঙ্কলিত।

> আধুনিক অনেক কবির কবিতা—যা উক্তির স্মরণীয়তার জন্য বিখ্যাত তা' কিন্তু [রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত] মহাকালের উৎসঙ্গে লুটিয়ে নেই, তা' বিশেষ ক'রে আজকের জন্যই—এমন প্রগাঢ়ভাবে আজকের জন্য যে সমসাময়িক কালকে যদি অতীত ও আনন্ত্যের থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি তা' হলে সেই সময়ের জন্য অন্ততঃ দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক যুগের আবশ্যিক বাঙ্গালী-কবি এরাই রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর ঐতিহ্যপথিক শিষ্যেরা নন।

জীবনানন্দ এখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে তাঁহারাই "আধুনিক যুগের আবশ্যিক বাঙ্গালী-কবি", অর্থাৎ তাঁহাদের রচনাতেই আধুনিক যুগের (অর্থাৎ ইংরেজী নূতন কবিতা-ফ্যাশানের ?) সাহিত্যিক আবেদন এবং পূর্ব (পূর্বাপর নয়) রীতি হইতে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহা বর্তমান সময়ের "আবশ্যিক" (genuine) কবিতা। কবি এখানে প্রচারক হইয়াছেন, অতএব বিতর্ক নিরর্থক। জীবনানন্দ দাবি করিয়াছেন যে তাঁহারা "সমসাময়িক কালকে অতীত ও আনন্ত্যের [অতীতের নিরবচ্ছিন্নতাই আনন্ত্য] থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ক'রে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে" দেখিয়াছেন। এখানে জীবনানন্দ আধুনিক ইংরেজী কবিতার সমর্থকদের দাবিরই পুনরুক্তি করিয়াছেন অস্পষ্ট ভাবে। আধুনিক ইংরেজী কবি সমসাময়িক কালকে অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, দেখিয়াছেন যুগপৎ (simultaneously) অতীত ও উপস্থিতকে সমভূমিতে। ইহা অতীতকে অস্বীকার নয় অতীতকে বর্তমানের সহযোগী করা (অতীত সাহিত্যকে বর্তমান সাহিত্যের সমকালে ও সমভূমিতে দেখা)।

জীবনানন্দ প্রাণপণে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তিনি যেন আদ্যন্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'এর ভাবানুপ্রাণিত।[১] সত্য কথা বলিতে কি ধূসর-পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতায়ই যেন সন্ধ্যাসঙ্গীতের অস্ফুট অনভিব্যক্ত, অন্তর্ব্যাপ্ত আবেগ বহন করিতেছে। মনে হয় বাল্যে এবং কৈশোরে সন্ধ্যাসঙ্গীত জীবনানন্দকে অত্যন্ত আবিষ্ট করিয়াছিল। সে আবেশ না কাটিয়া পরে তাহার কবিতাকে নিজের পথে পরিচালিত করিয়াছে। হয়ত এই পরিচালনা সম্ভাবিত হইয়াছিল কোন নিদারুণ দুর্ঘটনায় অথবা নিতান্ত হতাশায় (ফ্রাষ্ট্রেশনে)। তাই

১ বিশেষভাবে তুলনীয়,
"শত শত মৃত তারকার মৃতদেহ রয়েছে শয়ান" ('তারকার আত্মহত্যা'—সন্ধ্যাসঙ্গীত) :
"যে নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত" ('নির্জন স্বাক্ষর'—ধূসর-পাণ্ডুলিপি)।
"পারিনে শুনিতে আর, একই গান। এক্-ই গান!" ('হৃদয়ের প্রতিধ্বনি'—সন্ধ্যাসঙ্গীত) :
"সে কেন জলের মত ঘুরে' ঘুরে একা কথা কয়!" ('বোধ'—ধূসর-পাণ্ডুলিপি)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আনন্দের সৌরকরোজ্জ্বলতা জীবনানন্দের কবিতায় প্রতিহত। অধিকন্তু ইহা তাঁহার কবিচিত্তকে মর্বিড করিয়াছিল এবং সেই মর্বিডিটি তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত। ক্ষয় ও মৃত্যুর প্রায় সব রকম দিক জীবনানন্দের কবি-মানসে বিভীষিকা ও জুগুপ্সার সঞ্চার না করিয়া নিশ্চয়ই খানিকটা আনন্দের ইঙ্গিত করিত। না হইলে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। হয়ত কেন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে খানিকটা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্বীক্ষার অনুসরণ ছিল, যে অন্বীক্ষা জগৎ ও জীবনের সমস্ত ফাঁক ও জোড়াতালি বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন করিয়া অসূর্য গভীরতায় নামিয়া যাইতে চায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে জীবনানন্দের কবিতায় ফুল নাই,[১] এবং কবিপ্রসিদ্ধ বসন্তের স্থানে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন শরৎশেষ। অবশ্য শেষের ব্যাপার বিলাতি কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ ছাড়া কিছু নয় কেননা আমাদের দেশে সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে গাছের পাতা হলদে হইয়া ঝরিয়া পড়ে না।

হয়ত খুব সচেতন ভাবে নয়, তবুও জীবনানন্দ তাঁহার কবিতাকর্মে রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত পথে চলিতে চাহিয়াছেন। সিম্বলের ব্যবহারে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের শস্যরিক্ত শূন্য মাঠে ম্লান বাঁকা চাঁদ যেন মরণাভিসারের প্রেত সাক্ষী; জীবনের ক্ষুধার প্রতীক ইঁদুর; ঘাসের কদর কোমলতার ও খাদ্যত্বের জন্য; পেঁচা মহাকাল;[২] সৌন্দর্যের অন্তস্তলে শাদা হাড়ের কঙ্কাল; কবিদেহ যেন ফসল কাস্তের অপেক্ষায়; প্রেমের স্বাদ তিক্ততা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেখানে পড়ে সেখানে আলো সৌন্দর্য; জীবনানন্দের দৃষ্টিরতি অন্ধকারে কুৎসিতে (কুঁজ, গলগণ্ড, পচা চালকুমড়া, মরা ঘাস)। রবীন্দ্রনাথের বলাকা অনন্তের যাত্রী, জীবনানন্দের বুনো হাঁস শিকারের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মনের হরিণ নির্বন্ধন আনন্দের উদ্দামতা, জীবনানন্দের বনের হরিণ ঘাই-হরিণীর মোহবদ্ধ বলি। রবীন্দ্রনাথের ঘাস নবনবায়মান চিরন্তন প্রাণপ্রবাহের প্রতীক, জীবনানন্দের ঘাস পশুদের মত উপভোগের (munching and wallowing) প্রতীক। রবীন্দ্রনাথে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রধান, জীবনানন্দে রসনা॥

৮

জীবনানন্দ দাশ অনেকটা অন্তরের দাগিদেই "নূতন কবিতা"র পথ ধরিয়াছিলেন।

১ ধূসর-পাণ্ডুলিপির পরে মাঝে মাঝে কবিচিত্তের কুয়াশা কাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়ের দৈবাৎ কোন কবিতায় ফুল দেখা দিয়াছে। যেমন "সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্র মল্লিকার রাত্রি ভালো" ('সুদর্শনা'—'বনলতা সেন')।

২ "চিল পুরুষ"ও ('বনলতা সেন' পৃ ১২) মহাকাল, তবে দক্ষিণমুখ।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯) কিন্তু গোড়া হইতেই আটঘাট বাঁধিয়া সে পথে নামিয়াছিলেন। গন্তব্য দিশা একরকম হইলেও দুইজনের পদচারণ সমান্তরাল নয়। জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতিতে হৃদয়াবেগের ও অনুভবের উত্তেজনা স্বভাবতই প্রবল। বিষ্ণুবাবুর কবিপ্রকৃতি অতি কঠিন বিদ্যাপথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিয়টের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুকৃত। যেমন,

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকিছে বরাভয়।
আশ্লেষে তব অন্তবিহীন ক্রতোকৃতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্তমরণে জয়। ...

অপাপবিদ্ধ বুদ্ধি আমার অস্নাবির।
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার মোর নর্মাচার।
প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।[১]

ব্রাহ্মণ-উপনিষদের মন্ত্র "ওঁ ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর" হইতে 'ক্রতোকৃতম্' নেওয়া। 'অপাপবিদ্ধ' এবং 'অস্নাবির' উপনিষদে ব্রহ্মের নেতিবাচক বর্ণনায় আছে।

বিষ্ণুবাবুর প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২)। লেখকের কবিতা যে কোন পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার নির্দেশ ইহাতে আছে। দ্বিতীয় বই 'চোরাবালি' (১৯৩৮) পরিচয়-সম্পাদক কবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সম্বলিত। ইহাতে একুশটি কবিতা আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রগতিতে এবং বিষ্ণুবাবুর একটি পরিচিততম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' পরিচয়ে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় বই 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), চতুর্থ 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), পঞ্চম 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), ষষ্ঠ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০)। 'সন্দীপের চর'এর কবিতাগুলি যুদ্ধমধ্যে ও যুদ্ধোত্তর কালে রচিত। তখন বিষ্ণুবাবু পুরোপুরি মার্ক্‌স্-লেনিনবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকগুলি কবিতায় তাহার পরিচয় স্পষ্ট।

'সমুদ্র স্বাধীন' একটি বিশিষ্ট কবিতা। ছন্দঃস্পন্দ কখনো সম কখনো বিষম। ছেদচিহ্নের ব্যবহার-অব্যবহারে বিশেষত্ব আছে। যেমন,

চুড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল উর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগর সঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে,

[১] প্রথমপ্রকাশ 'মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল' নামে (কবিতায় আশ্বিন ১৩৪৩)।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'—রবীন্দ্রনাথ হইতে নেওয়া। নামটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপান্ত্য কবিতায় এবং 'বহুবড়বা'য়।

কিম্বা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি সুরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ পায়
কানাড়া কিম্বা মেঘমল্লারে বা মালকোশের লম্বিত বাহুতে

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ ঃ

চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে।

অধিকাংশ কবিতায় লেখকের রাজনীতিক মতের ও তির্যক ব্যঙ্গ দৃষ্টির প্রকাশ। যেমন সাহিত্যগুরু এলিয়টের প্রতি কটাক্ষ ('লর্ড এলিঅট অফ দি ওএস্টল্যাণ্ড')।

পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব ভমে লাট—কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ?
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট
ওএস্টল্যাণ্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ?
তাই তো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক্, নয় মহাশয়।[১]

নির্বাধ স্বচ্ছন্দ কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য '২২শে শ্রাবণ', 'ত্রিপদী', 'যম-ও নেয় না', 'অথচ সহজ খুঁজি', ইত্যাদি। শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'।

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায় ...
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায় ...
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা ...
রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, ...
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারি আনন্দভৈরবী॥

৯

পরিচয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (জন্ম ১৯০১) পূর্ব হইতে কবিতা লেখার অভ্যাস কিছু কিছু ছিল। ১৯৩০ সালে তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'তন্বী' বাহির হয়। নূতন ধরণের কবিতা লেখায় ইনি প্রবৃত্ত হইলেন 'পরিচয়' বাহির করিবার পর। ইঁহার মৌলিক কবিতাগ্রন্থ এই কয়খানি—'অর্কেষ্ট্রা' (১৯৩৫,

১ 'তিনটি ছোট কবিতা'।

পরিবর্তিত দ্বি-স ১৯৫৪),[১] 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩) ও 'দশমী' (১৯৫৬)।

'সংবর্ত'এর ভূমিকায় সুধীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,

> ম্যালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অম্বিষ্ট ; আমিও মানি কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য।

ম্যালার্মের প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ সুধীন্দ্রবাবুর রচনায় কতটা প্রতিফলিত তাহা বলিতে পারি না। তবে ম্যালার্মের সহধর্মী ও অনুগামী প্রুস্ত (Proust) সুধীন্দ্রবাবুর প্রত্যক্ষ আদর্শ বলিয়া মনে করি। সুধীন্দ্রবাবুর কবিতার তত্ত্বাংশে প্রুস্তের নীতিরই পুনরুক্তি,—আত্মার আসল অস্তিত্ব অস্বীকার, বুদ্ধির উপর আস্থা-হীনতা, প্রেমের অবাস্তবতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রবলভাবে স্বীকার। তবুও মানুষের জীবনে ইন্দ্রিয়-অনুভূতির ফাঁকে ফাঁকে দৈবাৎ চকিতে এমন প্রতীতি চমক দেয় যাহাতে "বৈনাশিক কাল" (প্রুস্তের le temps perdu) এবং তৎনির্ভর সমস্ত বোধ লুপ্ত হইয়া অনাদ্যন্ত "দৈব" অনুভব জাগে। আর তখনই আসে আধ্যাত্মিক মুক্তি আসে যখন মানুষ এই মহাকালে (প্রুস্তের le temps retrouve) পৌঁছায়। সুধীন্দ্রবাবুও প্রুস্তের মত জীবনের ফুটোফাটা জোড়াতালি—(দৈন্য-দারিদ্র্য, পীড়া-বেদনা, পাপ-অপরাধ, ধ্বংস-বিস্মৃতি)—বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া মহাকালে জীবনের তাৎপর্য খুঁজিয়াছেন এবং ফলে প্রধানত পাইয়াছেন আত্মগ্লানি।

সুধীন্দ্রবাবুর রচনাকৌশলেও প্রুস্তের নীতি অনুসৃত। প্রুস্তের মতে শব্দের প্রকৃতি সুরের মত, সুরের পরম্পরায় যেমন সঙ্গীত সৃষ্ট হয় শব্দের পরম্পরায় তেমনি অর্থ ও ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হয়। তবে নূতন ব্যঞ্জনার জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টি আবশ্যক নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়, পুরানো অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই কাজ চলে। সুধীন্দ্রবাবুর কবিতায় কখনো কখনো এবং গদ্যে সর্বদা অপ্রচলিত, কঠিন, আভিধানিক শব্দ আকীর্ণ।

এই প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকারান্তরে যেন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি নজরে পড়ে। কালিদাসের প্রসন্ন কবিতার পরে "কঠিন" কবিতার দিন আসিয়াছিল একদা আমাদের দেশে। তাহার ফলে ভারবি-মাঘের প্রতিষ্ঠা, যাঁহাদের কবিতায় দুরূহতম সাধনা একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর বা চতুরক্ষর শ্লোক রচনা। যেমন,

[১] নামকবিতাটিতে সুধীন্দ্রবাবুর বিশিষ্টতার প্রথম প্রকাশ। এটি শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যা পরিচয়ে প্রথম বাহির হইয়াছিল।

চারচুঞ্চুশ্চিরারেচী চঞ্চচ্চীররুচা রুচঃ।
চচার রুচিরশ্চারু চারৈচরচারচঞ্চুরঃ॥ [১]

অমুচ্ছিষ্টপদন্যাসা হইলেও এসব রচনা কবিতা নয়। তবে সুধীন্দ্রবাবুর রচনা কবিতা নিশ্চয়ই॥

১০

প্রচণ্ড ব্যর্থতাবোধ 'ক্রন্দসী'র বিশিষ্ট কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। জীবনের উদ্দিষ্ট আনন্দ বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দিষ্ট ব্রহ্ম আছে কি না এ বিষয়ে কবিমানসে সংশয় যথেষ্ট, কিন্তু তাহাতে জীবনের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির দিকে মুখ ফিরিতে চায়।

এই নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকৃতি ?
হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ? …

হায় ক্ষেমঙ্কর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে ?

পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া অবরুদ্ধ যৌবনের হতাশা সাধারণ জীবনের মূঢ় সন্তুষ্টির প্রতি ধিক্কার জাগায়।

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস। …
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জোষ্টদের তৈলসিক্ত মেদ,
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃ-পিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে। [৩]

'উত্তরফাল্গুনী'তে কবিচিত্ত ধাতস্থ হইয়াছে। প্রেম জাগিয়াছে, আশাও। এ পরিবর্তন হইয়াছে আনন্দবাদে ঈশ্বর-বিশ্বাসে নয় (!), কালের বৈনাশিকত্বে (—অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গবাদে—) আস্থায়। অর্থাৎ কবিচিত্তে যেন রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার

[১] কিরাতার্জুনীয় ১৫-৩৮। [২] 'প্রশ্ন' ('ক্রন্দসী')। [৩] 'প্রার্থনা' (ক্রন্দসী)।

মত এক মূড আসিয়াছে। ক্ষণিকার সঙ্গে অত্যন্ত পার্থক্য চিত্তের প্রশান্তিহীনতায়। ক্ষণিকার মূড ভূতভবিষ্যৎ-নিরাসক্ত বর্তমান-জীবীর, সুধীন্দ্রবাবুর এ মূড ভূত-ভাবনায় জর্জর ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাকুল বর্তমান-ভোগীর।

প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে॥[১]

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্‌গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির॥[২]

শেষ কবিতা 'প্রতিপদ' কঠিন শব্দ ও বিষম অন্বয় অঙ্কুল। যেমন,

প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ;
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে,
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ!
নির্বাণ সর্বতোভদ্র; প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে।—অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বাগত॥

'সংবর্ত'এর কবিতাগুলির মধ্যে সাতটি পুরানো রচনার (১৯২৪-২৮) পরিমার্জিত রূপ, বাকিগুলির রচনাকাল ১৯৩৮ হইতে ১৯৫৩ সাল। যুদ্ধ, রাজনীতি এবং দেশবিদেশের অশান্তি ও অব্যবস্থা কবিচিত্তকে সংশয়ারূঢ়, ঈষৎতিক্ত এবং কিঞ্চিৎ নিরাশাচ্ছন্ন করিয়াছে।

নিরর্থক

পূষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক
হিরন্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে,
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস। ...
অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী;
রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্‌স্কি, হিট্‌লারের সুহৃদ স্টালিন্‌,
মৃত স্পেন্‌, ম্রিয়মান চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেচে আছে কিনা
তা সুদ্ধ জানি না॥[৩]

১ 'প্রতিদান' (উত্তরফাল্গুনী)। ২ 'জাগরণ' (ঐ)।
৩ 'সংবর্ত' (সংবর্ত)। রচনাকাল সেপ্টেম্বর ১৯৪০।

'যযাতি' কবিতায় লেখক র‍্যাঁবোর (Rimbaud) সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিয়া বলিতেছেন,

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে , বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে ।[১]

উপরি-উক্ত মনুষ্যধর্মে আস্থাহীনতা ইত্যাদি মনে হয় নিতান্ত সাময়িক মুড, যখন 'উন্মার্গ'এর মত কবিতা পড়ি ।

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে ;
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে ।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি ,
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি ,
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
আমার উপক্রমে ;
মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে ॥[২]

'দশমী'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৪-৫৬ সাল। কবিতার নামগুলি তাৎর্যপূর্ণ,—'প্রতীক্ষা', 'নৌকাডুবি', 'ভ্রষ্টতরী', 'নষ্ট নীড়' ইত্যাদি। কবি নিজেকে ক্ষণভঙ্গবাদী বলিতেছেন,

আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জের, সে-সংসারও । অথচ সময় ভূত
থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয় , এবং যদি বা
তার সাক্ষ্য থাকে অস্ত্রে কি নাড়ীতে, তবু সে-নিভৃতে
হৃদয়বানের মতো, বুভুক্ষুও নিষিদ্ধপ্রবেশ ।[৩]

বর্তমান-ক্ষণের অবস্থা,

নৌকা অচল, মাঝি
বিকল, সম্প্রতি তাই ধ্যানে দিগ্বিজয়ী সে, আজ অভিজ্ঞানে
স্বয়ংবরের মাল্য পরায় শকুন্তলা তাকে ; কিংবা ঢাকে

১ রচনাকাল ১৮ মার্চ ১৯৪৩। ২ রচনাকাল ১৪ এপ্রিল ১৯৫৩। ৩ 'উপস্থাপন'।

ক্রন্দসী সংবর্তে আবার, ফুরায় কলি আদিম অন্ধকারে,
আগামী কাল বিবাবশেষ ক্ষিপ্ত পারাবারে ভেসে ওঠে।
তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক ; ভূষণ্ডী কাক রক্তপঙ্ক খোঁটে ॥[১]

তাহা হইলে উপায় ? আগেই বলা হইয়াছে,

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক :
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা ;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক ॥

অথচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে
হবে স্বাভাবিক ॥[২]

সুধীন্দ্রবাবুর সাহিত্যিক গদ্য তাঁহার কঠিন পদ্যের অপেক্ষা কম কঠিন নয়। প্রমাণ মিলিবে 'স্বগত'এর (১৯৩৮)[৩] প্রবন্ধগুলিতে। প্রবন্ধগুলিতে এইসব লেখকের আলোচনা আছে—ডি এইচ্ লরেন্স্, ভার্জিনিয়া উল্ফ্, উইলিয়ম ফক্নার, গর্কি, বার্নাড শ, লীটন ষ্ট্র্যাচি, উইণ্ডহ্যাম লুইস্, এজরা পাউণ্ড, টি এস্ এলিয়ট, উইলিয়াম বাট্লার ইয়েট্স্, জেরাল্ড্ ম্যান্লি হপ্কিন্স্, রবীন্দ্রনাথ। কয়েকটি বাঙ্গালা বইয়ের সমালোচনা ও অন্য প্রবন্ধও আছে ॥

১১

শ্রীযুক্ত সমর সেন (জন্ম ১৯১৬) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার[৪] সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। এই বয়ঃকনিষ্ঠ কবির রচনা প্রথম হইতে 'কবিতা'য় বহুমানিত হইয়াছিল। নগর-জীবনের নোংরামি ও ক্লান্তি সমরবাবুর কবিতায় বারবার প্রতিধ্বনিত, সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার শান্ত পরিবেশের মাধুর্যও। সুধীন্দ্রবাবুর মত ইঁহারও মধ্যবিত্ত-জীবনের প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা, তবে সমরবাবুর তিক্ততা ঝাঁঝালো এবং তাহার একটা কারণ মার্ক্স্বাদের দিকে ঝোঁক। কবিতাগুলি সাধারণত স্বল্পকায় গদ্যকবিতা। ছন্দঃস্পন্দ ও মিল এড়াইবার চেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ছন্দের অনুসরণ সুব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছত্রের যথেষ্ট ব্যবহার আছে এলিয়টের ধরণে।

১ 'প্রত্যুত্তর'।
২ 'নৌকাডুবি'।
৩ দ্বিতীয় সংস্করণে।
৪ প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪১।

সমরবাবুর কবিতার সংখ্যা খুবই পরিমিত। ইহার কবিতার বইগুলিও সবই নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়,—'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২) ও 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)।

নিপীড়িত যৌবনের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বৃথাই কবি 'মুক্তি' খুঁজিতেছেন উজ্জ্বল বসন্তে,

একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে,
কতোদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আর একজনের শরীর-সর্ব্বস্ব আলিঙ্গন,
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম!

ডাস্টবিনের সামনে
মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে,
এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নামবে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত!
আর কোনোদিন কি মুছে যাবে
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম!

—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।[১]

রবীন্দ্রনাথের লেখা উপাদানের মত ব্যবহার করার একটি ভালো নিদর্শন 'মৃত্যু' চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্র লিপিকা ('সন্ধ্যা ও প্রভাত') অবলম্বনে।

ধূসর পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ী,
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়

সূর্য্য অস্ত গেল, সূর্য্যদেব কোন দেশে—
এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো,
গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,
হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধূলোর ঝড়,
এখানে সন্ধ্যা নাম্‌লো শীতের শকুনের মতো।[২]

[১] কয়েকটি কবিতা। [২] ঐ।

'গ্রহণ'এর কতকগুলি কবিতা কিছু দীর্ঘতর। এখানে দৃষ্টি আরো তির্যক্। মধ্যবিত্ত সমাজ সভ্যতা ধর্মবোধের এষ্টিমেট,

প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্ব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো,
প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।

উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,
শিকারী কীট সোনার ধানে।
তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি :
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নাই।[১]

'নানাকথা'র একটি বিশিষ্ট কবিতা 'পরিস্থিতি'।

এপ্রিলে যে সংগ্রাম সুরু, এ্যাসেম্ব্লি হলে হবে শেষ,
এ হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝল্‌মল্ করে অনেক পার্টির চিত্ত। ...

যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।[২]

'তিন পুরুষ'এর কোন কোন কবিতায় মিল অবলম্বিত হইয়াছে। সমরবাবুর রাজনীতিক মত এখন স্পষ্টতর ভাবে অভিব্যক্ত।

ঘুণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।[৩]

রবীন্দ্রনাথকে মার্ক্‌সিস্ট কবি এইভাবে দেখিয়াছেন,

গুরুদেব জানতেন কবি অমৃতের দূত।
তাই তাঁর নাট্যে সঙ্কট সময়ে হঠাৎ অদ্ভুত
বহুরূপী ঠাকুর্দাকে দেখি, কিম্বা কবিকে।

[১] 'For Thine is the Kingdom'.
[২] রচনাকাল "জাতীয় প্রার্থনা দিবস, ৫.৫. '৪০"। [৩] 'গৃহস্থবিলাপ' পাঁচ।

আধ্যাত্মিক মুস্কিল আশান্ তারা করে।
তার পর জল পড়ে, পাতা নড়ে। তার পর
সত্য শিব ও সুন্দর।

সেই তুলনায় নিজেদেরও পরিচয় দিতেছেন,

আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্ক্সিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে; গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী? তফাৎ এই:
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন,
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে তাই আমার বিশ্বাস।[১]

সমরবাবু আলোচ্য সময়ের একমাত্র কবি যিনি অদ্যাপি গদ্যে পদচারণা করেন নাই॥

১২

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯০১) ধাত ও মন পরিপূর্ণভাবে কবির। তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রসার যেমন বিস্তৃত তাহার কবিতার বিষয়ও তেমনি বিচিত্র। সাময়িক ইতিহাসকে ইনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই এবং কোন পোলিটিক্যাল বা সাহিত্যিক বিশ্বাসের দ্বারাও পরিচালিত হন নাই। অমিয়বাবু বিদ্যাবান্ কস্মোপলিটান কবি কিন্তু তাঁহার মনের শিকড় বাঙ্গালাদেশের মাটির তলায় নিহিত এবং কখনো তাহাতে টান পড়ে নাই।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা, খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি—বাংলা ভাষায় গাঁথা—চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয়॥[২]

গান শুনচি রবীন্দ্রনাথের সকালে
বাতায়নে বাঁশিতে—
বাতাসে পর্দা উড়চে॥[৩]

১ 'সাফাই' চার।
২ 'সমাবর্ত' (পালা-বদল)।
৩ 'একটি গান শোনা' (পারাবার)।

অমিয়বাবুর কবিতায় জীবনের যেন চলচ্চিত্র উঠিয়াছে। সে চলচ্চিত্রে রেলের জানালা দিয়ে দেখার সঙ্গে মনের ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে। তাই আপাত অসংলগ্নতার (inconsequence) ভিতরে নিগূঢ় সংলগ্নতা অনুস্যূত। ষ্টাইলে অনেক সময় ইঁহার কবিতা রীতিঅসমর্থিত (unconventional) বলিয়া মনে হয়। তবে এ ব্যাপারের সঙ্গে ইঁহার সমসাময়িক কোন কোন কবির রীতি-অসমর্থনের প্রভেদ আছে। অমিয়বাবুর লেখায় বাঙ্গালা শব্দের ও বাক্‌রীতির প্রতিলোম ব্যবহার নাই। যেখানে শব্দ বা ইডিয়ম স্থষ্টি করিয়াছেন সেখানেও ভাষার ধাত স্বীকৃত। ছড়ার ছন্দ তাই প্রয়োজন মত আপনিই আসিয়া গিয়াছে।

ভরা সকাল
ঝাঁঝাঁ দুপুর, ঝিঁঝিঁ সন্ধ্যো, ঘুঁটে-পোড়ানো।
সংসারে জড়ানো
মাঠের কাজ, কাজের অনুবর্তী
পূর্ণিমার চাঁদ, নিঃঝুম রাত, দূরে ডাক্‌চে শেয়াল।
গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালি, কীর্তন, দেউল, মুর্সিদ্দার বাড়ি
ওপারে যাব কেমনে ?
(চিরদিন বাইলাম মনে গো)
হাটের ধারে ঘাটের নাও ; লণ্ঠন-ঝোলানো গোরুর গাড়ি
ছায়ায় ছায়া আঁকি' চলে।[১]

দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি
… ছেঁড়া চটি পরে চ'লে যাই
আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত যে পুরোনো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দী পাঠ, একতারা বাজা
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের,[২]

সাম্প্রতিক কোন কবিকে যদি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী বলিতেই হয়—যদিও এমন কথার আসলে কোন মানে নাই—তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠসঙ্গলব্ধ অমিয়বাবু॥

১৩

অমিয়বাবু অনেকদিন হইতে কবিতা লিখিতেছেন, তবে গোড়ার দিকে খুব

[১] 'প্রবাসী' (মাটির দেয়াল)। [২] 'সংলাপ' (পালা-বদল)।

মন দিয়া নহে। ১৩৩০ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে ইঁহার একটি সনেট ('নেশা') বাহির হইয়াছিল। ইঁহার কবিতার বই এই কয়খানি—'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২, দ্বি-স ১৯৪৩), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩)[১], 'পারাপার' (১৯৫৩)[২] এবং 'পালা-বদল' (১৯৫৫)[৩]।

অমিয়বাবুর কবিতার আরো কিছু পরিচয় দিই।

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার আরম্ভে বাউলের ঢঙ বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে।

> মনরে আমার মন কোন্ সাধনার ধন,
>   হাড়ের বাক্সে।
> তাতে প্রকাণ্ড একখানা গড়ের মাঠ
>   আস্ত মনুমেণ্ট, আজগুবি বাড়িঘর যাদুঘর—থাক্ সে।
> অনেক শেল্‌ফ পাঠ্যপুস্তক, নোটসহ
>   দিগন্তে বদ্ধ পরীক্ষা-ঘরের কবাট,
> পালানোর ট্রেন-ভরা শিয়ালদহ—[৪]

'সংগতি' কবিতাটি যখন সাময়িক-পত্রিকায় প্রথম বাহির হয় তখন এটি লইয়া বহু হাসাহাসি হইয়াছিল এবং বোধ করি এখনো হয়। কিন্তু এটি খুব ভালো কবিতা।

> মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
> যারা সরে যায় তারা শুধু—লোকগুলো,
>   কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
>   যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
> কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
>   মেলাবেন।
> দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
> স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
> সমাজধর্মে আছি ধর্মেতে আঁটা,
> ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
>   মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥[৫]

১ কবিতাগুলি এই কয় শীর্ষকে বিভক্ত—'প্রাথমিক', 'প্রদক্ষিণ', 'সূর্যখণ্ডিত ছায়া', 'মন-মাধ্যাহ্নিক', 'সংসার' ও 'দিনযাপন'।

২ কবিতাগুলি এই চারি ভাগে বিভক্ত—'ছড়ানো মার্কিনি', 'ভারতী', 'য়ুরোপা' ও 'দুই তীর'।

৩ কবিতাগুলি তিনভাগে ভাগ করা—'এক', 'দুই', 'তিন'।

৪ 'মাটির দেয়াল'।

৫ 'অভিজ্ঞান বসন্ত'।

'আটপৌরে' "ছেড়া উড়ো প্রাণের ইতিহাস",

আকাশ চাদরটা ময়লা জেটির একটানা কালো কয়লা,
মুরনবীর মাস পয়লা
অত্যন্ত ঘটা করে নয় ট্যাকে পয়সা গোটা ছয়
গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে
ফুটবল দেখে, ডোরা-কাটা গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্চে, জোরে।
চানাচুর একপয়সা মুখে পোরে।[১]

'রাত্রিযাপন'এ গভীর ইমোশনের অদ্ভুত প্রকাশ।

বুকে প্রাণটা এম্‌নিই রইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গলে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়াল অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমুবোনকে হারাই।[২]

'ফ্রাইবুর্গের পথে' কবিতায় মনগোচরতার বাহিরে প্রাণগোচরতার পরিচয়।

তরুণীর চোখে সুখ বিদেশী যাত্রীকে খেতে দিতে,
ভাই যেন এল পৃথিবীতে,
কিসের ব্যঞ্জনা পথে ঘাটে—
এর মানে কিছু বুঝব না।
এতোদিন আছি বেঁচে কিছুই জানিনি, তবু শেষে
প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে জেনেছি সমস্ত প্রাণ মেশে।[৩]

'চিরদিন' অত্যন্ত সহজ আর অত্যন্ত মধুর কবিতা।

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে জলের আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।[৪]

[১] ঐ। [২] 'অভিজ্ঞান বসন্ত'। [৩] 'পারাপার'। [৪] ঐ।

১৪

ভালো কবিতা কমবেশি আরো অনেকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছি। যতদূর জানি ইঁহার প্রথম গদ্য রচনা শরৎচন্দ্রের নারীর-মূল্যের প্রশংসাময় আলোচনা। ইহা ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। অন্নদাশঙ্করবাবুর জন্ম উড়িষ্যায়, সুতরাং উড়িয়া ইঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। গোড়ার দিকে ইনি বাঙ্গালা ও উড়িয়া দুই ভাষাতেই গদ্য পদ্য লিখিতেন, তবে বরাবরই প্রধান ঝোঁক বাঙ্গালার দিকে। অন্নদাশঙ্করের প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯, দ্বি-স ১৯৩০)। তাহার পর বাহির হইয়াছে 'বসন্ত' (১৯৩২), 'কালের শাসন' (১৯৩৩), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (১৯৩৪) ও 'নূতনা রাধা' (১৯৪৩)। অতঃপর দুইখানি ছড়ার বই বাহির হইয়াছে—'উড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২, তৃ-স ১৯৫৩) ও 'রাঙা ধানের খৈ' (১৯৫০)। শেষের দিকে ছড়ার ছাঁদে ও ভাবে কবিতারচনায় অন্নদাশঙ্করবাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

রাখীর কবিতাসংখ্যা তেত্রিশ। "এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৭-২৯ ও রচনাস্থল ইউরোপ। পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের সংকেত অনুসারে স্থলে স্থলে পরিবর্তিত হয়।" আশেপাশের প্রকৃতি এবং নারীপ্রেম কবিতাগুলির প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকাংশ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মকৃশ, বিশেষ করিয়া ছন্দে। ক্ষণিকার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পথের প্রেমই কবিকে পাইয়া বসিয়াছে।

> আকাশে আকাশে পাশাপাশি
> এই ঢের ভালোবাসাবাসি।

প্রথম কবিতাতেই পাই নূতন পারিপার্শ্বিকে নূতন জীবনে পুরাতন প্রেমের বিসর্জন ও নূতন প্রেমের আবাহন। এ নূতন প্রেম বন্ধনহীন। পথিক কোথাও হৃদয় বাঁধা রাখিতে প্রস্তুত নয়, সবই সাময়িক রাখীবন্ধন।

> ওই যে প্রপাত
> বাঁধিয়াছে আকাশের অবনীর হাত
> সেও মোর প্রিয়।
> আঁখিতে বাঁধিয়া দিল কিসের রাখী ও ?

প্রকৃতির টান নাড়ীর নয়।

> এবার এসেছি নরলোকে। এও ভাল।
> প্রকৃতি ভুলায়েছিল মানব দুলালো।

আমি মানবের কবি। এই তো আমার
আপনার দেশ।

কিন্তু মানবও কবির মনগড়া বস্তু।

নূতনা-রাধায় অর্ধেক কবিতা পুরাতন অর্থাৎ পূর্বপ্রকাশিত, অর্ধেক নূতন অর্থাৎ অপ্রকাশিত। কবিতাগুলি এই নয় শীর্ষকে সাজানো—'প্রথম স্বাক্ষর' (তিনটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৫-২৭), 'রাখী' (পনেরোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৭-২৯), 'একটি বসন্ত' ("জয়্‌সৃকে", বারোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (সাতটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯), 'কালের শাসন' ("জয়্‌সৃকে"; বারোটি কবিতা, রচনাকাল ১৯২৯-৩০), 'লিপি' (দশটি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩০-৩১), 'নীড়' (দশটি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩১-৩৩), 'জার্নাল' (বাইশটি খুব ছোট কবিতা, রচনাকাল ১৯৩৩?) এবং 'ক্রীড়ো' (ছয়টি কবিতা, রচনাকাল ১৯৩০-৩৪)। শেষ চারি শীর্ষকের কবিতাগুলি ভারতবর্ষে ফিরিবার পরে লেখা।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস (জন্ম ১৯০০) গদ্যে ও পদ্যে ব্যঙ্গরচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।[১] গম্ভীর কবিতারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কিছু পরে। ইঁহার ব্যঙ্গ কবিতার বই 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (১৯২৯), 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৯৩১), 'বঙ্গরণভূমে' (১৯৩১) ইত্যাদি। গম্ভীর কবিতার বই—'রাজহংস' (১৯৩৫), 'আলো আঁধারি' (১৯৩৬), 'পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৪২) ইত্যাদি। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি প্রায় সবই শনিবারের-চিঠিতে বাহির হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মনীশ ঘটক (জন্ম ১৯০১) "যুবনাশ্ব" এই ছদ্মনামে লিখিতেন। কল্লোলের একজন উৎসাহী লেখক ছিলেন ইনি।[২] মনীশ বাবুর একমাত্র কবিতার বই 'শিলালিপি'র (১৯৩৯) অধিকাংশ কবিতা প্রবাসী পরিচয় কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। সবই প্রেমের কবিতা। ভাব একটু উষ্ণ। যেমন,

হলা পিয়সহি,
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষাপণ
বধির বাসব হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ-পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল।[৩]

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য। [২] পূর্বে দ্রষ্টব্য। [৩] 'পরমা'।

অধুনা পণ্ডিচেরী-বাসী এবং শুধু নিশিকান্ত নামধারী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়-চৌধুরী (জন্ম ১৯০৯) কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কবিতা-রচয়িতারূপে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বিচিত্রার পৃষ্ঠায়। বিচিত্রায় (অগ্রহায়ণ মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৮) 'টুকরি' নামে যে চমৎকার টুকরা কবিতাগুলি ইঁহার স্বাক্ষরে বাহির হইয়াছিল তাহা পুনর্মুদ্রিত বা সংকলিত হয় নাই। রচনায় রবীন্দ্রনাথেরও হাত ছিল বলিয়া মনে করি। সেইজন্যই কি ভাগের দায়ে পড়িয়া কবিতাগুলি মাঠে মারা যাইতেছে? দুইটি টুকরি উদ্ধৃত করিতেছি।

কর-কমল

রসে ভরা যেন আঙ্গুর তোমার আঙুল কটি।
করতলে কচি গাবের পাতার গোলাপী আভা!
ঐ হাতখানি মোর হাতে তুলে ধ'রে
দিবে কি গণিতে করকোষ্ঠীর ফল?

আকাশের চাঁদ

মনের ভিতরে রাখা তো সহজ
স্বপ্ন আসন পেতে।
খড়ের চালাতে রাখ্‌বো কোথাব ওকে!
কলেজের ক্লাসে হয়েছিল দুটো কথা
সে কথার শেষ গাজনতলার
এঁদো পুকুরের পাড়ে।

নিশিকান্তের বড় কবিতা প্রবাসী পরিচয় কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ইঁহার কবিতার বই তিন-চারিখানি, তাহার মধ্যে প্রথম 'অলকানন্দা' (১৯৩৯)।

'পূর্বাশা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯০৯) গল্প ও উপন্যাস লিখিলেও ইঁহার মুখ্য পরিচয় কবি বলিয়া।[১] ইঁহার কবিতার বই—'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৬), 'পৃথিবী' (১৯৩৯), 'যৌবনোত্তর' (১৯৪৬), 'প্রেম ও অপ্রেম', 'প্রাচীন প্রাচী' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী (জন্ম ১৯০৪) দুইখানি কবিতাগ্রন্থের লেখক—'দীপান্বিতা' (১৯২৮) ও 'তীর্থপথে' (১৯৩২)। অনেক কবিতা সংকলনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। কল্লোলে ইঁহার কবিতা বাহির হইয়াছিল।[২]

১ সঞ্জয়বাবুর অগ্রজ অজয় ভট্টাচার্য কয়েকটি ভালো গান রচনা করিয়াছিলেন।

২ যেমন ১৩৩৪ সালে 'অ-ধরা', 'মৈত্রেয়ী', 'লতাময়ী উর্বশী' ও 'লীলাকমল'। কল্লোলের শেষ সংখ্যায়ও (পৌষ ১৩৩৬) ইঁহার একটি কবিতা ছিল।

শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৬) গদ্য পদ্য দুই বন্ধেই অভ্যস্ত। তবে পদ্যের তুলনায় গদ্যে—বিশেষ করিয়া ব্যক্তিচিন্তাময় প্রবন্ধে—তাঁহার নিপুণতা অসাধারণ। ইনি অদ্যাবধি চারিখানি ছোট ছোট কবিতার বই বাহির করিয়াছেন —'সংক্রান্তি' (১৯৩৭), 'সঞ্চারী' (১৯৪১), 'চন্দ্রকলা' (১৯৪৩) ও 'সম্ভবা' (১৯৫৩)।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪) কবিতাকর্মে বেশিদিন ব্যাপৃত রহেন নাই। ইঁহার কবিতার বই—'বিপ্লবী নায়িকা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩১) ও 'শতাব্দীর সঙ্গীত' (১৯৩১) ইত্যাদি। সর্বসমেত কবিতার সংখ্যা উনতিরিশ। রচনাকাল ১৯২৫-৩১। শতাব্দীর সঙ্গীত "আমার পদ্মাপারের বন্ধুদিগকে" উৎসর্গিত।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র (জন্ম ১৯১৭) চারিখানি চটি কবিতার বই বাহির করিয়াছিলেন ১৯৩৩-৪৫ সালের মধ্যে। পুষ্টকায়—'তিমিরাভিসার' সম্প্রতি প্রকাশিত (১৯৫৪)। ইঁহার বিশিষ্ট কবিতায় পাই রঙ-রেখাবিরল উজ্জ্বল চিত্র।

শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৯) গোড়া থেকেই কবিতাকর্মে লাগিয়াছিলেন কমিউনিজমের বাণীবাহকরূপে। ইঁহার কবিতার বই দুইখানি মাত্র, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়,—'পদাতিক' (১৯৪০, তৃ-স ১৯৫১) এবং 'চিরকুট' (১৯৫০)। সুভাষবাবুর কবিতায় বাঙ্গালী পাঠক একটু নূতন রসের আস্বাদ পাইয়াছিল।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) সুভাষবাবুরই পথের পথিক। নিতান্ত তরুণ এই কবির রচনায় যে সম্ভাবনা ছিল তাহা দৈবহত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়িত। ইঁহার কবিতা—'ছাড়পত্র' (১৩৫৫), 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই' (১৩৫৫), 'মিঠে কড়া' (১৩৫৮) ইত্যাদিতে সঙ্কলিত। 'অভিযান' (১৩৫৩) বইটিতে দুইটি ছোট কাব্যনাট্য আছে—'অভিযান' ও 'সূর্যপ্রণাম'॥

[১] ১৩২৯ ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে ইঁহার প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারী-সমস্যা' বাহির হইয়াছিল।

[২] কবিতা-ভবন প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' (অর্থাৎ Pennyeach) গ্রন্থমালায় প্রকাশিত।

পুনশ্চ

পৃ ৩৫

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় গার্হস্থ্য গল্প-উপন্যাসও কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'সতীলক্ষ্মী' (তৃ-স ১৯২১), 'স্বর্ণ-প্রতিমা', 'কমলার অদৃষ্ট', 'পরাধীনা' ইত্যাদি। ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে এগুলিও উল্লেখযোগ্য—'শীশ্ মহল' (১৯১২) ও 'সাহাজাদা খসরু'।

এই সময়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে রসিকচন্দ্র বসুর 'কালাপাহাড' (১৯১০) উল্লেখযোগ্য। রাণী ভবানীকে লইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৩১০) ও দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৩১৬)।

সিরাজুদ্দৌলার আমলের গোড়ার দিকের কাহিনী লইয়া একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন দীঘাপতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায়। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা ইতিহাস রচনায় উৎসাহী ছিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ইঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগিতায়। বইটির নাম 'মোহনলাল' (১৯০৬)। প্রকাশক লিখিয়াছেন,

> এই পুস্তক বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়া প্রায় তিন বৎসর হইল মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইয়াছিল।… ইহা বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের পতন সময়ের চিত্র ও চরিত্র লইয়া লিখিত। বর্ত্তমান পুস্তকে ঐ সময়ের প্রথমাংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ হইয়া পড়ায় এই গ্রন্থে তৎসময়ের সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান করার সুবিধা হইল না…

বইটি সুলিখিত। রচনায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সংশোধন থাকা অসম্ভব নয়।

পৃ ৩৭

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যালোচনা-গ্রন্থের মধ্যে এ দুইটিও উল্লেখযোগ্য—'কাব্যসুধা' ও 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব'। ছেলেদের জন্যও ইনি কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। সেগুলির আদর হইয়াছিল। যেমন, 'ছড়া ও গল্প' (১৯১০), 'আহ্লাদে আটখানা', 'রসকথা' ও 'সাত নদী'। একমাত্র গল্পের বই 'মোহিনী' (১৯২৭)। ইহাতে আটটি গল্প আছে, তাহার মধ্যে দুইটির বিষয় বিদেশী সাহিত্য হইতে নেওয়া এবং দুইটি সত্যঘটনামূলক। কৈফিয়তে লেখক বলিয়াছেন, "নিরবলম্বে গল্পলেখা এই অক্ষম লেখকের শক্তিতে কুলায় না, এবংবিধ

স্বীকারোক্তি অনেকদিন পূর্বে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র উপলক্ষে করিয়াছিলাম। 'দাদামশায়' গল্প লিখিতে গিয়াও অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছিলাম।"

পৃ ৪০

যতীন্দ্রমোহন সিংহের অপর গল্পের বই 'তোড়া' (১৯১৮)।

পৃ ৪৪

১৩০২ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতীতে প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় গদ্য রচনা 'নীলকুল্ বাসুদেবের ব্রতকথা' বাহির হইয়াছিল।

পৃ ৫৮

সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'পঞ্চপ্রদীপ'এর (১৯১১) গল্পগুলি টল্‌স্‌টয়ের অনুবাদ। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি বসন্তপ্রাতের সকুরা পুষ্প' (১৯০৯) উল্লেখযোগ্য। এটি একটি জাপানী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা।

পৃ ৫৯

ভবানীচরণ ঘোষের 'পরিণয় কাহিনী' ও 'সরমার সুখ' ১৩১০ সালে বাহির হইয়াছিল। 'বারুণী' (১৯১৫) প্রভৃতি গল্পের বইয়ের লেখক শরচ্চন্দ্র ঘোষালের এবং 'মঞ্জুলা'র (১৯১৭) লেখক সুরেশচন্দ্র সিংহের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য।

পৃ ১১৯

বেলা-শেষের গানে সঙ্কলিত 'নাম্নি-পিরীতি-কথা'র একটি ছত্রে ("রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে পদ্মাপারের দল") অনেকের প্রাণে আঘাত হানিয়াছিল। ঢাকার সঙ্গে কলিকাতার সাহিত্যিক দ্বন্দ্বের উসকানিও কতকটা ইহা হইতে।

পৃ ১২২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসটির নাম 'ডঙ্কানিশান'।

পৃ ১৩৫

'মনীষা' (১৯১৯) জ্ঞানেন্দ্রনাথের একমাত্র বই নয়। সমকালীন নরম-গরম পোলিটিক্যাল আন্দোলন লইয়া ইনি একটি দুই অঙ্কের নাটক লিখিযাছিলেন। নাম 'পাষাণ-প্রতিমা' (১৯৩১)। ঘটনাস্থল নিউদিল্লী। লেখকের দৃষ্টি মধ্যস্থের। ভালো রচনা।

পৃ ১৩৬

দেবকণ্ঠ বাগচী সুকণ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। ইনি কিছু সরস কবিতাও লিখিয়া-

ছিলেন সেগুলি 'খেয়াল' নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 'মুখবন্ধ' কবিতাটি হইতে রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনে যদি ভাব উঠে কে রাখে তা চেপে।
যে রাখে সে বোবা হয়—নয় যায় ক্ষেপে॥
ভাষার পোষাক দিয়ে কেতাবের শেপে।
প্রকাশ করিনু তাই ভাবগুলা ছেপে॥

দেবকণ্ঠ কয়েকখানি কৌতুক গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন—'উজ্জ্বলে-মধুরে' (১৯১৩), 'হেস্তনেস্ত' (১৯১৪) ও 'হুলুস্থুল' (১৯১৫)। অত্যন্ত হালকাধরণের রচনা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুসরণে হাসির গানে পরিপূর্ণ। বইগুলি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

পৃ ১৩৭

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৪-১৯২৭) দুইখানি "মহাকাব্য" লিখিয়াছিলেন—'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৮)। বাঙ্গালায় মহাকাব্য রচনায় ইহাই উল্লেখযোগ্য শেষ প্রচেষ্টা। যোগীন্দ্রনাথ একটি নাটকও লিখিয়াছিলেন, নাম 'দেববালা' (১৯১৫)।

ভারতীয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২) একদা রীতিমত কবিতার চর্চা করিতেন। ইঁহার প্রথম কবিতার বই 'নিবেদন' (১৯১১)। ইনি অলঙ্কার ও সাহিত্যবিচার বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পৃ ১৫৩

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের লেখা ছেলেদের গল্পের বইয়ের মধ্যে দুইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—'হো-দের গল্প' (১৯২১) ও 'বুনো গপ্‌প' (১৯২২)। গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন লেখকের পিতা সুকুমার হালদার। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি গল্পের রস ও বইয়ের মর্যাদা বাড়াইয়াছে।

পৃ ১৮৩

'শ্রীকান্ত' 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' নামে ধারাবাহিক ভাবে ভারতবর্ষে প্রথম বাহির হইয়াছিল (প্রথম পর্ব মাঘ ১৩২২—মাঘ ১৩২৩, পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩২৩ ; দ্বিতীয় পর্ব আষাঢ় ১৩২৪ হইতে, পুস্তকাকারে ভাদ্র ১৩২৫ ; তৃতীয় পর্ব পুস্তকাকারে চৈত্র ১৩৩৪ ; চতুর্থ পর্ব পুস্তকাকারে ফাল্গুন ১৩৩৯)।

পৃ ১৬৬

'শশাঙ্ক' আর্যাবর্তে সবটা বাহির হয় নাই। মানসীতে অগ্রহায়ণ ১৩১৯ হইতে বাহির হইতে থাকে।

পৃ ১৬৮

ভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলেও এইখানে বিনয়কুমার সরকারের (১৮৮৭-১৯) উল্লেখ কর্তব্য। ইনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (National Council of Education) শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ইনি শিক্ষা- ও সমাজ-চিন্তা ঘটিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এগুলি কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, যেমন 'সাধনা' (১৯১৩)। তাহার পর ইনি আমেরিকা চলিয়া যান এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বিনয়কুমারের ষ্টাইল নিজস্ব।

পৃ ১৮৮

শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠালাভের পর আর এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস-লেখকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। ইঁহার বই 'চাঁদমুখ' (১৩২৮), 'পথের সন্ধান' (১৩৩২), 'সুপ্রভাত' ইত্যাদি।

পৃ ১৮৯

গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল ছিলেন। ছয়টি ছোট বড় গল্প লইয়া ইঁহার 'মঞ্জরী' বাহির হইয়াছিল ১৯১২ সালে। সুতরাং শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ দলের মধ্যে ইনিই প্রথম গ্রন্থকার। মঞ্জরীর গল্পগুলির বিষয়ে ভাগলপুরের দলের, বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রের, পূর্বাভাস বিদ্যমান। ভূমিকায় লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।

> অনেকগুলি গল্পে পতিতা অথবা পুণ্যপথভ্রষ্টার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।... সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই হয় ত মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই হয় ত দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহানুভব থাকেন, যাঁহারা তাহাদের অপরাধকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার তাহাদিগকেই আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকা রূপে, প্রেমময়ী নায়িকারূপে ফিরিয়া পাইতে পারে। পাপ দৃঢ় সংস্কারবদ্ধ হইবার পূর্বে, পতনের প্রারম্ভেই যদি ক্ষমা তাহাকে উদ্ধার করে, তাহা

হইলে সে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না, কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় হইয়া উঠে।

পৃ ১৯৫

সরসীবালা বসুর 'প্রায়শ্চিত্ত' ১৯২০ সালে এবং 'শিবানী' ও 'শ্রেয়সী' ১৯২১ সালে বাহির হইয়াছিল।

পৃ ১৯৭

যতীন্দ্রনাথের 'মিলন' ১৩২৩ সালে, 'বিধিলিপি' ও 'সঙ্গিনী' ১৩২৪ সালে, 'সতী রাণী' ও 'প্রলোভন' (১৩২৫) সালে ও 'দেশের মেয়ে' ১৩২৮ সালে বাহির হইয়াছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ পালও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

পৃ ১৯৮

'উৎপলা' ১৩৩১ সালে ছাপা হইয়াছিল। 'যুগমানব'এর প্রকাশকাল ১৯২৬।

পৃ ১৯৯

বঙ্কুবিহারী ধরের 'কাকিমা' ও 'কনে মা' যথাক্রমে ১৩১৪ ও ১৩২২ সালে বাহির হইয়াছিল। ইঁহার অপর বই 'পিসিমা' (১৩২৯), 'বেয়ান ঠাকরুণ' (১৩২৯) ইত্যাদি।

পৃ ২০০

সত্যচরণ চক্রবর্তীর অপর বই—'ফুলদেবী', 'রাণী দুর্গাবতী' (১৩২৭), 'কনে বৌ' (১৩২৯), 'প্রেমের হাট' (১৩৩২) ইত্যাদি।

পৃ ২০৫

সাহিত্য-সম্পাদককে উদ্দেশ করিয়া লেখা 'পত্র' কবিতায়ও সমসাময়িক বাঙ্গালা কবিতার সমালোচনা করিয়াছিলেন প্রমথনাথ। কবিতাটি ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সাহিত্যে বাহির হইয়াছিল। প্রমথনাথ লিখিয়াছিলেন,

রচি গদ্য পদ্য
তাহার পনেরো আনা সবাকারি আছে জানা
মোটে নয় সদ্য ॥
যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আর বার।
মনের পুরানো মাল, মেজে ঘষে করি লাল
করি কারবার ॥

হয় ত বা পুরোপুরি না জেনে করেছি চুরি
পর-মনোভাব।
অথবা জাওর কাটি খেয়ে আমি পরিপাটী
সাহিত্যের জাব॥
জলো ধর্ম্ম, জলো নীতি বেচা কেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র, মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র
হাজারে হাজারে॥

পৃ ২১৮

হরিদাস হালদারের 'মদনপিয়াদা' ছাপা হইয়াছিল ১৩২৫ সালে, 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি' ১৩২৮ সালে (১৯২১)। বইটি ঠিক রসরচনা নয়। কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ষ্টাইলে, তবে লক্ষ্য স্থনির্দিষ্ট এবং ইষুক্ষেপণ সোজাস্থজি। সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে "ফাঁকিদারী সভ্যতা" জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং দেশে সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ (এবং প্রতিবাদও) বইটির প্রবন্ধগুলির বিষয়। প্রবন্ধগুলি পরিচ্ছেদরূপে সাজানো। কয়েকটি প্রবন্ধ খোলা চিঠির মত। সপ্তম পরিচ্ছেদের খোলা চিঠির উদ্দিষ্ট গান্ধীজী। লেখক আশঙ্কা করিতেছেন, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যেন প্রকারান্তরে দারুণ হিংসা আনিয়া না দেয়।

> রুশিয়াতে টলষ্টয় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তাঁহার অহিংসা মন্ত্র ও সত্যাগ্রহ ব্রত প্রচার করিয়াছিলেন। তথাপি সম্প্রতি সে দেশের তুষারের স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া বলসেবীরূপী নরসিংহ অবতার দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ নরসত্ত্ব রূপে বিরাজমান নারায়ণ অকস্মাৎ প্রচণ্ড সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেখানকার সকল প্রকার রাজ্যৈশ্বর্য্য-শক্তির নাড়ীভুঁড়ি অতীব নৃশংসভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এ ঘটনাটি এই যুগের ঐতিহাসিক সত্য। অহিংসার পশ্চাতে হিংসার তাণ্ডবলীলা যে অসম্ভব নহে, তৎসম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব হে মহাত্মাজি! আপনাকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া এমন ভাবে সত্যাগ্রহ প্রচার করিতে হইবে, যেন তাহার ল্যাজ ধরিয়া কোন অবতার না আসিতে পারেন। …প্রহ্লাদ ও টলষ্টয় এ কাজ করিতে না পারিলেও, আপনাকে পারিতে হইবে; যেহেতু গুরুর চেয়ে চেলা এককাঠি সরস হইয়া থাকে, গুরুর অসাধ্য কাজ চেলার দ্বারা সাধিত হয়।

পৃ ২১৯

চিত্তরঞ্জনের আর এক ভগিনী শ্রীমতী উর্মিলা দেবীর কয়েকটি গল্প ১৩১৮-২০ সালের দিকে মানসীতে ও অন্যান্য পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই।

পৃ ২২৩

উপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (১৩২৮) অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত হইয়াছিল। এই বই লেখক হিসাবে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

পৃ ২৫১

মরীচিকা কাব্যের মটো রবীন্দ্রনাথের এই কয়ছত্র,

মরীচিকা চাহি জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি।
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখী।

পৃ ২৬১

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'শতপর্ণী' ও 'পর্ণজা' ১৩৩৪ সালে ছাপা হইয়াছিল।

পৃ ২৬৫

প্রভাতমোহনের 'মুক্তি-পথে' (১৯৩১ ?) প্রথম কবিতার বই। 'তিন্তিড়ি' ছেলেদের কবিতার বই।

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৬) ডাক্তার-সাহিত্যিক। ইনি প্যারডি-কবিতা, নাটক ('দশচক্র' ১৯২২) ও উপন্যাস ('যোগভ্রষ্ট' ১৯২৯) লিখিয়াছেন।

অন্যান্য কবিতালেখকদের মধ্যে ইঁহারাও উল্লেখযোগ্য—'সুরধুনী'র (১৯২৭) লেখক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর, 'অভিযান'এর লেখক "লীলাময় দে" (আসলে প্রফুল্লকুমার দে),[১] 'প্রেম ও প্রতিমা'র (১৯৩৪) লেখক রমেশচন্দ্র দাস, 'বর্ষশেষ' ও 'বসুন্ধরা'র কবি শ্রীযুক্ত চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৪) ইত্যাদি।

পৃ ৩১১

কল্লোলের প্রবীণ নবীন লেখকদের মধ্যে আরও কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। পবিত্রবাবুর 'নীলপাখী' (১৯২৪) ও 'বুভুক্ষা' (১৯২৮, দ্বি-স ১৯৫২) যথাক্রমে মেটারলিঙ্কের নাটিকার ও হাম্‌সুনের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের অনুবাদ। নৃপেন্দ্রবাবুর 'শেলী' (১৯২৮ ?) আঁদ্রে মোরোয়ার

১ ইঁহার উপন্যাসও আছে, যেমন 'কবিতার জন্মদিন' (১৩৪৭)।

গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা। প্রবন্ধ রচনায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, "আনন্দসুন্দর ঠাকুর" (শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়) ; কবিতায় সুকুমার সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কবিতার বই 'আরতি' ১৯২৮), শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী (কবিতার বই 'উদিতা' ১৯২৯) ; কবিতায় ও গল্পে শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য ; গল্পে শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ভাদুড়ী (১৩৩১ সালের ভারতীতে গল্প বাহির হইয়াছিল) ; প্রবন্ধে ও গল্পে পরিমল রায় (প্রবন্ধের বই 'ইদানীং' ১৯৪৯) এবং (কল্লোলের লেখক না হইলেও) প্রভু গুহঠাকুরতা (প্রবন্ধের বই 'এ ও তা' ১৯৩৬)—ইঁহারাও উল্লেখযোগ্য।

পৃ ৩২২

গল্প-উপন্যাস রচয়িতাদের প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি নাম যোগ করা যায়। রাখালচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৩৪) যে গল্প লিখিয়াছিলেন তাহা 'সপ্তপর্ণী' (১৯৩৭) নামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চঞ্চরীকা' (১৯৩১) সচিত্র লঘুরসের গল্পের বই, রাজশেখরবাবুর অনুসরণে। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত শুভো ঠাকুর গদ্য পদ্য দুইই লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য দশাব্দের মধ্যভাগ হইতে উপন্যাস লেখা শুরু করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৩) 'শ্রীময়ী' (১৯৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসের প্রণেতা। শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য কল্লোলে গল্প লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কুমারলাল দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯০০) অনেক গল্প লিখিয়াছেন, তবে বই একটি মাত্র (১৯৫১)॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	৮৬	পংক্তি	২৩	'সারথি' হইবে।
পৃষ্ঠা	১৩৮	পংক্তি	২১	'(১৯১৯)' হইবে।
পৃষ্ঠা	১৪৭	পংক্তি	৩	'যমজ' হইবে।
পৃষ্ঠা	১৬৫	পংক্তি	১৯	'ভারতবর্ষে' হইবে।
পৃষ্ঠা	১৭৫	পংক্তি	৭	'ইঙ্গিত প্রায়' হইবে।
পৃষ্ঠা	১৭৮	পংক্তি	২৫	'সেটিমেণ্টালিতে' হইবে
পৃষ্ঠা	১৮৩	প্রথম পাদটীকা বাদ যাইবে।		
পৃষ্ঠা	১৮৬	পংক্তি	৯	'ভোলাইবার' হইবে।
পৃষ্ঠা	২০০	পংক্তি	১২	'মোস্তফা' হইবে।
পৃষ্ঠা	২২৭	পংক্তি	৪	'অন্তস্তলে' হইবে।

নির্ঘণ্ট